স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা

(শিক্ষার্থীদের জন্য)

সপ্তম শ্রেণি

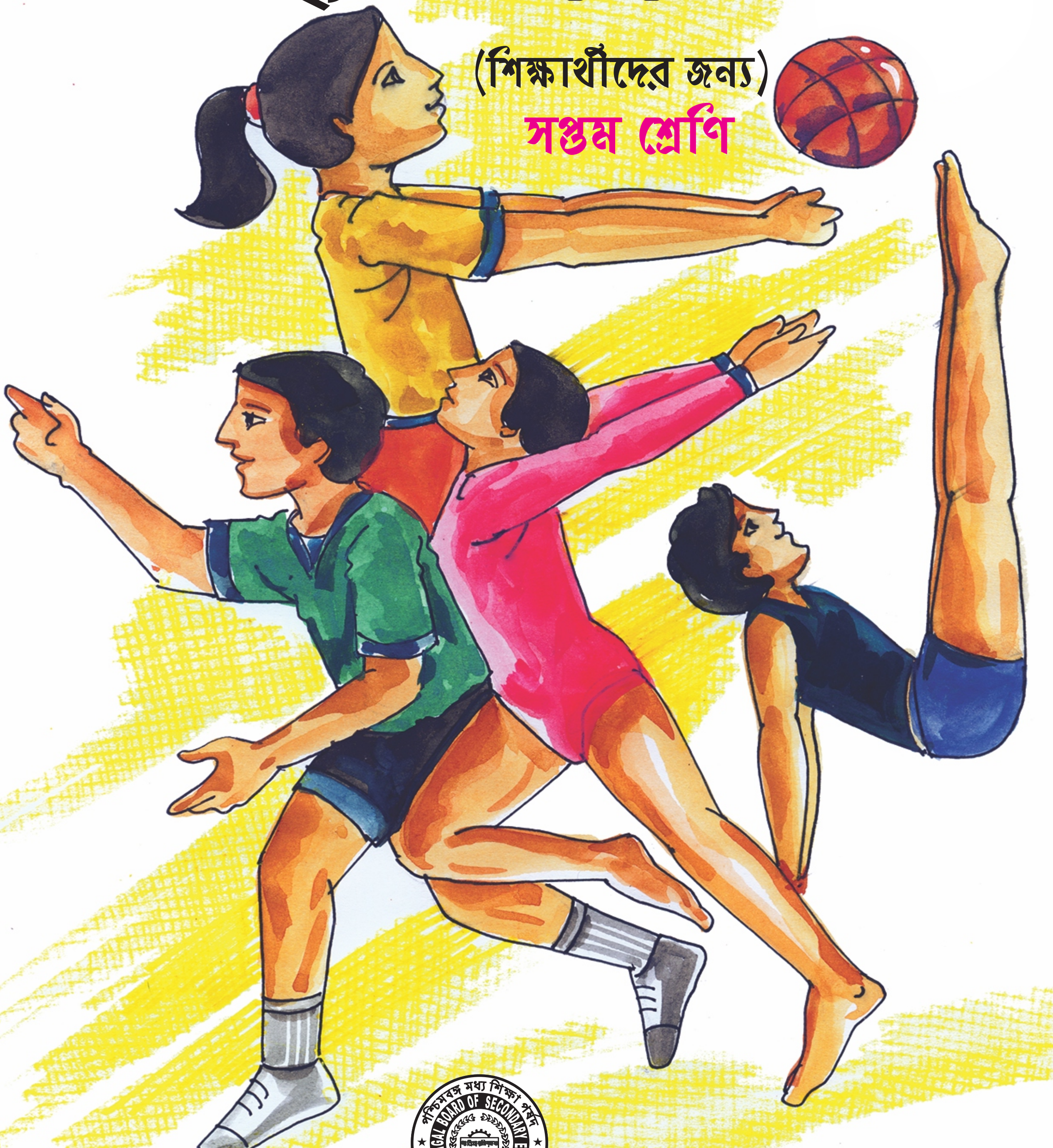

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব ঃ

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক ঃ
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জী
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্ররূপে** গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথগ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে ঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তিসম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।**

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all-FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation ; In OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE AND TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

মৌলিক অধিকার (ভারতীয় সংবিধানের ১৪-৩৫ নং ধারা)

১. সাম্যের অধিকার

● আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে;

● জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না;

● সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুসারে সকলের সমান অধিকার থাকবে;

● অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; এবং

● উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

২. স্বাধীনতার অধিকার

● বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার;

● শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার;

● সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার;

● ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার;

● ভারতের যে-কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার;

● যে-কোনো জীবিকার, পেশার বা ব্যাবসাবাণিজ্যের অধিকার;

● আইন অমান্য করার কারণে অভিযুক্তকে কেবল প্রচলিত আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া যাবে;

● একই অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া যাবে না;

● কোনো অভিযুক্তকে আদালতে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে না;

● জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার;

● যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা যাবে না; এবং আটক ব্যক্তিকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার

● কোনো ব্যক্তিকে ক্রয়বিক্রয় করা বা বেগার খাটানো যাবে না;

● চোদ্দো বছরের কমবয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা বা অন্য কোনো বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা যাবে না।

৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

● প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে;

● প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ধর্মপ্রচারের স্বার্থে সংস্থা স্থাপন এবং সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে;

● কোনো বিশেষ ধর্ম প্রসারের জন্য কোনো ব্যক্তিকে করদানে বাধ্য করা যাবে না;

● সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না এবং সরকারের দ্বারা স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

৫. সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার

● সব শ্রেণির নাগরিক নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণ করতে পারবে;

● রাষ্ট্র পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, জাত বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না;

● ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে।

৬. শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার

● মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকেরা সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারবে।

মৌলিক কর্তব্য
(ভারতীয় সংবিধানের ৫১এ নং ধারা)

১। সংবিধান মান্য করা এবং সংবিধানের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় স্তোত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

২। যেসব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল, সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ;

৩। ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ;

৪। দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবামূলক কার্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া;

৫। ধর্মগত, ভাষাগত ও আঞ্চলিক বা শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহকে বর্জন;

৬। আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্য দান ও সংরক্ষণ;

৭। বনভূমি, হ্রদ, নদনদী এবং বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নসাধন এবং জীবন্ত প্রাণীসমূহের প্রতি মমত্ব পোষণ;

৮। বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারসাধন;

৯। সরকারি সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হিংসা বর্জন;

১০। সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টাকে উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্নপ্রকার কার্যকলাপের উৎকর্ষসাধন;

এবং

১১। ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কর্তব্য।

মুখবন্ধ

শারীরশিক্ষা একধরনের সৃজনাত্মক কর্মসূচি। খেলার সঙ্গে আনন্দ, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার কার্যাবলি সর্বজনস্বীকৃত। শারীরশিক্ষার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীর জীবনে খাদ্য, আলো, বাতাস-এর মতো অপরিহার্য। দেশ, কাল, গ্রাম ও শহর সর্বত্র খেলার প্রতি শিশুর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী খেলতে ভালোবাসে। শিক্ষার্থীরা খেলবার সময় কোনোরকম ক্লান্তিবোধ করে না। খেলার মাধ্যমেই নিজেকে পুনরুজ্জীবিত যেমন করে, তেমনি এর মাধ্যমে শিশুর অভ্যন্তরীণ সুকোমল বৃত্তিগুলির বিকাশ সাধিত হয়।

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা অনুসারে ও খেলার প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণের কথা বিবেচনা করে, বিদ্যালয় স্তরে পূর্বের খণ্ডিত শারীরশিক্ষার পরিবর্তে একটি সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত করা হয়েছে। পাঠক্রমে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক বিষয়গুলির যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শারীরশিক্ষার বিষয়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যশিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা, বিপর্যয় মোকাবিলার শিক্ষা, পথনিরাপত্তা, প্রাথমিক জিমনাস্টিকস প্রভৃতি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যোগাসন, জিমনাস্টিকস, ব্রতচারী, বিভিন্ন ধরনের একক ও দলগত খেলা, আত্মরক্ষামূলক কৌশল - ক্যারাটে, লোকক্রীড়া ও বিনোদনমূলক খেলা সমন্বিত করে একটি সমৃদ্ধিশালী শারীরশিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন। শারীরশিক্ষার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর এই সরকার। শারীরশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে গত শিক্ষাবর্ষ থেকেই স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষাকে অন্যান্য বিষয়ের মতো সমমর্যাদার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 'স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার' পাঠক্রমটি প্রস্তুতিকালীন ও পর্যায়ক্রমিক উভয়প্রকার মূল্যায়নের বিষয়। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার পাঠক্রমটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর পরামর্শক্রমে একটি বিদ্যালয় স্তরের পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার বই প্রকাশ করা হলো।

ডিসেম্বর, ২০১৬
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা- ৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্কথন

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ও শিক্ষার অধিকার আইন, এই দুটি নথিকে ভিত্তি করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়টিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সুস্থ দেহ, সুস্থ মনের আধার— এই প্রবাদবাক্যটিকে স্মরণে রেখে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়টিকে অন্যান্য বিষয়ের সমমর্যাদায় বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা পাঠক্রমটি প্রস্তুতিকালীন ও পর্যায়ক্রমিক উভয়প্রকার মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিষয়। স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার শিখনসূচিতে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষাকে কেন্দ্রে রেখে প্রাথমিক চিকিৎসা, বিপর্যয় মোকাবিলা, ক্রেতা সুরক্ষা, পথনিরাপত্তার শিক্ষা, মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধ সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে নিয়মিতভাবে শারীরশিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি ক্লাসের রুটিনে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। ব্রতচারী, ছড়ার ব্যায়াম, যোগাসন, জিমনাস্টিকস, অ্যাথলিটিক্স, দাবা, সু-অভ্যাস গঠন, বিনোদনমূলক খেলা, দাবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, শারীরিক সক্ষমতা পরিমাপ ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শারীরশিক্ষার হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর সরকার।

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার ব্যাবহারিক পাঠক্রমে কোনোরকম কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি। এটি একটি নমুনা সৃষ্টি মাত্র। শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের চাহিদা, সামর্থ্য ও আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে এরকম নতুন নতুন উদ্ভাবনীশক্তি প্রয়োগ ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপনার ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সার্থক হবে আমাদের এই আয়োজন।

ডিসেম্বর,২০১৬
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চম তল
বিধান নগর, কলকাতা- ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)
রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা, পাণ্ডুলিপি নির্মাণ ও সম্পাদনা

দ্বীপেন বসু

পাণ্ডুলিপি নির্মাণের সহযোগিতায়

সৌমিত্র কর্মকার
সুমাল্য রায়
রূপালী বসু (ধর)

প্রচ্ছদ

শংকর বসাক

গ্রন্থরূপ নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ	**শারীরশিক্ষার মৌলিক ধারণা**	**১-২১**
১.১.১	শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য	১
১.১.২	শারীরশিক্ষার গুরুত্ব	৩
১.১.৩	শারীরশিক্ষার পরিধি সম্পর্কে ধারণা	৫
১.১.৪	বাংলার ক্লাব সংস্কৃতি—ইস্টবেঙ্গল	৮
১.২.১	জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী	১১
১.৩.১	জাতীয় সংহতি	১৪
১.৩.২	জাতীয় সংহতি রক্ষায় শারীরশিক্ষার ভূমিকা	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	**স্বাস্থ্যশিক্ষা**	**২২-৩৭**
২.১.১	স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা	২২
২.২.১	স্বাস্থ্যকর বিদ্যালয় পরিবেশ	২২
২.৩.১	দেহভর সূচক	২৬
২.৩.২	দেহভর সূচকের সূত্র	২৬
২.৪.১	মেদাধিক্য	২৯
২.৪.২	অপুষ্টি	৩১
২.৫.১	স্বাস্থ্যের উপর ব্যায়ামের প্রভাব	৩৩
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	**প্রাথমিক চিকিৎসা**	**৩৮-৫২**
৩.১.১	প্রাথমিক প্রতিবিধানের ধারণা	৩৮
৩.১.২	প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি	৩৮
৩.১.৩	প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর কর্তব্য	৩৯
৩.১.৪	ব্যান্ডেজের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা	৪০
৩.২.১	দাহক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা	৪২
৩.২.২	বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অগ্নি-দুর্ঘটনার বিপন্মুক্তির পদ্ধতি	৪৮
৩.৩.১	কুকুরের কামড়	৪৯

চতুর্থ অধ্যায় ঃ	**ক্রেতা সুরক্ষা**	**৫৩-৬০**
৪.১.১	ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা	৫৩
৪.১.২	সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে	৫৪
৪.১.৩	খাদ্য—ভেজাল—শারীরিক ক্ষতি	৫৮
৪.১.৪	উপভোক্তাদের অবশ্য করণীয়	৫৯
৪.১.৫	ক্রেতা আদালতে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি	৫৯
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	**বিপর্যয় মোকাবিলার**	**৬১-৭০**
৫.১.১	বন্যা	৬১
৫.১.২	বন্যার কারণ	৬১
৫.১.৩	বন্যার ক্ষয়ক্ষতি	৬২
৫.১.৪	বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়	৬৩
৫.১.৫	বন্যার ক্ষয়ক্ষতি আটকাতে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতি	৬৩
৫.১.৬	বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিধি	৬৭
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ	**পথনিরাপত্তা**	**৭১-৮৪**
৬.১.১	পথনিরাপত্তায় ট্রাফিক পুলিশ	৭১
৬.১.২	পথরেখা	৭২
৬.১.৩	কার্ব ড্রিল	৭২
৬.১.৪	ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ ও ট্রাফিক আলোর সংকেত	৭৫
৬.১.৫	পরিযান চিহ্ন	৭৬
৬.১.৬	গাড়িচালকের হাতের সংকেত	৭৭
৬.১.৭	সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও	৭৮
৬.১.৮	রক্ষীবিহীন রেলওয়ে ক্রসিং	৮১
৬.১.৯	সড়ক দুর্ঘটনার কারণ	৮২

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার ব্যাবহারিক সূচিপত্র

সপ্তম অধ্যায় ঃ নিয়মানুগ অঙ্গসঞ্চালনা ৮৫-৯১

৭.১.১	ব্রতচারী	তরুণদল	৮৫
৭.১.২	কুচকাওয়াজ	পিছে মুড়, খুলি লাইন চল, সামনে স্যালুট	৮৮
৭.১.৩	ক্যালিসথেনিক্স	খালি হাতের চারটি ব্যায়াম	৯০

অষ্টম অধ্যায় ঃ একক ক্রীড়া ৯২-১২৩

৮.১.১	যোগাসন	শশঙ্গাসন, উষ্ট্রাসন, বামনাসন, পদ্মাসন, তৌলঙ্গাসন, শীতলী প্রাণায়াম, জানুশিরাসন, পূর্ণধনুরাসন, শঙ্খাসন, ধনুরাসন, বকাসন	৯২
৮.২.১	জিমনাস্টিকস	স্ট্র্যাডেল জাম্প, একহাতে কার্ট হুইল, ডাইভ রোল, জাম্প ৩৬০° টার্ন, বসা অবস্থান থেকে পিছনে ওয়াক ওভার, শূন্যে গুটিয়ে পিছনে ঘোরা	১০১
৮.২.২	অ্যারোবিক ব্যায়াম	প্রারম্ভিক অ্যারোবিক ব্যায়াম	১০৪
৮.২.৩	পিরামিড	চারটি পিরামিড	১০৭
৮.৩.১	উচ্চলম্ফন	প্রারম্ভিক কলাকৌশল	১০৮
৮.৩.২	দীর্ঘলম্ফন	প্রারম্ভিক কলাকৌশল	১১১
৮.৪.১	দাবা	বিভিন্ন আক্রমণের পদ্ধতি	১১৪
৮.৫.১	আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া	ক্যারাটের প্রাথমিক কলাকৌশল	১১৮

নবম অধ্যায় ঃ	**দলগত ক্রীড়া**		**১২৪-১৩৮**
৯.১.১	কবাডি	খেলার কলাকৌশল	১২৪
৯.১.২	নেটবল	খেলার কলাকৌশল	১৩৫
দশম অধ্যায় ঃ	**মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম**		**১৩৯-১৬৭**
১০.১.১	স্থানীয় জনগোষ্ঠী সেবাকার্যক্রম	সমাজসেবামূলক একটি প্রকল্প	১৩৯
১০.১.২	থ্যালাসেমিয়া থেকে শিশুকে বাঁচাতে সচেতনতামূলক প্রকল্প		১৪৫
১০.১.৩	প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের উপর বিধিনিষেধ		১৪৮
১০.১.৪	বৃষ্টির জল সংরক্ষণ		১৪৮
১০.১.৫	শিশু ও নারী পাচার, নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধের সচেতনতামূলক কার্যক্রম		১৫০
১০.১.৬	কন্যাশ্রী প্রকল্প		১৫৫
১০.১.৭	সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ		১৬৩
১০.২.১	নেতৃত্বদান ক্ষমতাবিকাশ কার্যক্রম		১৬৫
১০.২.২	পালনীয় দিবসগুলিতে অংশগ্রহণ		১৬৬
১০.২.৩	শারীরশিক্ষার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ		১৬৭
১০.৩.১	হেলথ কার্ড		১৬৮
	পরিশিষ্ট		

প্রথম অধ্যায়

শারীরশিক্ষার মৌলিক ধারণা

১.১.১ শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য

শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মতবাদ দিয়েছেন।

জে বি ন্যাশ-এর মতে শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য চারপ্রকার—

১) শারীরিক তন্ত্রগত বিকাশ

২) স্নায়ু-পেশির বিকাশ

৩) বিশ্লেষণাত্মক গুণের বিকাশ

৪) প্রাক্ষোভিক বিকাশ

প্রখ্যাত শারীরশিক্ষাবীদ 'বিউকাব' এবং 'ওয়েস্ট' শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—

১) শারীরিক বিকাশের উদ্দেশ্যসমূহ

২) স্নায়ু ও পেশির বিকাশের উদ্দেশ্যসমূহ

৩) জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যসমূহ

৪) সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, সৌন্দর্যবোধ বিকাশের উদ্দেশ্যসমূহ

জে আর সরমন-এর মতে শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য ছয়প্রকার—

১) শারীরিক তন্ত্রগত বিকাশের উদ্দেশ্য

২) দক্ষতা বিকাশের উদ্দেশ্য

৩) সামাজিক বিকাশের উদ্দেশ্য

৪) স্বাস্থ্য বিকাশের উদ্দেশ্য

৫) প্রাক্ষোভিক বিকাশের উদ্দেশ্য

৬) শারীরিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুবিধা।

বিভিন্ন শারীরশিক্ষাবিদের মতবাদগুলি পর্যালোচনা করে শারীরশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো—

১) শারীরিক বিকাশের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

ক) শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের উন্নতিসাধন

খ) শরীরের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন তন্ত্রগুলির উন্নতিসাধন

গ) শক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতার উন্নতিসাধন

ঘ) সুস্বাস্থ্য গঠন

ঙ) সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সু-অভ্যাস গঠন

২) মানসিক বিকাশের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ শারীরশিক্ষার মাধ্যমে মানবিক গুণাবলির বিকাশসাধন হয়। কারণ শিশুর মানসিক বিকাশের পরিপূর্ণতালাভের অন্যতম মাধ্যম হলো খেলা ও শারীরিক অঙ্গসঞ্চালন। মানসিক বিকাশের উদ্দেশ্যগুলি হলো—

ক) যে-কোনো বিষয়ের প্রতি মনঃসংযোগ বৃদ্ধি

খ) মানসিক তৎপরতার উন্নতিসাধন

গ) উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার উন্নয়ন

ঘ) প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার উন্নতি।

৩) সামাজিক বিকাশের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ শারীরশিক্ষার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়, ফলে মানবিক সম্পর্কের উন্নতি হয়। সামাজিকতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির উন্নতি ঘটে, যেমন—

ক) বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নতি

খ) সহযোগিতা ও সহানুভূতির উন্নতি

গ) নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের বিকাশসাধন

ঘ) সততা, নিরপেক্ষতা, কর্তৃত্বকে সম্মান জানানো, নিষ্ঠা, পারস্পরিক মূল্যবোধ ও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার উন্নতিসাধন

ঙ) খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতার উন্নতি

চ) আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠার গুণাবলির বিকাশ

৪) গতিসঞ্চালনমূলক বিকাশের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ গতিসঞ্চালনমূলক বিকাশ বলতে বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকলাপে সীমিত শক্তি ব্যয় করে ত্রুটিহীন অঙ্গসঞ্চালনকে বোঝায়। বিভিন্ন গতিসঞ্চালনমূলক বিকাশের উদ্দেশ্যগুলি হলো—

ক) মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে সংযোগস্থাপন করা

খ) স্নায়ু ও মাংসপেশির সমন্বয়ে উন্নতিসাধন

গ) প্রতিক্রিয়া সময়ের উন্নতি ঘটানো

ঘ) শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন

৫) ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঃ নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্রের ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিভিন্ন গুণগুলি, যেমন—

ক) আত্মসংযম
খ) সহিষ্ণুতা
গ) আত্মনির্ভরশীলতা
ঘ) নেতৃত্বদানের ক্ষমতা
ঙ) সহানুভূতি ও সহযোগিতা
চ) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার বিকাশ
ছ) সুনাগরিকত্বের গুণাবলির বিকাশ

৬) জ্ঞানের বিকাশ ঃ জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। যেমন—

ক) বিভিন্ন খেলাধুলার নিয়মকানুন, কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন

খ) শারীরিক বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা এবং তা থেকে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কেও দক্ষতা

শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য

(১) শারীরিক বিকাশ
(২) মানসিক বিকাশ
(৩) সামাজিক বিকাশ
(৪) গতিসঞ্চালনমূলক বিকাশ
(৫) ব্যক্তিত্বের বিকাশ
(৬) জ্ঞানের বিকাশ

১.১.২ শারীরশিক্ষার গুরুত্ব

শারীরশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যার লক্ষ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিভিন্ন গুণাবলির উন্নতিসাধন করে কোনো ব্যক্তিকে সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। আজকের এই যন্ত্রনির্ভর সমাজে শারীরশিক্ষা মানুষকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। তাই এই বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে দেখা দিয়েছে। শারীরশিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তাগুলি হলো—

শারীরশিক্ষার গুরুত্ব

১) আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি
২) সামাজিকতার বিকাশ
৩) শারীরিক সক্ষমতার বিকাশ
৪) মানসিক গুণাবলির বিকাশ
৫) ব্যক্তিত্বের বিকাশ
৬) স্নায়ু-পেশির সমন্বয়
৭) শারীরিক বিকাশ
৮) সাংস্কৃতিক বিকাশ
৯) জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণ
১০) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ
১১) আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার উন্নতি

১) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঃ

বর্তমান সমাজের দুর্বল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় অধিকাংশ মানুষ তার শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। ফলে বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিয়মিত শারীরশিক্ষার অনুশীলনই ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক গুণাবলির উন্নতির পাশাপাশি তাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে পারে ও তার অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি ঘটায়।

২) সামাজিকতার বিকাশ ঃ

শারীরশিক্ষা ব্যক্তির সামাজিক বোধের বিকাশ ঘটায়। বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে ব্যক্তির মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকে না। এছাড়া খেলার মাঠে ধর্ম, বর্ণ ও জাতিভেদের কোনো গুরুত্ব না থাকায় ব্যক্তির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হয় এবং সমাজে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়।

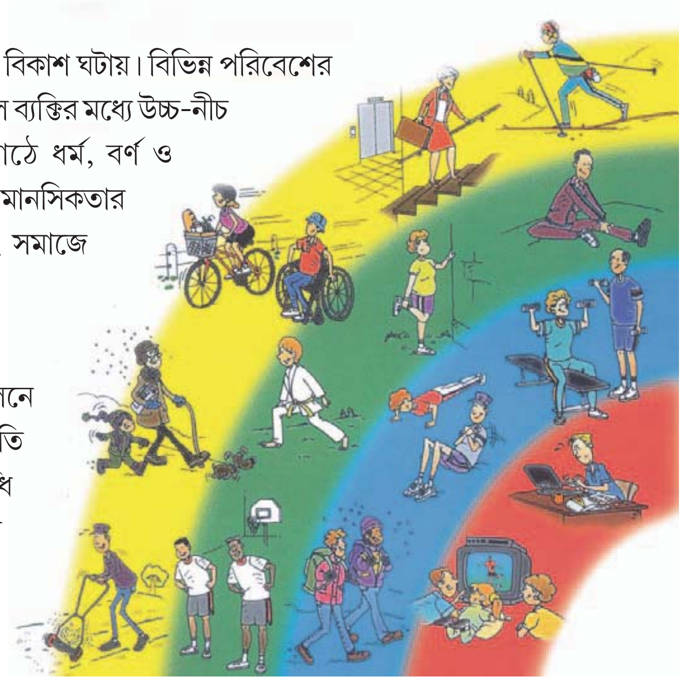

৩) শারীরিক সক্ষমতার বিকাশ ঃ

নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনে শক্তি, সহনশীলতা, ভারসাম্য ইত্যাদির উন্নতি ঘটে। ফলে ব্যক্তির শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা মানুষকে সুস্থভাবে জীবনযাপনে সাহায্য করে।

৪) মানসিক গুণাবলির বিকাশ ঃ

শারীরশিক্ষা ব্যক্তির মানসিকতার বিকাশ ঘটায়। কাজের প্রতি মনঃসংযোগ বৃদ্ধি পায় ও ব্যক্তি সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় ও যে-কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং সমস্যার সমাধান করতে পারে। নিয়মিত শরীরচর্চা ব্যক্তির মধ্যে সুস্থ মানসিকতা আনে ও তার মানসিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

৫) ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঃ

দৈনন্দিন শরীরচর্চার মাধ্যমে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উন্নতি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণ, যেমন - নিয়মানুবর্তিতা, আত্মসংযম, আন্তরিকতা, সহনশীলতা ইত্যাদির বিকাশ হয়। এছাড়া ব্যক্তির মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা ও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের বিকাশ ঘটে। এইসব গুণ ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

৬) স্নায়ু-পেশির সমন্বয়ের বৃদ্ধি ঃ

স্নায়ু-পেশির সমন্বয় ছাড়া কোনো কাজই সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলনে ব্যক্তির স্নায়ুর বিকাশ হয় ও পেশিসঞ্চালন কার্যকরী হয়। এর ফলে ব্যক্তি কম শক্তি খরচ করেও যথাযথ ফল পায়। স্নায়ু-পেশির সমন্বয়ের ফলে ব্যক্তির অঙ্গসঞ্চালন সঠিক ও আকর্ষণীয় হয়।

৭) শারীরিক বিকাশ ঃ

নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করলে দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্র

ও তন্ত্রগুলির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা ব্যক্তিকে সুঠাম ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলে। স্বাস্থ্য হলো ব্যক্তির অমূল্য সম্পদ যা তাকে দৈনন্দিন শারীরিক ও মানসিক কাজকর্ম, দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে সাহায্য করে।

৮) সাংস্কৃতিক বিকাশ সুদৃঢ় করে ঃ

নানান খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বিভিন্ন পরিবেশের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে একটি সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তৈরি হয়, যা ব্যক্তিকে সংস্কৃতিবান করে তুলতে সাহায্য করে।

৯) জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হয় ঃ

শারীরশিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ কোনো ব্যক্তিকে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও জাতির সঙ্গে মেশার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে ব্যক্তি ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিত হয় ও তার মধ্যে স্বদেশপ্রেমের বোধ জাগ্রত হয়। এছাড়া শারীরশিক্ষা মানুষের ঐক্যবোধ ও জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটায় যা দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

১০) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ঃ

নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন নিয়ম ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধা আসে, যা তার মধ্যে গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস আনে অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে।

১১) আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সুদৃঢ় হয় ঃ

শারীরশিক্ষার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার অনুষ্ঠানগুলিতে (অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস ইত্যাদি) বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে পরস্পরের সংস্কৃতি ও ভাববিনিময়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব তৈরি হয়। এছাড়া অন্য দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শারীরশিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সুদৃঢ় করে।

১.১.৩ শারীরশিক্ষার পরিধি সম্পর্কে ধারণা

শরীরচর্চা ঃ অতীতে অন্যান্য সংস্কৃতির পাশাপাশি শারীরিক সংস্কৃতি বা শরীরচর্চার প্রচলন হয়েছিল। শারীরিক সংস্কৃতি বলতে সুন্দর, সৌন্দর্যময় পেশিবহুল শরীরলাভের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিকে বোঝায়। দেশবিদেশে শারীরিক সংস্কৃতির উপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যেমন পুরুষদের জন্য শ্রেষ্ঠ দেহসৌষ্ঠব এবং মহিলাদের জন্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। শরীরের বাহ্যিক সৌন্দর্যকে প্রকাশ

করার পদ্ধতিকেই শারীরিক সংস্কৃতি বলা হয়। শরীরচর্চার উদ্দেশ্যগুলি হলো—

১. শারীরিক সক্ষমতার উন্নতি ঘটানো

২. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা

৩. আত্মসংযম, সহনশীলতা ও সামাজিক গুণাবলির বিকাশসাধন করা

শারীরশিক্ষার পরিধি

- শরীরচর্চা
- খেলা
- ড্রিল
- উষ্ণীকরণ
- শারীরিক প্রশিক্ষণ
- জিমনাস্টিকস
- অ্যাথলিটিক্স
- বিনোদন

খেলা ঃ খেলা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যা সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ প্রদান করে। খেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতিগতভাবে প্রতিযোগিতাবর্জিত এবং কার্যগতভাবে শিশুর সার্বিক বিকাশের পরিপূরক। খেলার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়মনীতির প্রয়োজন হয় না। খেলার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার আত্মপ্রকাশ ঘটাতে পারে। শিশুদের দেহ ও মনের বিকাশ ঘটাতে ‘খেলা’ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ড্রিল ঃ ড্রিল হলো ছন্দময়, শৃঙ্খলাবদ্ধ বিভিন্ন সৌন্দর্যমূলক ব্যায়ামের সমষ্টি। এর মূল লক্ষ্য হলো মৌলিক অঙ্গ সঞ্চালনগুলির (হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো ইত্যাদি) উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা। সামরিক বাহিনীতে এর বিশেষ প্রচলন আছে। ড্রিল শুধুমাত্র দেহভঙ্গিমা ও সুঅভ্যাস গঠনে সাহায্য করে।

উষ্ণীকরণ (Warming up) ঃ খেলাধুলা বা শারীরিক ক্রিয়াকলাপের পূর্বে যে পদ্ধতিতে শরীরের তাপমাত্রা, রক্ত সঞ্চালন ও পেশিতে উৎসেচকের কার্যাবলি বৃদ্ধি করা হয় তাকে উষ্ণীকরণ বলে।

উষ্ণীকরণ সাধারণত খেলাধুলায় অংশগ্রহণের পূর্বে করা উচিত, কারণ এটি প্রত্যক্ষভাবে খেলাধুলার গুণগত মানের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া এর ফলে আঘাতজনিত সমস্যা সহজে আসতে পারে না।

উষ্ণীকরণের বৈশিষ্ট্য ঃ উষ্ণীকরণের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং কীভাবে উষ্ণীকরণ করা হবে তারও কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম বর্তমান। উষ্ণীকরণের তীব্রতা থাকা উচিত। কিন্তু উষ্ণীকরণের পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের পূর্বেই শরীর অবসাদগ্রস্ত হবে না।

শারীরিক প্রশিক্ষণ ঃ শারীরশিক্ষায় বহুলপ্রচলিত শব্দটি হলো শারীরিক প্রশিক্ষণ। শারীরিক প্রশিক্ষণ বলতে সুস্থ ও সবলভাবে বেঁচে থাকার জন্য শক্তি, সহনশীলতা, ভারসাম্য, নমনীয়তা ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয়সাধন অর্জন করাকে বোঝায়। শারীরিক প্রশিক্ষণের কতকগুলি উদ্দেশ্য হলো —

১) নিয়মিত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করা

২) নিয়মশৃঙ্খলা মেনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালিত করা

৩) শরীর ও মনের কঠোরতা বৃদ্ধি করা

৪) শরীর ও মনের সমন্বিত বিকাশ ঘটানো

৫) সুস্থ ও নিরোগ দেহ অর্জন করা

শারীরিক প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়গুলি হলো— সৌন্দর্যমূলক ব্যায়াম, জিমনাস্টিকস, ড্রিল ইত্যাদি। সৈন্যবাহিনীতে সেনাদের শারীরিকভাবে সক্ষম করে তোলার জন্য শারীরিক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জিমনাস্টিকস ঃ গ্রিক শব্দ 'জিমনস' থেকে জিমনাস্টিকস কথাটি এসেছে। শুধুমাত্র গ্রিস নয়, চিনদেশেও জিমনাস্টিকসের প্রচলন ছিল। সাধারণত জিমনাশিয়ামের মধ্যে খালি হাতে বা সরঞ্জাম নিয়ে যেসমস্ত ব্যায়াম করা হয় তাকে জিমনাস্টিকস বলে। শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিমনাস্টিকস বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং এটি শারীরশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বর্তমান দিনে জিমনাস্টিকস হলো উন্নত শারীরিক কৌশল ও নৈপুণ্যনির্ভর ব্যায়াম যা জিমনেশিয়ামের মধ্যে অভ্যাস ও প্রদর্শন করা হয়।

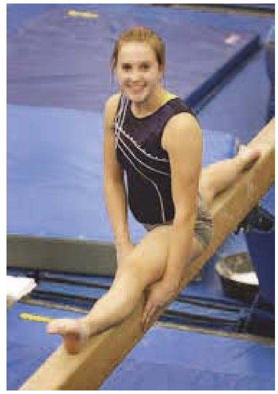

অ্যাথলিটিক্স ঃ 'অ্যাথলিটিক্স' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'অ্যাথলন' থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ প্রতিযোগিতা এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় অ্যাথলিট। ব্যাপক অর্থে সমস্ত খেলাধুলাকেই অ্যাথলিটিক্স বলা হয়। যেমন-ফুটবল, কবাডি, দৌড়োনো, লাফানো ইত্যাদি। সংকীর্ণ অর্থে অ্যাথলিটিক্স বলতে ট্র্যাক এবং ফিল্ড ইভেন্টগুলিকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক স্তরে ট্র্যাক এবং ফিল্ডের প্রথম আসর বসে 'অলিম্পিক ও বিশ্ব ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড' আসরে। ১৯৪৬ সালে ভারতে অ্যামেচার অ্যাথলিটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয়।

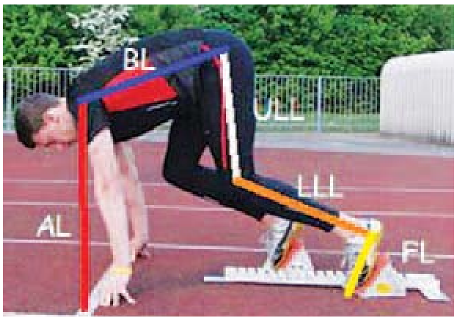

ট্র্যাকের বিভিন্ন ইভেন্টগুলি হলো রানিং ইভেন্ট। যেমন— ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ৪০০ মিটার ইত্যাদি। ফিল্ডের বিভিন্ন ইভেন্টগুলি হলো লং জাম্প, হাই জাম্প, শটপাট ইত্যাদি। ট্র্যাক এবং ফিল্ডের কিছু কিছু ইভেন্ট নিয়ে তৈরি হয় কম্বাইন্ড ইভেন্ট। যেমন— ডেকাথলন, পেন্টাথলন, ট্রায়াথলন ইত্যাদি।

বিনোদন ঃ বিনোদন হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যক্তি অবসর সময়ে সমাজস্বীকৃত যে কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ও সহজাত তৃপ্তিলাভ করে। বিনোদনের প্রধান চারটি শর্ত হলো— ১) অবসর সময় ২) স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ ৩) সমাজস্বীকৃত কাজ ৪) সহজাত তৃপ্তিলাভ। দৈনন্দিন জীবনের শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিনোদনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বিনোদনের শ্রেণিবিভাগ ঃ বিনোদনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রত্যক্ষ বিনোদন ঃ যেসকল কাজে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আনন্দলাভ করে। যেমন— গান করা, বই পড়া, আবৃত্তি করা, নাটক করা, খেলাধুলা করা ইত্যাদি।

পরোক্ষ বিনোদন ঃ যেসকল কাজে ব্যক্তি সরাসরি অংশগ্রহণ না করেও তৃপ্তি পায়। যেমন— সিনেমা দেখা, নাটক দেখা, খেলা দেখা, ভিডিয়ো গেমস ইত্যাদি।

সৃজনশীল বিনোদন ঃ অবসর সময়ে যেসকল কাজে ব্যক্তি নতুন কিছু সৃষ্টি করার চিন্তাভাবনা করে তাকে সৃজনশীল বিনোদন বলে। যেমন — বাগান তৈরি করা, কবিতা লেখা, পিরামিডের বিভিন্ন আকার তৈরি করা ইত্যাদি।

১.১.৪ বাংলার ক্লাব সংস্কৃতি - ইস্টবেঙ্গল

১৯১১ সালে একের পর এক সাহেব ও ফৌজি দলগুলিকে পর্যুদস্ত করে মোহনবাগান আই. এফ. এ. শিল্ড জয় করেছিল। খেলার মাঠে ইংরেজদের হারাবার ফলে বাঙালির মধ্যে দেশাত্মবোধের যেমন উন্মেষ হয়েছিল, তেমনি ফুটবল সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল তারা। এরপরেই স্কুলকলেজে ও পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছিল ফুটবল খেলার দল। ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দলগুলি পরবর্তীকালে সংগঠিত ক্লাবরূপে গড়ে উঠতে শুরু করে।

সালে গড়ে ওঠে ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। লিগ ও শিল্ড প্রতিযোগিতায় বাঙালি দলের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হতো। আর জুটত অবহেলা ও অসহযোগিতা। দীর্ঘদিন লিগে ভারতীয় দলগুলিকে খেলতে দেওয়া হয়নি। লিগ খেলার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে চলেছে দীর্ঘদিন আন্দোলন ও বুদ্ধির লড়াই। অবশেষে নতিস্বীকার করে ইংরেজরা লিগকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দু-একটা বাঙালি দলকে লিগে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বাধ্য হলো। তাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রথম বিভাগের লিগে দুটির বেশি ভারতীয় দল খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তারপর যখন দ্বিতীয় বিভাগ লিগ চালু হলো তখন শুরুর সময় কোনো ভারতীয় দলকেই খেলতে দেওয়া হয়নি। এরপরে অবশ্য কয়েকটি ভারতীয় দলকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে সুযোগ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিভাগের খেলাতে কুমারটুলি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের নিদর্শন স্থাপন করেছিল। ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে পরপর দুই বছর দ্বিতীয় বিভাগ লিগে রানার্স আপ হয়েছিল। ১৯১৯ সালে সাহেব ও ফৌজি দলগুলিকে হারিয়ে তারা দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে কুমারটুলি প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ পাবে। আর এর ফলে তিনটে ভারতীয় দল প্রথম বিভাগে লিগে অংশগ্রহণের মর্যাদা লাভ করবে। এতে নাকি প্রথম বিভাগের কৌলিন্য নষ্ট হয়ে যাবে। এই কারণে দ্বিতীয় বিভাগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও কুমারটুলিকে প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। তার বিনিময়ে দ্বিতীয় বিভাগে ভারতীয় দলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯১৯ সালেও দ্বিতীয় বিভাগে অংশগ্রহণ করতে হলো কুমোরটুলিকে। আরও তিনটি দলকে খেলার সুযোগ দেওয়া হলো।

সেইসময় কলকাতা ময়দানে পূর্ববঙ্গের বহু খেলোয়াড় খেলতেন। তাদের অনেকে আবার মোহনবাগানে, কেউ এরিয়ানস-এ, কেউ কুমারটুলি, জোড়াবাগান, শোভাবাজার ইত্যাদি ক্লাবে খেলতেন। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার নাগপুর গ্রামের জমিদার সুরেশ চৌধুরীর ফুটবল খেলার প্রতি দারুণ উৎসাহ ছিল। ফুটবলের জন্য তিনি দরাজ হাতে টাকা খরচ করতেন। একটা ছোটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি জোড়াবাগান ক্লাব ছেড়ে একটি নতুন শক্তিশালী ও বড়ো ক্লাব স্থাপনের মনস্থির করলেন। এই সময় কুমারটুলি পার্কে ক্যালকাটা ইউনিয়ন ক্লাবটিকে তিনি নতুনভাবে গড়ার কথা ভাবলেন। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ; তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ছোটো ক্লাবটিকে মস্ত বড়ো করে গড়ে তুলবেন। আর বদলে ফেললেন ক্লাবের নামটাও। আর তার ক্লাবের নামটা পূর্ববঙ্গের নামেই হবে। আর তাই ইংরাজিতে ক্লাবের নাম দেওয়া হলো ইস্টবেঙ্গল।

১৯২০ সালে রায়বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায়ের বাড়িতে এক সভায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হলো। এই প্রথম সভায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি হলেন স্বনামধন্য অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায়, আর যুগ্ম-সম্পাদক হলেন সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী ও রায়বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম শ্যামপার্কে অনুষ্ঠিত হারকিউলিস কাপের খেলায় ইস্টবেঙ্গল 'এ' দল ও 'বি' দলে অংশগ্রহণ করে। তখন থেকেই ইস্টবেঙ্গলের জার্সির রং লাল ও হলুদ। শ্যামপার্কের খেলায় সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের 'এ' ও 'বি' দল পরস্পরের মুখোমুখি হলো। ইস্টবেঙ্গলের 'বি' দল প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোয় ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গলের 'এ' দল। ১৯২০ সালে হারকিউলিস কাপের ফাইনালে বিদ্যাসাগর কলেজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল 'এ' দল। তখন ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ক ছিলেন গোষ্ঠ পাল।

রাজাসাহেব গোপাল রায় ১৯২০ সালে সিদ্ধান্ত নিলেন তাজহাট দলটি লিগ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেবে। এই নাম প্রত্যাহারের চিঠিটি হস্তগত করে তুরুপের তাস তার পকেটে পুরে নিলেন তৎকালীন ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তা সুরেশ চৌধুরী। তিনি সঠিক প্রত্যাশিত সময়ে তাজহাটের নাম প্রত্যাহারের চিঠি আর সেই স্থানে ইস্টবেঙ্গলের খেলার আবেদনপত্র জমা দিলেন আই. এফ. এ. অফিসে।

অবশেষে কিছুদিন পরে আই. এফ. এ.-র সভায় এই দুটি চিঠি নিয়ে বিবেচনা করা হলো। সভায় সিদ্ধান্ত হলো তাজহাট যেহেতু নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং সেইস্থানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছাড়া অন্য কোনো দল খেলার দাবি জানায়নি; তাই প্রত্যাশিতভাবেই তাজহাট ক্লাবের বদলে ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে দেবার সিদ্ধান্ত আই. এফ. এ.-র গভর্নিং বডির সভায় নেওয়া হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে প্রথমবার লিগের দ্বিতীয় বিভাগে খেলার সুযোগ পেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তাজহাট ক্লাব থেকে ইস্টবেঙ্গলে চলে এলেন ননী গোঁসাই ও ধীরা মিত্র। মোহনবাগান থেকে এলেন সুরেন চক্রবর্তী।

এছাড়াও ঢাকা আর কুমিল্লা থেকে খেলোয়াড় এনে প্রথম বছরেই শক্তিশালী দল গড়েছিল ইস্টবেঙ্গল। সেবার ইস্টবেঙ্গল দলে ছিলেন গোলে মনি তালুকদার ও নগেন কালি। ব্যাকে ভোলা সেন, ভানু দত্ত রায় ও প্রফুল্ল চ্যাটার্জী। হাফব্যাকে প্রফুল্ল মিত্র, ননী গোঁসাই, সুরেন চক্রবর্তী, বিজয় সেন ও শৈলেন বসু। ফরওয়ার্ডে নসা সেন (অধিনায়ক), দেবেন পাল, ধীরা মিত্র, প্রশান্ত বর্ধন, নেপাল চক্রবর্তী, জিতু মুখার্জী ও এস দাস।

লিগের পর শিল্ডেও যোগ দিল ইস্টবেঙ্গল। শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল সর্বপ্রথম মোহনবাগানের মুখোমুখি হয়ে ২-১ গোলে জয়লাভ করে। ওই বছর সব মিলিয়ে সাতটি ট্রফি ইস্টবেঙ্গল ঘরে তুলেছিল। ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য যে ভারতীয় দল গড়া হয়েছিল সেই ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দলের এস চক্রবর্তী, ননী গোঁসাই ও এম দত্ত রায়। আর এর মধ্যে সন্তোষের মহারাজ স্যার মন্মথ নাথ রায়চৌধুরী ও নলিনী রঞ্জন সরকার যুক্ত হয়েছেন ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে। সুরেশ চৌধুরী ও তড়িৎভূষণ রায়-এর সহযোগিতায় ন্যাশনাল এ.সি.-র মাঠটায় পুলিশের অনুমতিতে ভাগীদারি হিসাবে অনুমতি পেল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

১৯২২ সালে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেন মনা দত্ত আর আশু দত্ত। পুরোনো তো প্রায় সকলেই ছিলেন। সেবার দ্বিতীয় বিভাগ লিগে রানার্স আপ হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। লিগের পর শিল্ডের খেলা। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম খেলা পড়েছিল দ্বিতীয় বিভাগের লিগ চ্যাম্পিয়ন আর. জে. এ. দলের বিরুদ্ধে। খেলায় ১-৩ গোলে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হার স্বীকার করে নিয়েছিল লিগ জয়ী আর. জি. এ. দল।

পরের বছর ক্লাবপর্ব চালনার ভার ছেড়ে দিলেন সুরেশ চৌধুরী ও তড়িৎভূষণ রায়। ক্লাবের নতুন যুগ্ম-সম্পাদক হলেন এন. এল. রায় ও ডি. কে. রায়চৌধুরী। নসা সেন বিদেশে চলে যাওয়ার জন্য আর সেবার খেলতে পারলেন না; আর আশু দত্ত দল ছেড়ে অন্য দলে চলে গেলেন। লিগ বা শিল্ডে কোনো খেলাতেই ইস্টবেঙ্গল দল ভালো ফল করতে পারল না। লিগ তালিকায় দশম স্থানে ও শিল্ডে প্রথম রাউন্ডে হেরে বিদায় নিল ইস্টবেঙ্গল।

১৯২৪ সালে ধীরে ধীরে তৈরি হলো ইস্টবেঙ্গলের তাঁবু। ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক হেমাঙ্গ বসুর নেতৃত্বে একটির পর একটি খেলায় জিততে লাগল ইস্টবেঙ্গল। ফিরতি খেলায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজকে হারানোর পর তাদের প্রথম বিভাগে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অবশেষে ফৌজি দল ক্যামেরনস 'বি'-র সঙ্গে যুগ্মভাবে লিগ চ্যাম্পিয়ন হলো ইস্টবেঙ্গল। আর যেহেতু ক্যামেরনস 'এ' দলটি প্রথম বিভাগে খেলছে, তাই প্রথম বিভাগে খেলার দাবিদার ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু প্রথম বিভাগের লিগে ভারতীয় দলকে খেলতে দিতে আপত্তি আই. এফ. এ.-র কর্মকর্তাদের। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারাও চুপচাপ বসে রইলেন না। অবশেষে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথ নাথ রায়চৌধুরীর বাড়িতে আই. এফ. এ.-র বিশেষ সভা বসল। সেই সভায় সভাপতিত্ব করলেন আই. এফ. এ.-র সভাপতি বিচারপতি স্যার স্টিউয়াটি গ্রিভস। সেই সভায় ঠিক হয় দ্বিতীয় বিভাগের যুগ্মচ্যাম্পিয়ন হিসাবে প্রথম বিভাগে খেলার অধিকার পাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। আর প্রথম বিভাগের সর্বনিম্ন স্থানকারী ক্যালকাটা, ডালহৌসি, রেঞ্জার্স প্রভৃতি দল দ্বিতীয় বিভাগেও খেলবে।

সে বছর ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের সঙ্গে খেলার জন্যে মনোনীত হয়েছিলেন ননী গোঁসাই, মনা দত্ত ও হেমাঙ্গ বসু। ১৯২৫ সালে কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম বিভাগে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। মনা দত্ত অধিনায়ক হলেন।

১৯২৫ সালের ২০ মে লিগের খেলায় মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। খেলায় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল। ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব সাহেবদের হারিয়ে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবার সুযোগ এসে যায় ১৯৩২ সালে। কিন্তু শেষ মাসে প্রথম দিকে পরপর দু-গোলে এগিয়ে গিয়েও পরে ২-৩ গোলে হারতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলকে।

১৯৩২ সালে ইস্টবেঙ্গল বর্মা সফরে গিয়েছিল। বর্মা সফরে ইস্টবেঙ্গল মোট পাঁচটি খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে দুটিতে জিতেছিল। একটি খেলা ড্র হয়। আর বাকি দুটিতে হেরে গিয়েছিল।

১৯৩৮ সালের লিগে ইস্টবেঙ্গল চতুর্থ স্থান পেল। ১৯৫১ সালে ইস্টবেঙ্গল লিগে রানার্স আপ হলো। মোহনবাগানের কাছে তিন গোলে হারলেও ফিরতি খেলায় দুই গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে পরাজয়ের শোধ নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল।

১৯৫৩ সাল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। সেই বছরই প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গিয়েছিল ইউরোপে ও সোভিয়েত ইউনিয়নে।

সতরোর দশক ইস্টবেঙ্গলের স্বর্ণযুগ - সাফল্যের দশক। ভারতের আর কোনো ক্লাব পায়নি এমন অনন্য সম্মান। লিগ ও শিল্ড বছরের পর বছর ঘরে আসতে লাগল। আসতে থাকল রোভার্স ও ডুরান্ড কাপ। কলকাতা, দিল্লি কিংবা বোম্বাইয়ে ভারতের কোনো দল ইস্টবেঙ্গলের অপ্রতিহত জয়যাত্রাকে রুখতে পারেনি। তিরিশের দশকে গড়া মহামেডানের পরপর লিগ জয়ের রেকর্ড ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত টানা লিগ চ্যাম্পিয়ন হলো ইস্টবেঙ্গল। ১৯৭০ সালের ইস্টবেঙ্গল দলে ছিলেন **গোলে** কে সরকার ও থঙ্গরাজ; **ব্যাকে** সুধীর কর্মকার, কে. গুহ, নঈম, শান্ত মিত্র **(অধিনায়ক)**, আর. দত্ত ও এ. বসু; **হাফে** প্রশান্ত সিংহ, কাজল মুখার্জী ও এস. চৌধুরী; **ফরোয়ার্ডে** এ. চ্যাটার্জী, এস. সেনগুপ্ত, হাবিব, পরিমল দে, শ্যাম থাপা, কে. শর্মা, এস. ব্যানার্জী ও এস. দাশ।

ইস্টবেঙ্গল মূলত ফুটবল ক্লাব হলেও হকি, ক্রিকেট ও অ্যাথলিটিক্সেও আর পিছিয়ে নেই।

১.২.১ জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী

সামরিক শিক্ষার নামান্তর জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী। ইংরেজ আমলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উন্নতিসাধনেই এই প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়। ভারতের বড়ো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। তখন এর নাম ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেনিং কোর্স। ইংরেজ সেনা অফিসারদের মধ্যে যারা সার্জেন্ট ও তার ঊর্ধ্বতন, সাধারণত তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই কঠোর প্রশিক্ষণ দিতেন, তাঁদের সেনাবাহিনীর উপযোগী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা স্বভাবতই শারীরিক পটুতায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল।

এরপর ১৯৪৮ সালের ১৬ জুলাই প্রতিরক্ষা দফতরের অধীনে এইচ এন কুঁজারা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারতীয় জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের সাধারণ যুবসমাজকে দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত করা এবং যুব-ছাত্রসমাজকে সচেতন, সংবেদনশীল দেশসেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ করে প্রকৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ, একতাবদ্ধ সৎ মানুষ হিসাবে ও ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। এন সি সি-তে অংশগ্রহণের ফলে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামগ্রিক সুসংহত বিকাশ যেমন ঘটে, তেমনি নেতৃত্বদানের ক্ষমতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বন্ধুত্বপূর্ণ মানসিকতা, খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব, আদর্শ সমাজসেবকের গুণাবলির বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নিয়মানুবর্তিতায় সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষিত

জনসমাজে পরিণত হয়, যারা দেশের যে-কোনো সংকটজনক মুহূর্তে দেশসেবায় আত্মনিয়োগে ব্রতী হতে পিছপা হয় না এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর অফিসার হবার উপযোগী করে গড়ে তোলাও হয়।

- ১৯৪৮ সালে প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রদের কেবলমাত্র স্থলসেনা বিভাগের কর্মকাণ্ডে ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

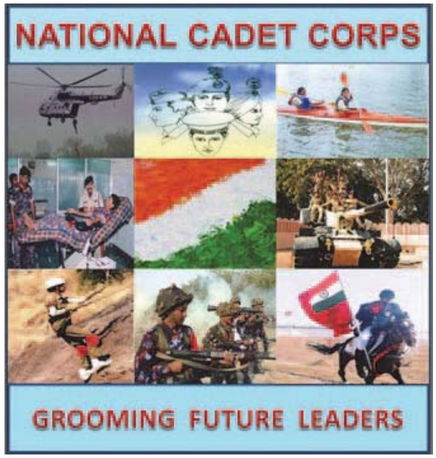

- ১৯৪৯ সালে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এন সি সি-তে যোগদানের অধিকার পায়।
- ১৯৫০ সালে বায়ুসেনা বিভাগ এন সি সি প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এন সি সি-র বায়ুসেনা বিভাগ শুরু হয়।
- ১৯৫২ সালে এন সি সি-র নৌসেনা বিভাগের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।
- ১৯৬৪ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় এন সি সি-কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসানো হয় এবং দেশের স্বার্থে সকল ছাত্রছাত্রীর এন সি সি-তে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।
- ১৯৬৬ সালে এন সি সি-তে রাইফেলচালনা শেখানো শুরু হয়।
- ১৯৬৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের এন সি সি-তে যোগদান ঐচ্ছিক করা হয়।
- ১৯৮৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রশিক্ষার্থী কল্যাণ সংস্থা গঠিত হয় প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন বিপদ থেকে রক্ষা ও সহায়তার জন্য।
- একতা ও অনুশাসন এন সি সি-র মূলমন্ত্র। নিয়মানুবর্তিতা, দক্ষতা, অদম্য ইচ্ছা ও কঠোর প্ররিশ্রম প্রশিক্ষার্থীর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
- প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষার্থীরা শেখে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে, যা তাদেরকে সৎ, সাহসী, ধর্মনিরপেক্ষ, দুঃসাহসিক, খেলাধুলায় দক্ষতাসম্পন্ন, ভ্রমণপ্রিয়, দুঃসাহসিক অভিযানপ্রিয়, প্রকৃত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।
- এন সি সি-র কর্মধারা ছাত্রছাত্রী ও যুবসমাজকে মেরুদণ্ড সোজা করে জীবনকে শৃঙ্খলিত ও সুসংহত করে বাঁচতে শেখায়। এন সি সি দেশের বৃহত্তম যুবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

১৯৮৫ সালের হিসাব অনুসারে সারা দেশে ১৭টি ডাইরেক্টরেটে দেশের ১১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ৩৭৩৪টি কলেজে, এবং ৬৩৫০টি বিদ্যালয়ে এন সি সি চালু আছে। ১১.২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এন সি সি-র সঙ্গে যুক্ত। ১৪৪টি ইউনিট দ্বারা এন সি সি-র কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়।

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের শেষ রবিবারটি ‘এন সি সি দিবস’ হিসেবে পালিত হয়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এন সি সি-র পৃথক পৃথক পতাকা ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে একটি সমন্বিত পতাকা চালু হয়। এই পতাকার রং নীল, লাল ও আকাশি। স্বপ্নময় হালকা নীল নৌসেনা বাহিনীর প্রতীক, হালকা আকাশি রং বায়ুসেনা বাহিনীর

প্রতীক, লাল রং স্থলসেনা বাহিনীর প্রতীক। এন সি সি-র প্রশিক্ষণ, পঠনপাঠন ও কর্মকাণ্ডে স্থলসেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ঃ

প্রতি সপ্তাহে দু-দিন, তিন পিরিয়ড করে প্রশিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণে এ এন ও এবং পি আই কর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। প্রতিদিন প্যারেড করবার জন্য টিফিন বাবদ টাকা পাওয়া যায়। আর জামাকাপড় কাচবার জন্য মাসিক ১০ টাকা পাওয়া যায়। এন সি সি-তে ভরতি হতে প্রথম বছর ১৯ টাকা এবং পরবর্তী দুবছর ১০ টাকা করে প্রতি বছরে লাগে। এর বিনিময়ে জামাকাপড় ও জুতো বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

প্রশিক্ষার্থীদের কী কী ধরনের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে—

(১) নিয়মিত বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণে

(২) বিভিন্ন ধরনের ৭-১০ দিনের আবশ্যিক প্রশিক্ষণ শিবিরে

(৩) বায়ুসেনা শিবিরে, নৌসেনা শিবিরে, স্থলসেনা শিবিরে

(৪) অ্যাডভান্স লিডারশিপ শিবিরে, জাতীয় সংহতি শিবিরে, পরিমার্জিত ও জাতীয় সংহতি শিবিরে

(৫) দিল্লিতে অনুষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজ-এ অংশগ্রহণ।

(৬) প্রধানমন্ত্রী র‍্যালিতে

(৭) শিপ মডেলিং, অ্যারো মডেলিং-এ

(৮) দুঃসাহসিক অভিযান, পর্বতারোহণ অভিযান, হিমালয় অভিযান, প্যারা ট্রেনিং, গ্লাইডিং, পাওয়ার ফ্লাই, বেসিক লিডারশিপ ট্রেনিং, সাইকেল অভিযানে

(৯) ইউথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে

(১০) বিভিন্ন সমাজসেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা অভিযানে

(১১) আদর্শ গ্রাম গঠন অভিযানে

(১২) রাজ্যের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ-এ অংশগ্রহণ।

ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, দেরাদুনে এন ডি এ-র পরীক্ষার মাধ্যমে বছরে দু-বার UPSC পরীক্ষা ও SSB-র যোগ্যতা নির্ধারক সাক্ষাতের মাধ্যমে সাড়ে যোলো থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে যে-কোনো প্রশিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে সে এন ডি এ-তে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

এন সি সি-র পরীক্ষা ব্যবস্থা ঃ

সপ্তম থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা জুনিয়ার বিভাগে যোগদান করতে পারে। একবছর প্রশিক্ষণের পরে পরীক্ষায় পাশ করলে 'A' শংসাপত্র পাওয়া যায়। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই শংসাপত্রধারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সিনিয়র ডিভিশন। এখানে দু-বছর প্রশিক্ষণের পরে 'B' শংসাপত্র পরীক্ষা এবং 'B' শংসাপত্র পাশ করবার পরের বছর 'C' শংসাপত্রের জন্য পরীক্ষা দেওয়া যায়। সীমাসুরক্ষা বল, কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ, মিলিটারি নার্সিং সার্ভিস, ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, সামরিক বাহিনী, শুল্ক বিভাগ, গ্রিন পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক বিভাগ প্রভৃতি চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শংসাপত্র পাশ করা প্রশিক্ষার্থীদের বিশেষ সুযোগের সংস্থান আছে।

১.৩.১ জাতীয় সংহতি সম্পর্কে ধারণা

ঐতিহ্যগতভাবে ভারতীয়রা হচ্ছেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। জাতীয় সংহতির জন্য আমাদের ধর্ম এবং ভাষাকে অস্বীকার করবার কোনো প্রয়োজন হয় না। তা কেবলমাত্র সতর্ক করে দেয় যে অন্যের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন করাটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আমরা যখন বলি তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে আমরা ধর্মবিরোধী। এর অর্থ হলো সকল ধর্মের প্রতি সমানভাবে সম্মানপ্রদর্শন করা।

(১) বহু বৎসর আগে সম্রাট অশোক অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। রক্তাক্ত কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তিনি বলেছিলেন, ''হিংসা দিয়ে রাজ্যজয় করবার পরিবর্তে মানুষের হৃদয় জয় করাটাই প্রকৃত ধর্ম''। অশোক তাঁর মহাবাণীতে বলেছিলেন ''আমরা আমাদের নিজেদের ধর্মকে ঠিকমতো শ্রদ্ধা করতে পারব না—যদি না আমরা অন্যদের ধর্মকে ঠিকমতো শ্রদ্ধার চোখে দেখতে সমর্থ হই''।

(২) জৈনধর্ম অহিংসার মূর্ত প্রতীক হিসাবে বিদ্যমান।

(৩) খ্রিস্টধর্মের মর্মবাণী হলো নিজের মতো করে তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।

(৪) ইসলামধর্মও বলেছে, তুমি কি তোমার সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসো? তাহলে ভালোবাসো মানুষকে।

(৫) শিখ ধর্মগুরু গ্রন্থসাহেবে আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন, প্রতিটি মানুষই হচ্ছে তাঁর সন্তান। তিনি হচ্ছেন সকলের। তিনি পৃথিবীর সর্বত্রই বিরাজমান।

(৬) আমাদের প্রজন্মের প্রবাদপুরুষ জ্ঞানতাপস বিশ্বজয়ী বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—

'হে ভারত, ... ভুলিও না,
নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র অজ্ঞ মুচি,
মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।'

(৭) কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় —

'মোরা একবৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসুলমান।
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।
এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবিশশি দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান।
মোরা, একবৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসুলমান।।'

(৮) জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধির ভাষায়—

'ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম।

সবকো সম্মতি দে ভগবান।'

প্রতিটি ধর্মই হচ্ছে মঙ্গলময়। 'যত মত, তত পথ'। প্রতিটি ধর্মই হচ্ছে বিভিন্ন রাস্তার মতো—যা শেষমেশ একই জায়গাতে এসে পৌঁছেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা হলো আমাদের ঐক্যের ভিত্তি। সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদ ও বিদ্বেষ আমাদের ঐক্যের পরিপন্থী। সাম্প্রদায়িকতা এবং এর ফলে যে সন্দেহ ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম হয় তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে।

যে সমস্ত মানুষের মনে ঘৃণা ও অন্ধ গোঁড়ামির জন্ম হয়েছে এবং বেড়ে উঠেছে, তাদের এই ব্যাধি থেকে আমাদের মুক্ত করে তুলতে হবে। ঐক্যের অভিযান চালাতে হবে প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি উৎসব-মঞ্চে। সাম্প্রদায়িকতা ও অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চালাতে হবে স্কুল-কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্মস্থলে, হাটে-বাজারে, ক্লাবে ও প্রচারমাধ্যমে। জাতিসমূহের প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা শান্তি চাই। এই শান্তি একে অপরের সম্পর্কের উপরে নির্ভরশীল। যদি জৈনধর্মের সারমন অফ দ্য মাউন্ট, বুদ্ধের করুণার দর্শন, হিন্দুধর্মের অহিংসার বাণী এবং আল্লাহের আদেশ পালনে ইসলাম ধর্মের এষণার সম্মেলন ঘটানো যায় এবং যদি কোরান, বেদ, ত্রিপিটক ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মঙ্গলময় দিকগুলির সম্মেলন ঘটানো যায়, তবে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, আমরা বিশ্বশান্তির জন্য সব থেকে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী মানসিকতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হব।

একটি দেশ কেবল কাগজের মানচিত্র নয়, তার অবস্থান মানুষের হৃদয়ে। সেই হৃদয় যদি বিভক্ত হয়ে যায় তাহলে জাতিও বিভক্ত হয়ে যাবে। এটা আমরা হতে দেবো না— এ আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

'হে সুপ্রিয় আমার ভারতবাসীগণ, আমাদের প্রত্যেকেরই ধর্মের ব্রত এই হউক— বিশ্বের সর্বত্র যে মানুষ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার মধ্যে বাস করে, ক্ষুধায় মারা যায় তাদের সেবা করবার জন্য যেন যোগ্য হয়ে উঠতে পারি। যেখানে ঘৃণা আর বিদ্বেষ, সেখানে যেন প্রেমের অমৃতবাণী নিয়ে আসতে পারি। যেখানে অন্যায়, সেখানে যেন ক্ষমার বাণী নিয়ে আসতে পারি। যেখানে বিরোধ, সেখানে যেন মিলনের জাদুস্পর্শ নিয়ে আসতে পারি। যেখানে বিষাদ, সেখানে যেন আনন্দ নিয়ে আসতে পারি।

আমি নিজের দুঃখে সান্ত্বনা চাই না, আমি যেন অন্যকে সান্ত্বনা দিতে পারি। আমাকে যদি কেউ ভুল বোঝে বুঝুক, আমি যেন অন্যকে ভুল না-বুঝি। আমি ভালোবাসা চাই না, কিন্তু অন্যকে যেন ভালোবাসতে পারি।

নিজের স্বার্থের কথা ভুলে গেলেও অন্যের কথা যেন না ভুলে যাই। অন্যের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হলেও যেন জীবনের শেষমুহূর্তেও এই আদর্শ পালন করতে পারি।'

প্রতিটি ভারতবাসী যারা ভারতবর্ষকে ভালোবাসেন, আমাদের সকলের উচিত আমাদের প্রতিটি কাজের মধ্যে দিয়ে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। প্রতিটি ধর্মের ধর্মীয় প্রধানেরা ভালোবাসা, করুণা ও ত্যাগের এক-একজন মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ছিল বদান্যতায় ভরা এবং তাঁরা সকলেই অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে অনুগামীদের উপদেশ দিয়েছিলেন।

এটা খুব দুঃখের বিষয় যে, আজকের দিনেও ধর্মকে কেন্দ্র করে দাঙ্গাহাঙ্গামা-বিরোধ দেখা দিচ্ছে। হামলাকারীরা সেইসব মহান যুগাবতারদের শিক্ষাদীক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে নিরপরাধ নারীপুরুষ বা শিশুদের উপর হাত উঠিয়েও শান্ত হয় না। কেউ কেউ তাদের অসম্মান ও হত্যা করতেও পিছপা হয় না। হত্যা, লুঠতরাজ এবং আগুন

লাগানো কোনোমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। এটা তাই বিশ্বাস করা কঠিন যে, কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এইসমস্ত পাশব প্রবৃত্তির মধ্যে ধর্মের কোনো যোগ আছে বলে স্বীকার করেন। আর তাই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই সমস্ত ঘটনা হয় কোনো মানসিক বিভ্রান্তির কিংবা পুরোপুরি দুষ্কৃতী বা ক্ষুদ্র, নোংরা রাজনীতির মুখোশধারীদের কাজের ফলশ্রুতি।

দাঙ্গাহাঙ্গামায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র মানুষ ও স্কুল পড়ুয়ারা। হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং শিখধর্ম, এর ফলে কোনো ধর্মের কোনো লাভ হয়নি, সম্মানের দিক থেকে কিংবা অনুগামী বৃদ্ধির দিক থেকে। যখন বিপথগামী ও সমাজবিরোধীরা ধর্মের নাম করে রাস্তায় নেমে এসে ধ্বংস ও হত্যা কিংবা লুঠতরাজ করে তা তাদের ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যেই করে।

সাম্প্রদায়িকতাকে কখনও ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার আত্মিক শক্তির ইতিহাস এটাই বলছে। মহাত্মা গান্ধি বলেছিলেন, 'আমার কাছে ধর্ম ছাড়া কোনো রাজনীতি নেই। কিন্তু সেই ধর্ম কোনো কুসংস্কারের ধর্ম বা অন্ধ গোঁড়ামির ধর্ম নয়, যা অন্যকে ঘৃণা করতে ও অপরের সঙ্গে লড়াই করতে শেখায়। আমাদের ধর্ম হলো সহিষ্ণুতার সর্বজনীন ধর্ম। যা ন্যায়পরায়ণতাহীন রাজনীতি এড়িয়ে চলতে শেখায়। এই ধর্ম হলো মানুষের অন্তরের একটা পবিত্র অনুভূতির ব্যাপার এবং যার প্রকাশ ঘটা উচিত অন্যদের জন্য সে কী করছে তার মধ্য দিয়ে।'

জাতির অভ্যুত্থানের এবং উন্নয়নের জন্য জাতীয় সংহতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। জাতীয় সংহতি রক্ষা করতে পারলে দেশের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এই জাতীয় সংহতি রক্ষা করার জন্য যেসব সামাজিক কার্যক্রম রয়েছে তার মধ্যে খেলাধুলা এবং শারীরশিক্ষার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১.৩.২ জাতীয় সংহতি রক্ষায় শারীরশিক্ষার ভূমিকা

খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার যেসমস্ত কার্যক্রম রয়েছে তা থেকে জাতীয় সংহতির বোধ জাগ্রত হয়। নীচে এবিষয়ে আলোচনা করা হলো—

(i) **দলগত খেলায় ধর্মীয় সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি—** যে-কোনো দলগত খেলায় দলগঠনের সময় খেলোয়াড়দের গুণগত মান দেখে বাছাই করা হয়। তাই একটি দলের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ সমস্ত ধর্মের খেলোয়াড়ই থাকে। খেলার মাঠে সমস্ত খেলোয়াড় তাদের ধর্মীয় বিভেদ ভুলে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটিমাত্র লক্ষ্যপূরণে ব্রতী হয়। তাই খেলাধুলার মাঠ হলো সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি ক্ষেত্র। এই সর্বধর্মসমন্বয়ের ফলে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হয়।

(ii) **দলগত খেলা বর্ণভেদপ্রথাকে অবলুপ্ত করে—** একটি দলে বিভিন্ন জাতির খেলোয়াড় থাকে, মাঠে খেলার সময় কে উচ্চবর্ণের? কে নিম্নবর্ণের? কে ব্রাহ্মণ? কে শূদ্র? তা দেখা হয় না। সকল বর্ণের মানুষ একে অপরকে সহযোগিতা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। এর ফলে সমাজের মধ্যে বর্ণভেদ অবলুপ্ত হয়। খেলার মাঠই আমাদের সকল বর্ণের মানুষকে একটি পরিচয়, 'মানুষ' হিসেবে জানতে শেখায়, যা জাতীয় সংহতিকে আরও দৃঢ় করে।

(iii) সহযোগী, সহমর্মী মনোভাব তৈরি করে — একটি দলীয় খেলায়, দলের একজন সদস্য এককভাবে কখনোই লক্ষ্যপূরণে সার্থকতা পেতে পারে না। দলের সমস্ত সদস্যদের সহযোগিতা নিয়ে যৌথভাবে মূল লক্ষ্যপূরণ করতে হয়। এর ফলে খেলোয়াড়েরা সামাজিক ক্ষেত্রেও সহযোগী মনোভাব প্রদর্শন করে, যা জাতীয় সংহতিকে আরও মজবুত করে। দলের একজন সদস্য অপর সদস্যের অসুবিধা, দুঃখ অনুধাবন করতে পারে। দলের এক সদস্যের দুঃখকষ্ট অন্য সদস্যেরা ভাগ করে নেয়, ফলে দলের মধ্যে ঐক্য তৈরি হয়। যে ঐক্য জাতীয় সংহতির মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

জাতীয় সংহতি রক্ষায় শারীরশিক্ষার ভূমিকা

(i) দলগত খেলার মাধ্যমে ধর্মীয় সমন্বয়ে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি
(ii) দলগত খেলা বর্ণভেদপ্রথাকে অবলুপ্ত করে
(iii) সহযোগী, সহমর্মী মনোভাব তৈরি করে
(iv) বিভিন্ন শিবিরের মাধ্যমে সংহতিস্থাপন

(iv) বিভিন্ন শিবিরের মাধ্যমে সংহতিস্থাপন --- খেলাধুলায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আবাসিক শিবির করা হয়ে থাকে। এই শিবিরে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন জাতির খেলোয়াড়দের একসঙ্গে, একই ছাদের তলায়, একইরকম পরিবেশে, একই কার্যক্রমের মধ্যে থাকতে হয়। এর ফলে একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে কাজ করা, খাওয়া, ঘুমানোর অভ্যেস তৈরি হয় যা জাতীয় সংহতিকে আরও মজবুত করে। এই শিবিরের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হয়, সাংস্কৃতিক বিনিময় ঘটে, এর ফলে জাতীয় সংহতি আরও দৃঢ় হয়।

কর্মপত্র

Section-1 : Recap Zone

১। শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

(i) জে আর সরমন-এর মতে শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য_______________ প্রকার।

(ii) খেলা মানুষের _______________ প্রবৃত্তি।

(iii) ড্রিল হলো _______________ শৃঙ্খলাবদ্ধ বিভিন্ন সৌন্দর্যমূলক ব্যায়ামের সমষ্টি।

(iv) গ্রিক শব্দ _______________ থেকে জিমনাস্টিকস কথাটি এসেছে।

(v) অ্যাথলিটিক্স শব্দটি _______________ শব্দ অ্যাথলন থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

(vi) _____________ সালে রায়বাহাদুর তড়িৎভূষণ রায়ের বাড়িতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(vii) _______________ সালে ১৬ জুলাই ভারতীয় জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়।

(viii) জৈনধর্ম _______________ মূর্ত প্রতীক হিসাবে বিদ্যমান।

(ix) খ্রিস্টধর্মের মর্মবাণী হলো নিজের মতো করে তুমি তোমায় _______________ ভালোবাসো।

(x) ইসলাম ধর্মও বলেছে, তুমি কি তোমার __________ ভালোবাসো? তাহলে ভালোবাসো মানুষকে।

(xi) শিখ ধর্মগুরু গ্রন্থসাহেবে এই শিক্ষা দিয়েছেন প্রতিটি মানুষই হচ্ছে তাঁর সন্তান। তিনি হচ্ছেন _____________ ।

(xii) কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়– মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম ______________ মুসলমান।

(xiii) জে. আর. সরমন-এর মতে শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য _______________ প্রকার।

(xiv) খেলা মানুষের_______________ প্রবৃত্তি।

(xv) ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জার্সির রং _______________ ।

(xvi) ভারতীয় জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী _______________ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(xvii) এন. সি. সি.-র _______________ রং নৌসেনা বাহিনীর প্রতীক।

(xviii) _______________ ভাষায় "মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান"।

২। দু-এক কথায় উত্তর দাওঃ

(i) খেলা কী?

(ii) ড্রিল কাকে বলে?

(iii) প্রত্যক্ষ বিনোদন কাকে বলে?

(iv) পরোক্ষ বিনোদন কাকে বলে?

(v) সৃজনশীল বিনোদন বলতে কী বোঝো?

(vi) কত সালে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা এন. সি. সি.-তে যোগদানের অধিকার লাভ করে?

(vii) এন. সি. সি. দিবস হিসাবে কোন দিনটিকে পালন করা হয়?

(viii) কবে, কত সালে এন. সি. সি. প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ix) অ্যাথলিটিক্‌স কাকে বলে?

(x) এন. সি. সি.-র পতাকার বর্ণনা দাও।

৩। সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো ঃ

(i) মোহনবাগান একের পর এক সাহেব ও ফৌজি দলগুলিকে পর্যুদস্ত করে প্রথম আই এফ এ শিল্ড জয়লাভ করেছিল– ১৯২০/১৯১১/২০১১/১৮১১ সালে।

(ii) ভারত-চিন যুদ্ধ হয়েছিল ১৯৬৪/১৯৬৮/১৯৪৭/১৮৬৭ সালে।

(iii) একটানা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ১৯৭০-১৯৭৫/১৯৭২-১৯৭৮/১৮১১-১৮১৭/১৯৮০-১৯৮৫ সালে।

(iv) কত সালে ভারতের অ্যামেচার অ্যাথলিটিক্‌স ফেডারেশন (AAFI) গঠিত হয়?

(ক) ১৯৪৮ (খ) ১৯৪৯ (গ) ১৯৪৬ (ঘ) ১৯৫০।

(v) অ্যাথলিটিক্‌স শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?

(ক) ইথানল (খ) মিথানল (গ) অ্যাথলন (ঘ) এথেন্স।

(vi) মোহনবাগান ক্লাব কত সালে সাহেবদের হারিয়ে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল?

(ক) ১৮১১ (খ) ১৯১১ (গ) ২০১১ (ঘ) ১৯১৬।

(vii) ১৯৫২ সালে এন. সি. সি.-র কোন বিভাগের প্রশিক্ষণ শুরু হয়?

(ক) স্থলসেনা (খ) বায়ুসেনা (গ) নৌসেনা (ঘ) পুলিশ।

(viii) ভারত-চীন যুদ্ধ হয়েছিল কত সালে?

(ক) ১৯৬৪ (খ) ১৯৬৮ (গ) ১৯৭১ (ঘ) ১৯৯৮।

৪। ভুল/শুদ্ধ নির্বাচন করো ঃ

(i) কুমারটুলি ১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে পরপর দুইবছর দ্বিতীয় বিভাগ লিগে রানার্স আপ হয়েছিল।

(ii) ১৯২৪ সালে ধীরে ধীরে তৈরি হলো ইস্টবেঙ্গলের তাঁবু।

(iii) ১৯৬৪ সালে দেশের স্বার্থে সকল ছাত্রছাত্রীদের এন. সি. সি.-তে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়।

(iv) এন. সি. সি.-র বর্ণধারা ছাত্রছাত্রী-যুবসমাজকে মেরুদণ্ড সোজা করে জীবনকে শৃঙ্খলিত ও সুসংহত করে বাঁচতে শেখায়।

(v) এন. সি. সি. দেশের বৃহত্তম যুবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

(vi) শারীরশিক্ষা জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করে।

(vii) ডুরান্ড কাপ ক্রিকেট খেলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(viii) সাম্প্রদায়িকতা আমাদের ঐক্যের পরিপন্থি।

৫। সারণির মধ্যে সমতাবিধান করো ঃ

Column A	Column B
(i) ১৯৭০ - ১৯৭৫ সাল	(a) এন. সি. সি.-র নৌসেনা বিভাগের প্রশিক্ষণ পূরণ হয়
(ii) ১৯৫২ সালে	(b) ইস্টবেঙ্গল লিগ চ্যাম্পিয়ন
(iii) প্রত্যক্ষ বিনোদন	(c) খেলা দেখা
(iv) পরোক্ষ বিনোদন	(d) গান করা, গল্পের বই পড়া, খেলা
(v) সৃজনশীল বিনোদন	(e) বাগান তৈরি করা
(vi) রানিং ইভেন্ট	(f) ২০০ মিটার দৌড়
(vii) স্থল সেনাবাহিনীর প্রতীক	(g) লাল রং

Section-3 Application and Analysis Zone

৬। রচনাধর্মী প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

(i) শারীরশিক্ষার সামাজিক বিকাশের উদ্দেশ্যগুলি ব্যাখ্যা করো।

(ii) শারীরশিক্ষার সূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের কোন গুণগুলি বিকাশলাভ করে বর্ণনা করো।

(iii) শারীরিক সক্ষমতা আমাদের কী কাজে লাগে ব্যাখ্যা করো।

(iv) খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে সামাজিকতার বিকাশ হয় কীভাবে তা ব্যাখ্যা করো।

(v) খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করলে মানসিক গুণাবলির বিকাশ হয় — ব্যাখ্যা করো।

(vi) খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করলে জাতীয় সংহতি কীভাবে গড়ে ওঠে ব্যাখ্যা করো।

(vii) জিমনাস্টিকসের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করো।

(vii) অ্যাথলিটিক্সের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করো।

Section-4 High Order Thinking Skill Zone

(i) শারীরিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝো? শরীরচর্চার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করো।

(ii) অ্যাথলিটিক্স-এর ট্র্যাক ইভেন্ট ও ফিল্ড ইভেন্ট বলতে কী বোঝো উদাহরণসহ বর্ণনা করো।

(iii) বিনোদন কাকে বলে? বিনোদনের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করো।

(iv) উষ্মীকরণ (Warming Up) বলতে কী বোঝো লেখো এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

(v) বাংলার ক্লাব সংস্কৃতিতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ইতিহাস বর্ণনা করো।

(vi) জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করো।

(vii) ভারতের জাতীয় সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তুমি তোমার মতামত লেখো।

(viii) জাতীয় সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করো।

(ix) শারীরশিক্ষার ভ্রান্ত ধারণাগুলি ব্যাখ্যা করো।

প্রকল্পঃ

(i) শারীরশিক্ষাসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শারীরশিক্ষার কোন কোন উদ্দেশ্যে সহজে পৌঁছানো গেছে, এ বিষয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করে রিপোর্ট তৈরি করো।

(ii) এন. সি. সি.-তে অংশগ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা কী কী সুবিধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করো।

(iii) তুমি সারা বছরে কোনদিন, কখন, কত সময় এবং কী ধরনের শারীরশিক্ষাসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছ এবং তোমার কী লাভ হয়েছে এবিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

(iv) শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক একটি পোস্টার এঁকে তুমি কীভাবে সচেতন করবে ।

(v) সুস্থ ও সম্পূর্ণ সুস্থ বা স্বাভাবিক নয় এমন শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করো এবং সমস্যা চিহ্নিত করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্যশিক্ষা

২.১.১ স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা

স্বাস্থ্যই 'অমূল্য সম্পদ', এই চিরসত্যটি আমরা সবাই জানি। আর প্রকৃত শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমেই ব্যক্তি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে ও তার মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা আসে। স্বাস্থ্য হলো ব্যক্তির সার্বিক অবস্থা যা তাকে যে-কোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি সমাজের ভালোমন্দ বুঝতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্য শুধুমাত্র রোগ থেকে মুক্তি বা অসুস্থতার অভাব বা শারীরিক সুস্থতা নয়, স্বাস্থ্য হলো ব্যক্তির সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক গুণাবলির এমন একটি সমন্বয় যা তাকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করে।

স্বাস্থ্য এমন একটি বিষয় যা মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের পথ দেখায় ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ যন্ত্র ও তন্ত্রগুলিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ রেখে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে, তার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

ব্যক্তির স্বাস্থ্যই হলো প্রকৃত সম্পদ। ব্যক্তির স্বাস্থ্য ব্যক্তিগত, পরিবেশগত ও সামাজিক অনেকগুলি নিয়ামক দ্বারা পরিচালিত এবং নির্ধারিত হয়।

২.২.১ স্বাস্থ্যকর বিদ্যালয় পরিবেশ

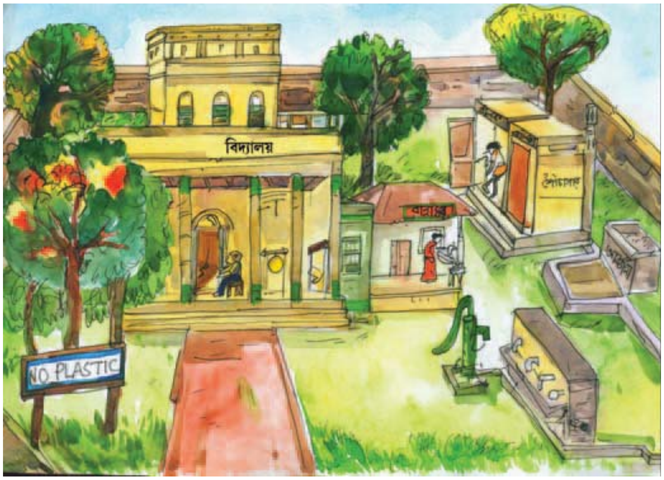

যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনে নিরলস, নির্মল, কর্মোচ্ছল সৃজনশীলতার সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারে তাকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বলে। স্বাস্থ্যরক্ষা কর্মসূচির দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে— **১) প্রত্যক্ষ দিক** - ছাত্রছাত্রীদের রোগনির্ণয় ও তার প্রতিকার করা এবং **২) পরোক্ষ দিক** - স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি ও তা রক্ষা করা। কারণ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি, শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সর্বোপরি শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করে। শুধুমাত্র সুচিকিৎসা, সুষম খাদ্যগ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের সুষম বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তার জন্য দরকার সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ যা শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়ক ও অসুবিধা দূরীকরণের পরিপূরক।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপকরণ ঃ একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়। যথা—

১) নির্মল বায়ু,	২) পর্যাপ্ত সূর্যালোক,
৩) জীবাণুমুক্ত পরিবেশ,	৪) বিশুদ্ধ পানীয় জল,
৫) স্বাভাবিক জনবসতি,	৬) উপযুক্ত স্যানিটারি ব্যবস্থা,
৭) বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুব্যবস্থা,	৮) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ
৯) জল ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ,	১০) রাজনৈতিক সুস্থতা ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা,
১১) খেলার মাঠ ও শরীরচর্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা,	১২) বিনোদনমূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা,
১৩) জনঘনত্ব, বিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী জনসমাজের শিক্ষা প্রভৃতি।	

শিক্ষায়তনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ স্বাস্থ্যরক্ষা কর্মসূচির প্রত্যক্ষ দিক, যেমন স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সুষম খাদ্য সরবরাহ করা এবং শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দূর করে স্বাভাবিক জীবনদান করা। তেমনি পরোক্ষ দিক হলো স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যোন্নতিতে সহায়তা করা এবং অসুস্থতার কারণগুলি দূর করা। সুতরাং, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা স্বাস্থ্যরক্ষা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ দিক। ইহা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন—

শিক্ষায়তনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

১) প্রতিষ্ঠানের অবস্থান
২) আকৃতি ও আয়তন
৩) ভবন ও শ্রেণিকক্ষ
৪) বিপন্মুক্ত ব্যবস্থাদি
৫) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
৬) মানবিক সম্পর্ক

১) **প্রতিষ্ঠানের অবস্থান—** শিক্ষায়তন যতটা সম্ভব শান্ত ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশে রাস্তার ধারে অবস্থিত হওয়া উচিত। যাতে যোগাযোগ ও যাতায়াতের সুবিধা হয়, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সময়মতো বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারেন এবং নিজ নিজ কর্মে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন। শান্ত পরিবেশে পঠনপাঠন প্রক্রিয়া মনোযোগ সহকারে সম্পন্ন করতে পারা যায়।

২) **আকৃতি ও আয়তন—** শিক্ষায়তনের আকৃতি এবং আয়তন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীর সদস্যসংখ্যার অনুপাতে হওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে সকলেই সুস্থতার সঙ্গে থাকতে পারে এবং যথেষ্ট পরিমাণে আলোবাতাস প্রবেশ করতে পারে।

৩) **ভবন ও শ্রেণিকক্ষ—** বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ভবন সাধারণত দক্ষিণমুখী হওয়া উচিত, যাতে সূর্যালোক ভবনের বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে। শ্রেণিকক্ষের জানালা-দরজা বড়ো এবং বায়ু চলাচলের জন্য ভেন্টিলেশন থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্রেণিকক্ষে অত্যাধুনিক শিখন উপকরণ ব্যবহারের সংস্থান থাকতে হবে। প্রতিটি ঘরে বুক কর্নার, অ্যাকটিভিটি কর্নার ও সৃজনশীল দক্ষতা-বিকাশের উপকরণ থাকলে ভালো হয়।

৪) **বিপন্মুক্ত ব্যবস্থাদি—** বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রচুর ছাত্রছাত্রী, মূল্যবান নথি ও দামি জিনিসপত্র থাকে। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো দুর্ঘটনা, বিশেষ করে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে এদের রক্ষা করার জন্য অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

৫) **পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা—** নিয়মিতভাবে শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, খেলার মাঠ পরিষ্কার করা দরকার। এতে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় থাকে ও মনের মধ্যে প্রফুল্লতার সঙ্গে কর্মপ্রেরণা জাগে।

৬) **মানবিক সম্পর্ক—** কাজের গতি এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সর্বোপরি যা দরকার তা হলো পরস্পরের মধ্যে কুশল বিনিময়, শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবোধ। উক্ত বিষয়গুলি যদি কর্মীদের মধ্যে থাকে তাহলে কাজের একটি সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয় এবং এতে মানসিকভাবে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। একে অন্যের সুখ ও দুঃখের সঙ্গী হতে পারে, জনসমাজে সমাদৃত হয়, অন্যথায় জনরোষের কবলে পড়ে, জীবনে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের রূপরেখা—

১) **কার্যালয় ঃ** শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনুযায়ী কার্যালয়ের আকৃতি হওয়া উচিত এবং এটি এমন জায়গায় অবস্থিত হবে যেখান থেকে সমস্ত শ্রেণিকক্ষগুলি লক্ষ করা যাবে, যাতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় সহজেই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারেন।

২) **বিশ্রামকক্ষ ঃ** বিদ্যালয়ে টানা ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা কেবলমাত্র পড়াশোনাতে মনোযোগ রাখা কষ্টকর। তাই একঘেয়েমি কাটানোর জন্য আলাদা বিশ্রামকক্ষের প্রয়োজন, যেখানে হালকা বিনোদনমূলক কিছু ইনডোর গেমের ব্যবস্থা থাকবে। ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা নতুনভাবে পূর্ণমনোযোগ সহকারে শিক্ষালাভ করতে সক্ষম হবে।

৩) মিড-ডে মিল খাওয়ার স্থান

৪) বিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থা ও নিরাপত্তা

৫) টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ

৬) কর্মশালা

৭) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাগান

৮) বিদ্যালয়ের নিয়মশৃঙ্খলা

৯) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত

১০) **আসবাবপত্র ঃ** শ্রেণিকক্ষের আসবাবপত্র শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা আরামে বসে শিক্ষালাভ করতে পারে, তা না হলে শিশুদের বিভিন্নরকম খারাপ দেহভঙ্গিমা হতে পারে। তাই বেঞ্চের উচ্চতা, শিক্ষার্থীদের উচ্চতা ও ব্ল্যাকবোর্ডের দূরত্ব অনুযায়ী হবে।

১১) **পাঠাগার ঃ** শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের সহজেই সরবরাহ করার জন্য প্রতিটি শিক্ষায়তনে একটি আদর্শ পাঠাগার থাকা উচিত এবং এই পাঠাগার থাকবে শিক্ষায়তনের মধ্যেই নিরিবিলি জায়গায়। যথেষ্ট খোলামেলা জায়গা থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাতে ব্যাঘাত না ঘটে।

১২) **খেলার মাঠ ঃ** বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ বিদ্যালয়ের সুস্থ পরিবেশ রচনার সহায়ক এবং শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক দিকের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয়", অর্থাৎ শরীর ও মন সুস্থ রাখতে হলে কায়িক শ্রম অবশ্যই করণীয়। খেলাধুলার মাধ্যমে কায়িক শ্রম করে শরীরকে অধিক কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা যায়। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে শারীরশিক্ষা কার্যক্রম-এর বাস্তব রূপদানের জন্য একটি উপযুক্ত খেলার মাঠ অবশ্যই প্রয়োজন।

১৩) জল সরবরাহ ঃ বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য খারাপ ও জলবাহিত বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। জলনিকাশের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বাহ্যিক কোনো জল বা বৃষ্টির জল জমে নানারকম রোগের জীবাণু সৃষ্টি হতে পারে, যা শিশুদের সুস্বাস্থ্যের পরিপন্থি।

১৪) শৌচাগার ঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে। ছাত্র ও ছাত্রী এবং শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক পৃথক শৌচাগার নির্মাণ করতে হবে। শৌচাগারগুলি নিয়মিতভাবে জীবাণুনাশক পদার্থ যেমন ফিনাইল, ন্যাপথলিন, কার্বলিক অ্যাসিড প্রভৃতি দিয়ে পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শৌচাগারের জল নির্দিষ্ট একটি জায়গায় আবদ্ধ রাখা উচিত।

১৫) আরোগ্যশালা ঃ প্রতিটি শিক্ষায়তনে একটি করে আরোগ্যশালা থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য আরোগ্যশালার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রয়োজনে যথাস্থানে পাঠানো হবে। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে এই কাজটি করা যেতে পারে।

খেলার মাঠের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

শারীরশিক্ষা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো খেলার মাঠ। খেলার মাঠ ব্যতিরেকে শারীরশিক্ষা কার্যক্রমের কোনো কর্মসূচি সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এবং শরীরচর্চা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য একটা আদর্শ খেলার মাঠ একান্ত প্রয়োজন। খেলার মাঠকে বলা হয় শারীরশিক্ষা কার্যক্রমের ল্যাবরেটরি। তাই প্রতিটি শিক্ষায়তনে এবং প্রতিটি গ্রাম বা শহরে অন্তত একটি করে আদর্শ মাঠ থাকা প্রয়োজন। একটি আদর্শ খেলার মাঠের পরিবেশ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

১) খেলার মাঠ বিদ্যালয় সংলগ্ন বা গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে হবে

২) আদর্শ খেলার মাঠ কমপক্ষে ১৩০ মিটার দীর্ঘ ও ৯০ মিটার প্রস্থ হবে

৩) খেলার মাঠ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা উচিত, যাতে করে গবাদিপশু প্রবেশ করতে না পারে

৪) মাঠে প্রবেশের জন্য একাধিক নির্দিষ্ট প্রবেশপথ থাকবে

৫) মাঠে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস থাকা উচিত এবং চারপাশে শোভাবর্ধনকারী চিরহরিৎ বৃক্ষ লাগানো ভালো

৬) খেলার মাঠ উত্তর-দক্ষিণমুখী হলে ভালো হয়, পর্যাপ্ত দর্শকাসন থাকবে

৭) খেলোয়াড়দের পোশাক পরিবর্তনের জন্য ছেলে ও মেয়েদের আলাদা ঘর থাকবে

৮) স্বাস্থ্যকর শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকবে, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক

৯) মাঠে যাতে জল না জমে তার জন্য মাঠ হবে সমতল ও মধ্যবর্তী অঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু

১০) মাঠের চারপাশে জলনিকাশি ব্যবস্থা থাকবে এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে

১১) খেলার সরঞ্জাম রাখার জন্য মাঠের একপাশে মালঘর থাকবে

১২) মাঠের পরিচর্যা করার জন্য একজন মালি থাকবে

১৩) মাঠের স্থায়ী উপকরণ যেমন গোলপোস্ট, খো-খো পোল, ভলিবল কোর্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে

১৪) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে, মাঠের চারপাশে আলোর ব্যবস্থা থাকবে

১৫) খেলার পরিচালক ও বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য বিশ্রামকক্ষ থাকবে

১৬) অংশগ্রহণকারী দুই দলের প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত আসনের ব্যবস্থা থাকবে

২.৩.১ দেহভর সূচক

দেহভর সূচক হলো মানবদেহের উচ্চতা ও ওজন অনুপাত অনুসরণ করে মেদ পরিমাপের একটি বিশেষ পদ্ধতি। সাধারণত শরীরের উচ্চতার সাপেক্ষে ওজন কতটা হওয়া উচিত এবং মেদের পরিমাণ কম বা বেশি জানার জন্য দেহভর সূচক ব্যবহার করা হয়। আগে এই সূচকটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের উপর প্রয়োগ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে শিশুদের উপরও প্রয়োগ করা হয়।

১৮৩০-১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেলজিয়াম পরিসংখ্যানবিদ অ্যাডলফ কুইটেলেট প্রথম এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন। পরে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান গণিতবিদ কিস দেহভর সূচকের বিভিন্ন তথ্যের আধুনিকীকরণ করেন।

সংজ্ঞা ঃ দেহভর সূচক এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানবদেহের উচ্চতা ও ওজনের অনুপাতে দেহে উপস্থিত মেদের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে এই সূচক দেহে মেদের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারলেও মেদ পরিমাপ করতে পারে না।

২.৩.২ দেহভর সূচকের সূত্র

$$\text{দেহভর সূচক} = \frac{\text{ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{উচ্চতা(মিটার)}^2}$$

একজন মানুষের ওজন যদি ৭০ কেজি হয় এবং উচ্চতা যদি ১.৬০ মিটার হয়, তাহলে তার দেহভর সূচক—

$$\text{দেহভর সূচক} = \frac{\text{৭০কিলোগ্রাম}}{\text{১.৬ মিটার} \times \text{১.৬ মিটার}} = \frac{\text{৭০}}{\text{২.৫৬}} = \text{২৭.৩৪ কিলোগ্রাম/মিটার}^{\text{২}}$$

সুতরাং, ওই ব্যক্তিটি বেশি ওজনের শ্রেণিভুক্ত।

দেহে উপস্থিত মেদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে দেহকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

শ্রেণি	সূচক
কম ওজন	১৮.৫-এর কম
সাধারণ ওজন	১৮.৫-২৪.৯
বেশি ওজন	২৫-২৯.৯
স্থূলকায়	৩০-এর বেশি
চরম স্থূলত্ব	৪০-এর বেশি

. **সূচক ১৮.৫-এর কম ঃ** দেহভর সূচকের মান ১৮.৫-এর কম হলে ব্যক্তিকে কম ওজনবিশিষ্ট বলা হয়। এই শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে। যেমন—নিদ্রাহীনতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস ইত্যাদি।

সূচক ১৮.৫-২৪.৯ ঃ এই ধরনের সূচকের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ওজন স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর বলা হয়। স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ করা উচিত।

সূচক ২৫-২৯.৯ ঃ এই শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তির ওজন উচ্চতার তুলনায় বেশি হয়। এই শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সমস্যা আসতে পারে। যেমন - উচ্চ রক্তচাপ, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

সূচক ৩০-এর বেশি ঃ এই শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের স্থূলকায় বা মেদবহুল বলা হয়। অতিরিক্ত ক্যালোরিযুক্ত খাদ্যগ্রহণ ও তার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি অনীহা এই সমস্যার মূল কারণ।

প্রয়োজনীয়তা ঃ

১) বর্তমানে চিকিৎসাবিদ্যায় দেহভর সূচকের গুরুত্ব অপরিসীম

২) উচ্চতা অনুসারে ওজন কম বা বেশি হলে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়

৩) সহজ ও দ্রুততার সঙ্গে দেহের মেদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়

৪) বিনাখরচে ঘরে বসেই দেহভর পরিমাপ করা যায়

৫) ব্যক্তি কোন শ্রেণিভুক্ত তা জানা যায় এবং সেই অনুযায়ী সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে শরীরচর্চা বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হয়

Indian Council for Medical Reaserch-এর গবেষণা অনুসারে ভারতীয়দের বয়স ও লিঙ্গভেদে ওজন, উচ্চতা ও দেহভর সূচক ঃ

বালক			বয়স	বালিকা		
ওজন কিগ্রা	উচ্চতা মিটার	বি এম আই	বছর	ওজন কিগ্রা	উচ্চতা মিটার	বি এম আই
১১.২	০.৮২৪	১৬.৫	১+	০.১০৭	০.৮১৬	১৬.১
১৩.০	০.৯০৭	১৫.৮	২+	১২.৬	০.৮৯৮	১৫.৬
১৪.৮	০.৯৯১	১৫.১	৩+	১৪.৪	০.৯৮২	১৪.৯
১৬.৫	১.০৫৭	১৪.৮	৪+	১৬.০	১.০৫১	১৪.৫
১৮.২	১.১১৫	১৪.৬	৫+	১৭.৭	১.১১০	১৪.৪
২০.৪	১.১৮৫	১৪.৫	৬+	২০.০	১.১৭৫	১৪.৫
২২.৭	১.২৪৩	১৪.৭	৭+	২২.৩	১.২৩৬	১৪.৬
২৫.২	১.৩০১	১৪.৯	৮+	২৫.০	১.২৯২	১৫.০
২৮.০	১.৩৪৬	১৫.৫	৯+	২৭.৬	১.৩৫০	১৫.১
৩০.৮	১.৪০০	১৫.৭	১০+	৩১.২	১.৪০৯	১৫.৯
৩৪.১	১.৪৪৮	১৬.৩	১১+	৩৪.৮	১.৪৫৩	১৬.৫
৩৮.০	১.৫১১	১৬.৬	১২+	৩৯.০	১.৫০২	১৭.৩
৪৩.৩	১.৫৭০	১৭.৬	১৩+	৪৩.৪	১.৫৩৮	১৮.৩
৪৮.০	১.৬৩০	১৮.১	১৪+	৪৭.১	১.৫৭০	১৯.১
৫১.৫	১.৬৬৩	১৮.৬	১৫+	৪৯.৪	১.৫৮৮	১৯.৬
৫৪.৩	১.৬৮৩	১৯.২	১৬+	৫১.৩	১.৫৯৩	২০.১
৫৬.৫	১.৭০০	১৯.৬	১৭+	৫২.৮	১.৬০২	২০.৬
৫৮.৪	১.৭১৩	১৯.৯	১৮-১৯	৫৩.৮	১.৬১১	২০.৭
৬০.৫	১.৭২৫	২০.৩	২০-২৪	৫৪.৮	১.৬০৭	২১.২
৬২.০	১.৭২৩	২০.৯	২৫-২৯	৫৬.১	১.৬১০	২১.৬

২.৪.১ মেদাধিক্য

অত্যধিক মোটা, বেশি ওজনবিশিষ্ট অবস্থা সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। শরীরে মেদের পরিমাণ অত্যধিক হলে এবং অ্যাডিপোস টিস্যু বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার অবস্থাকে স্থূলত্ব বলে। সাধারণত পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ওজনের ১৫% এবং মহিলার ২৫% মেদ থাকে। এই মেদের পরিমাণ ৫% বেশি হলে স্থূলত্বের সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয়, এই সমস্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বর্তমান।

অতিরিক্ত মোটা বা ওজন বৃদ্ধির কারণ ঃ অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়ার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। যেমন—

পারিবারিক রীতি— অনেকের ধারণা যে মোটা হওয়া একটি বংশগত ধারা। আসলে কিন্তু বংশধারার সঙ্গে মোটা হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, কোনো পরিবারে আবহমানকাল থেকেই মাখন, ঘি, চিনি ইত্যাদি অত্যধিক তাপমূল্যের খাদ্য বেশি পরিমাণে খাওয়ার প্রথা প্রচলিত। এক্ষেত্রে মোটা হওয়া প্রায় বংশগত পর্যায়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আসল কারণ হলো প্রয়োজনের অধিক তাপমূল্যের খাদ্যগ্রহণ।

শরীরচর্চার অনভ্যাস— শরীরচর্চা বা নিয়মিত ব্যায়াম না করা মোটা হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। পার্বত্য অঞ্চলে সাধারণত স্থূল মানুষ দেখা যায় না, কারণ দৈনন্দিন জীবনে তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সুতরাং, গৃহীত ক্যালোরির যদি সঠিক ব্যয় না করা যায় তাহলে স্থূলত্ব আসতে পারে।

অর্থনৈতিক অবস্থা— অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্যগ্রহণ করে থাকেন, যা তাকে স্থূলকায় ব্যক্তিতে পরিণত করে।

পেশা পরিবর্তন— পেশা পরিবর্তন হলেও মোটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন একজন কাঠুরিয়া যদি কাঠ কাটা ত্যাগ করে কেরানির কাজ গ্রহণ করেন এবং তিনি যদি খাদ্যতালিকার কোনোরূপ পরিবর্তন না করেন তাহলে তিনি অচিরেই স্থূলকায় হয়ে পড়েন।

হরমোনের ভারসাম্যের অভাব— অনেক সময় থাইরয়েড ও পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে উপযুক্ত হরমোন নিঃসৃত না হলে বিপাকক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। ফলে দেহ স্থূলকায় হয় এবং ওজন বৃদ্ধি পায়। তবে এই কারণে মোটা হওয়া লোকের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগের কম।

খাদ্যাভ্যাস— খাদ্য আমাদের বৃদ্ধি, বিকাশ ও শক্তি উৎপাদনের মূল উৎস। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অধিক খাদ্যগ্রহণ মোটা হওয়ার প্রধান কারণ। খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলি হলো কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন,

খনিজ লবণ। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় খাদ্যগ্রহণের অনুপাত ৪:১:১ হওয়া উচিত, কারণ ৬০-৭০% শক্তি আসে কার্বোহাইড্রেট থেকে, ১০-২৫% প্রোটিন থেকে এবং ২০-৩০% শক্তি আসে ফ্যাট থেকে। শক্তির মূল উৎস হলো কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট। আবার কার্বোহাইড্রেট ফ্যাটের তুলনায় সহজপাচ্য এবং এই কারণেই ফ্যাটের তুলনায় কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ করা উচিত। খাদ্যগ্রহণের এই অনুপাত বজায় না রাখতে পারলে অর্থাৎ স্নেহজাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ করলে মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

বয়সের কারণ ঃ ২৫ বছর বয়সের পর থেকে প্রতি বছর ১ কিলোগ্রাম শরীরের ওজন বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অল্পবয়সে দেহের চাহিদা অনুসারে যে ধরনের খাদ্য খাওয়া হয় তা অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে ত্যাগ করতে না পারলে অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য দেহ স্থূলকায় হয়ে পড়তে পারে।

ওজন কমাবার নীতি ঃ

১) পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭% ও মহিলাদের ১২% মেদ কমানো সম্ভব।

২) ১ পাউন্ড মেদ কমানোর জন্য অতিরিক্ত ৩৫০০ ক্যালোরি শক্তি খরচ করা প্রয়োজন।

৩) সপ্তাহে ৪ পাউন্ডের বেশি ফ্যাট ঝরানো উচিত নয়, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

৪) প্রতিদিন খাদ্য থেকে ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ এবং কাজের মাধ্যমে ক্যালোরি খরচের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত।

৫) খাদ্য থেকে যে পরিমাণ ক্যালোরি পাওয়া যায় তার থেকে বেশি পরিমাণ ক্যালোরি খরচ করতে হবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করে।

৬) প্রতিদিন যে পরিমাণ ক্যালোরি প্রয়োজন তার থেকে ২০০০ ক্যালোরি কম খাবার গ্রহণ করতে চাইলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

৭) ব্যবহারিক জীবনে পরিবর্তন আনতে হবে এবং ঠান্ডা পানীয়, ফ্যাট, শর্করাজাতীয় খাদ্যগ্রহণ কমাতে হবে।

মেদ ঝরাতে কী কী করতে হবে?

১) শিশুদের খিদে পেলে তবেই খেতে দিতে হবে। খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২) অধিক পরিমাণ শাকসবজি খেতে হবে এবং স্নেহজাতীয় খাদ্য, মাছমাংস যথাসম্ভব কম খেতে হবে।

৩) যখনতখন ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

৪) প্রতিদিন ৩০-৪৫ মিনিট ধরে ঘাম ঝরানো ব্যায়াম করতে হবে।

৫) মিষ্টিজাতীয় খাবার, ফাস্টফুড, অতিরিক্ত তেল-ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার বর্জন করতে হবে।

৬) খেলাধুলা-ব্যায়াম-শরীরচর্চায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে হবে।

মেদবৃদ্ধি রুখতে কী কী ব্যায়াম করতে হবে?

১) শশংগাসন	২) উষ্ট্রাসন	৩) অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন
৪) পদহস্তাসন	৫) অর্ধচন্দ্রাসন	৬) ত্রিকোণাসন
৭) সর্বাঙ্গাসন	৮) বৃষাসন	৯) হলাসন
১০) শীর্ষাসন	১১) ধনুরাসন	১২) চক্রাসন
১৩) তালাসন	১৪) সিট আপ	১৫) লেগ সাইড কিকিং
১৬) বার্পি	১৭) স্পট জাম্প	১৮) জাম্পিং জ্যাক

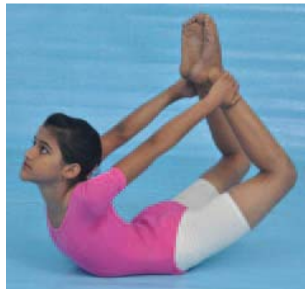

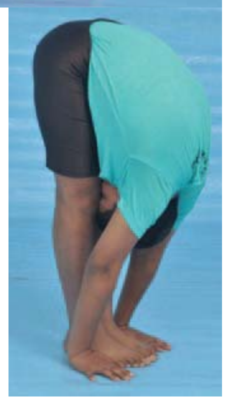

আমাদের দৈনিক খাদ্য থেকে প্রাপ্ত ক্যালোরির পরিমাণ বেশি হলে অর্থাৎ উদ্‌বৃত্ত ক্যালোরি আমাদের দেহে জমা হতে থাকলে তাকে আমরা ধনাত্মক শক্তির ভারসাম্য বলে থাকি। যার ফলে দেহের ওজন বৃদ্ধি ঘটে। ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থীর প্রতিদিন ৫০০ ক্যালোরি শক্তি উদ্‌বৃত্ত হচ্ছে তার দৈনিক চাহিদার তুলনায়। তাহলে এইরূপ ৭ দিনে তার দেহে উদ্‌বৃত্ত ক্যালোরি জমা হবার পরিমাণ ৩৫০০ ক্যালোরি। এই উদ্‌বৃত্ত জমা ক্যালোরি দেহের ওজন বৃদ্ধি করে এক পাউন্ড। ওই শিক্ষার্থী যদি কঠোর ব্যায়াম অনুশীলন করে তাহলে তার ওই উদ্‌বৃত্ত ক্যালোরি মেদহীন দেহের পেশি গঠন করবে, আর কঠোর অনুশীলন না করলে দেহে মেদবৃদ্ধির দ্বারা ওজন বৃদ্ধি করবে।

আমাদের দৈনিক খাদ্য থেকে উৎপন্ন ক্যালোরির পরিমাণ দৈনিক কাজের ফলে ব্যয়িত ক্যালোরির পরিমাণ থেকে কম হলে তাকে বলা হয় ঋণাত্মক শক্তির ভারসাম্য। এই ক্যালোরি ঘাটতি পূরণ করবার জন্য আমাদের দেহের মেদকলা ভেঙে গিয়ে শক্তি উৎপন্ন হয়ে ক্যালোরিতে রূপান্তরিত হয়। ধরা যাক প্রতিদিন ঘাটতির পরিমাণ ৫০০ ক্যালোরি। তাহলে এক সপ্তাহে তার মোট ঘাটতির পরিমাণ ৩৫০০ ক্যালোরি অর্থাৎ সপ্তাহে ওই শিক্ষার্থীর দেহে এক পাউন্ড ফ্যাট/ চর্বি খরচ হয়ে ৩৫০০ ক্যালোরি শক্তির জোগানের ঘাটতি পূরণ করবে । এর ফলে ওই ব্যক্তির দেহে এক পাউন্ড ফ্যাট খরচ হবার ফলে এক পাউন্ড ওজন কমবে। পরিমিত খাদ্যাভ্যাস ও নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা মেদবাহুল্য দূর করা সম্ভব।

২.৪.২ অপুষ্টি

জীবের যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য সকলপ্রকার পরিপোষকই সঠিক মাত্রায় গ্রহণ করা উচিত। পরিপোষকের অনুপাতের মাত্রা সঠিক না হলে এবং কম পরিমাণ খাদ্যগ্রহণ করলে সাধারণত অপুষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ ৬টি পরিপোষকের (প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল) যে-কোনো একটির অভাব থেকেও অপুষ্টি আসতে পারে।

সংজ্ঞা ঃ সুষম খাদ্যের ক্রমাগত অভাবে শরীরের রোগাক্রান্ত অবস্থাকে অপুষ্টি বলে।

অপুষ্টির কারণ ঃ অপুষ্টির পিছনে দু-রকম কারণ থাকতে পারে।

১) খাদ্যগ্রহণের অনভ্যাস বা খাদ্যের অভাব।

২) পরিবেশ পরিস্থিতি।

১) খাদ্যগ্রহণের অনভ্যাস বা খাদ্যের অভাব ঃ

ক) প্রাণীজ পুষ্টির অভাব ও ক্রমাগত দুর্মূল্য বাজারদর।

খ) সঠিক অনুপাতে স্নেহজাতীয় পদার্থ গ্রহণ না করা।

গ) গৃহীত খাদ্যে ম্যাক্রো (অত্যাবশকীয় মৌল উপাদান অক্সিজেন, লৌহ ইত্যাদি) ও মাইক্রো উপাদানগুলির অভাব।

ঘ) দেহগঠনকারী খাদ্যগুলি সঠিক অনুপাতে না খাওয়া।

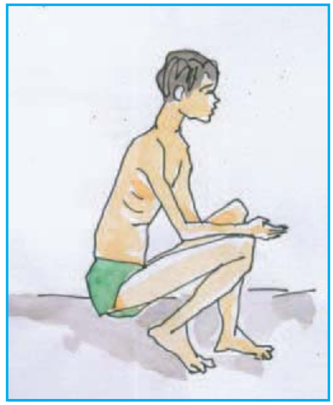

২) পরিবেশজনিত বাধা ঃ

ক) কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় খাদ্য উৎপাদনে সমস্যা।

খ) অতি দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

গ) কৃষিকার্যে অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ।

ঘ) খাদ্যগুণ অনেকাংশে হ্রাস পাওয়া।

ঙ) দারিদ্র্য-বেকারত্ব-দূষণ অপুষ্টির অন্যতম কারণ।

চ) পুষ্টিবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।

ছ) কর্মব্যস্ততাকে উপেক্ষা করতে না পারা।

অপুষ্টিজনিত রোগ ঃ পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের অভাবে নানাবিধ রোগ হতে পারে। সাধারণত পুষ্টির অভাবে রাতকানা, শ্বাসকষ্ট, বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট, চর্মরোগ ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রতিকারের ব্যবস্থা ঃ অপুষ্টি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে গেলে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত কারণ স্বাস্থ্যই সম্পদ। অপুষ্টির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা উচিত—

১) খাদ্যদ্রব্য মানুষের জীবনের ভিত্তি ও প্রধান অবলম্বন, তাই নিয়মিত সঠিক অনুপাতে খাদ্যগ্রহণ করা উচিত।

২) খাদ্যগ্রহণ করলেই হবে না, মনে রাখা প্রয়োজন সেই খাদ্য শরীর গ্রহণ করতে পারছে কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে।

৩) মিষ্টি, ভাজা ও মশলাজাতীয় খাদ্য যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভালো।

৪) খাওয়ার সময় ও খাওয়ার ঠিক পরে জলপান না করে এক থেকে দেড় ঘণ্টা পরে জলপান করা উচিত।

৫) রাত্রে বেশি দেরি না করে শুয়ে পড়া ও সকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করা প্রয়োজন।

৬) খালি পেটে চা-কফিজাতীয় পানীয় গ্রহণ করা অনুচিত।

৭) সুষম খাদ্যের পাশাপাশি ফল খাওয়া উচিত।

৮) নিয়মিত যোগাসন ও ব্যায়াম করতে হবে।

৯) নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে।

১০) বয়স, লিঙ্গ ও পরিশ্রম অনুযায়ী ক্যালোরি গ্রহণ করা উচিত।

১১) পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

খেলাধুলার উপর অপুষ্টির প্রভাব ঃ অপুষ্টি খেলাধুলার দক্ষতা প্রদর্শন ও অর্জনের পরিপন্থী। পুষ্টির অভাব থাকলে সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়, ফলে সে কোনো কাজেই মনোযোগী হতে পারে না। এছাড়া শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন না হওয়ায় তার মধ্যে শক্তি ও সহনশীলতার অভাব দেখা যায়। শারীরিক সক্ষমতাও পুষ্টির উপর নির্ভরশীল। ফলে শারীরিক সক্ষমতার অভাবে খেলাধুলার উপযুক্ত দক্ষতা দেখানো সম্ভব হয় না।

অপুষ্টির ফলে শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন হয় না ও শরীরে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন ব্যাহত হয়। শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হওয়ায় ব্যক্তি ক্রমশ দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে; ফলে খেলাধুলায় ভালো ফল করতে পারে না।

২.৫.১ স্বাস্থ্যের উপর ব্যায়ামের প্রভাব

নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক ক্রিয়াকলাপ স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ প্রভাববিস্তার করে । ব্যায়াম দেহ ও মনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে, যা স্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এছাড়া ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধক সক্ষমতা বাড়িয়ে ও রোগাক্রমণের সম্ভাবনা কমিয়ে তাকে স্বাস্থ্যবান করে তোলে। নিয়মিত ব্যায়াম অনুশীলনে ব্যক্তি শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। ব্যক্তির পেশিসমূহের আয়তন ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যক্তি সুঠাম ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী হয়। স্বাস্থ্যের উপর ব্যায়ামের বিভিন্ন প্রভাবগুলি হলো—

শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যায়ামের প্রভাব ঃ

১. হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

২. বিশ্রামকালীন হৃৎস্পন্দনের হার কম হয়।

৩. ফুসফুসের আয়তন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৪. কোশে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা বাড়ে, ফলে বেশি পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।

৫. স্থূলকায় ব্যক্তির ফ্যাট কমাতে সাহায্য করে।

৬. ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৭. শক্তি, সহনশীলতা, নমনীয়তা, গতি, ভারসাম্য ইত্যাদির উন্নতি হয়; ফলে শারীরিক সক্ষমতা বাড়ে।

৮. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৯. শারীরিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে তোলে।

১০. স্নায়ু ও মাংসপেশির মধ্যে সমন্বয়সাধন হয়। ফলে যে-কোনো কাজ সহজে করা সম্ভব হয়।

সামাজিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

প্রতিদিন খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে ধনী, দরিদ্র, জাতি, ধর্ম প্রভৃতি ভেদাভেদ দূর করে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয় যা সামাজিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। এছাড়া—

১. নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

২. সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

৩. পরস্পরকে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

১. উদ্বেগ ও হতাশা কমাতে সাহায্য করে।

২. যে-কোনো পরিবেশে ব্যক্তিকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে।

৩. কাজের প্রতি মনঃসংযোগ বৃদ্ধি পায়।

৪. মনোভাবের উন্নতি ঘটায়।

৫. মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে।

৬. মানসিক গুণাবলির উন্নতি ঘটায়। যেমন- বিশ্লেষণ শক্তি, মানসিক দৃঢ়তা ইত্যাদি।

৭. আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম বাড়াতে সাহায্য করে।

রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা ঃ

১. ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় ও ডায়াবেটিস হলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

২. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

৩. কোলন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়।

৪. হাইপোকাইনেটিক্স বা কম পরিশ্রমজনিত রোগ, যেমন- মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ, স্পন্ডিলাইটিস, শরীরের ওজন বৃদ্ধি, ফ্যাট বৃদ্ধি ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

৫. পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি হয়, ফলে পেটের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায় ।

৬. ব্যায়াম পেশির চোট প্রতিকারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপায়।

গর্ভবতী মহিলার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

১. গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা, হিমোগ্লোবিনের অভাব ইত্যাদি সমস্যাগুলি হ্রাস পায়।

২. জন্মের পূর্বে শিশুমৃত্যুর হার কম হয়।

৩. হৃৎপিন্ড কর্মক্ষম থাকে ও হৃদ্‌রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৪. প্রসূতি-মৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করে।

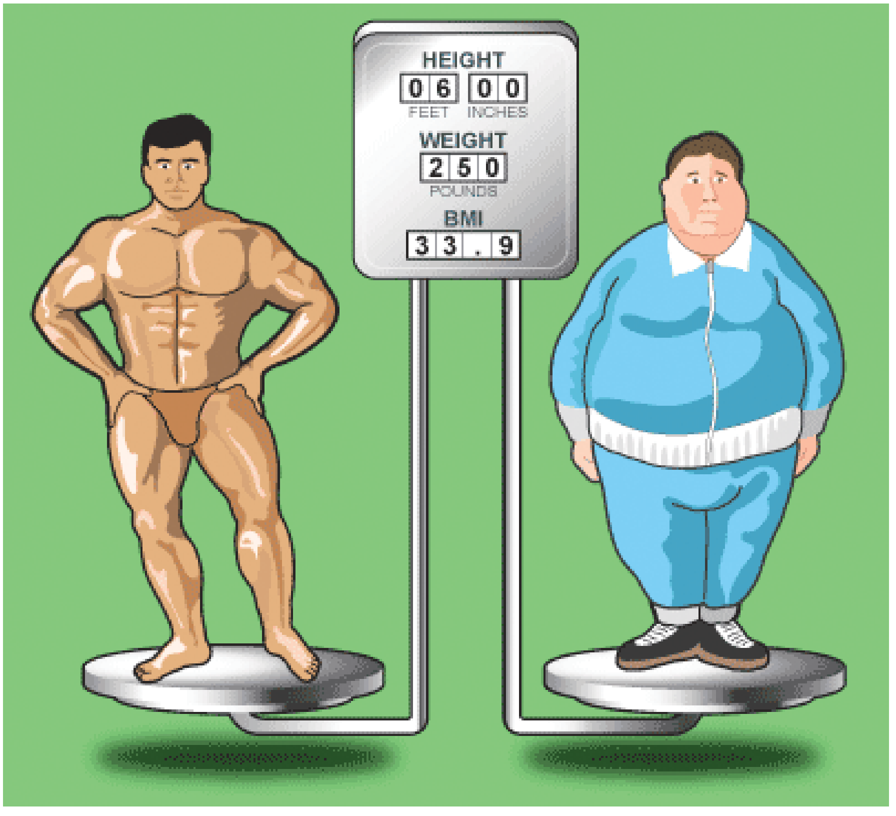

কর্মপত্র

Section-1:Recap Zone

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(i) কাকে বংশগতির ধারক ও বাহক বলে?

(ii) GNP-র পুরো নাম কী?

(iii) একটি আদর্শ খেলার মাঠের পরিমাপ কত?

(iv) দেহভর সূচক কী?

(v) খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলি কী কী?

২। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি ঃ

(i) পুষ্টি কাকে বলে? অপুষ্টির কারণগুলি লেখো।

(ii) ওজন কমানোর দুটি নীতি বর্ণনা করো।

(iii) মেদ বৃদ্ধি রোধ করে এমন চারটি ব্যায়ামের নাম লেখো।

(iv) মানসিক স্বাস্থের উপর ব্যায়ামের দুটি প্রভাব আলোচনা করো।

(v) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা লেখো।

(vi) চামড়া পরিরোপণ (Skin Grafting) কী?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন

(a) ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষায় পরিবেশগত নিয়ামকগুলি বর্ণনা করো।

(b) স্বাস্থ্যশিক্ষা কাকে বলে? বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কর্মসূচি কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

(c) স্বাস্থ্য নির্দেশ কী? স্বাস্থ্য নির্দেশের দুটি প্রকৃতি আলোচনা করো।

(d) শিক্ষায়তনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কোন কোন বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল? যে-কোনো দুটি বিষয় আলোচনা করো।

(e) দেহভর সূচকের সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেখো।

(f) কোন কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন অভাবে বিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে? ওজন কমাবার নীতিগুলো আলোচনা করো।

(g) অপুষ্টিজনিত রোগগুলির নাম লেখো। এর প্রতিকারের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

(h) ব্যায়াম কীভাবে মানুষকে স্বাস্থ্যবান করে তোলে। শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর ব্যায়ামের প্রভাবগুলি আলোচনা করো।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

(i) ____________________ হলো বংশগতির ধারক ও বাহক।

(ii) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষার ____________________ ভাগ রয়েছে।

(iii) বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার জায়গা বা ________________ থাকা অবশ্যক।

(iv) বিদ্যালয়ে ডাস্ট লেস ________________ ব্যবহার আবশ্যক।

(v) ________________ বলেছেন, “গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয়”।

৫। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ

(i) দেহভর সুচক (BMI) আমাদের কী ধারা দেয়?

(ক) মেদের পরিমাণ (খ) মাংসের পরিমাণ (গ) হাড়ের পরিমাণ (ঘ) রক্তের পরিমাণ।

(ii) একজন পূর্ণবয়স্ক মেয়ের ওজনের মেদের শতকরা পরিমাণ কত?

(ক) ১০% (খ) ১৫% (গ) ২০% (ঘ) ২৫%।

(iii) মানবদেহে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট-জাতীয় খাদ্যগ্রহণের অনুপাত কত?

(ক) ৪:১:১ (খ) ১:১:৪ (গ) ১:৪:১ (ঘ) ১:১:১।

(iv) কোনটি কম পরিশ্রমজনিত রোগ?

(ক) স্পন্ডিলোসিস (খ) কলেরা (গ) টাইফয়েড (ঘ) বসন্ত।

(v) খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলি কী কী?

(ক) প্রোটিন (খ) ফ্যাট (গ) কার্বোহাইড্রেট (ঘ) কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন।

৬। সঠিক উত্তরটির পাশে সত্য এবং ভুল উত্তরটির পশে মিথ্যা লেখো ঃ

(i) ডায়াবেটিস একটি সংক্রামক রোগ।

(ii) বিদ্যালয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহার স্বাস্থ্যসেবার একটি কর্মসূচি।

(iii) দেহভর সূচকের মান ১৮.৫-র কম হলে ব্যক্তিকে কম ওজনবিশিষ্ট বলা হয়।

(iv) সাধারণত পূর্ণবয়স্ক পুরুষের ওজনের ১৫% মেদ থাকে।

(v) মেদ ঝরাতে ফাস্ট ফুড গ্রহণ করতে হবে।

৭। বাঁ দিকের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলিয়ে লেখো ঃ

(i) বংশগতি	(a) নোটিশ বোর্ড
(ii) হাইপারটেনশন	(b) যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা
(iii) স্বাস্থ্য নির্দেশ	(c) হলাসন
(iv) কু-অভ্যাস	(d) জিন
(v) মেদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ	(e) অসংক্রামক রোগ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাথমিক চিকিৎসা

৩.১.১ প্রাথমিক প্রতিবিধানের ধারণা

প্রাথমিক চিকিৎসার জনক হচ্ছেন জার্মানির শল্যচিকিৎসক ফ্রেডরিক এজমার্ক। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের ফ্রাংকো-প্রাসিয়ান যুদ্ধে তাঁর উপস্থিতি ছিল সার্জেন জেনারেল হিসাবে। তাঁর মাথায় প্রথম আসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত আহত মানুষকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে একটা সহজ অথচ শক্ত কাজ আছে। এই সহজ অথচ শক্ত কাজটি করতে পারলে রোগীকে বাঁচানোর সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে অনেক মুমূর্ষু রোগীকে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি বছর কয়েককোটি মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রাথমিক প্রতিবিধানের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পরীক্ষায় বসছে। মনে রাখতে হবে, মাত্র একজন প্রাথমিক চিকিৎসাকারীর পক্ষেও সম্ভব হতে পারে একটি অমূল্য জীবনকে অকালে ঝরতে না দেওয়া। একজন প্রাথমিক চিকিৎসককে রোগীর জীবন বাঁচাতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে হবে, শ্বাসকষ্ট থাকলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লাঘব করতে হবে এবং অভিঘাত হলে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

এককথায় বলা যায় আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় ডাক্তার দেখবার আগে রোগীকে সাময়িক ও বিজ্ঞানসম্মত সেবা-শুশ্রূষা করাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বা ‘ফার্স্ট এইড’ বলে। প্রাথমিক চিকিৎসার সময় যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা হয় তাকে প্রাকচারণ বলে।

৩.১.২ প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি

- সাহস ও আত্মবিশ্বাস
- প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সঠিক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান
- রোগীর অবস্থা বিচার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা
- তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি
- উপায় উদ্ভাবন ক্ষমতা
- কর্মদক্ষতা

- দুর্ঘটনায় নিজেকে শান্ত রাখা
- ভিড় এড়িয়ে কাজ করবার দক্ষতা
- রোগীকে সাহস প্রদান করা
- অত্যুৎসাহী না হওয়া
- রোগীর আত্মীয়দের সাহস প্রদান করা
- স্পষ্টভাষণ
- অধ্যবসায়
- সহানুভূতি ও সমানুভূতি
- কুশলী হওয়া
- শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল।

৩.১.৩ প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর কর্তব্য

১) ডাক এলেই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে সাড়া দিতে হবে। তেমনি ডাক না এলেও দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া মাত্রই ওই স্থানে সরঞ্জামসহ সত্বর পৌঁছোতে হবে। নচেৎ একটি অমূল্য জীবন অকালে ঝরে যেতে পারে।

২) ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে যাতে বিন্দুমাত্র দেরি না হয় তার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম সর্বদা গোছানো অবস্থায় রাখতে হবে।

৩) দুর্ঘটনাস্থলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। যেমন— জ্বলন্ত ঘরবাড়ি, মেশিনপত্র, গাড়ির পেট্রোল ট্যাংক, কেরোসিন তেলের গুদাম, পেট্রোল পাম্প, জ্বলন্ত গাড়ি, চালু বৈদ্যুতিক তার, বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি।

৪) বাইরের আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে বাইরে, নচেৎ ভিতরে ভিড় যেখানে হবে না সেখানে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

৫) নিকটবর্তী হাসপাতাল, ডাক্তারখানার খোঁজ নিতে হবে। নিকটবর্তী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ডাক্তারখানায় দ্রুত সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে।

৬) প্রয়োজনানুসারে নিকটবর্তী থানায় খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭) আহতের জামাকাপড় পালটাবার বা কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে স্থানীয় গৃহস্থের বাড়ি থেকেই তা সংগ্রহ করতে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করা যাবে না। যে-কোনো কারণেই একটা অমূল্য জীবন নষ্ট না হয় তা সুনিশ্চিত করতে যা যা করার তা করতে হবে।

৮) বাছাই করা লোকেদের কাজ বণ্টন করে দিতে হবে। যেমন —

ক) ডাক্তার, হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা থানায় খবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

খ) সেবাকাজের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা।

গ) ভিড় সরানো।

৯) এসময়ে প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর কাজ হবে —

অ) আহত ব্যক্তির নাম-ঠিকানা জানা এবং কাগজে লিখে দেওয়া।

আ) দুর্ঘটনার বিবরণ লেখা।

ই) যতটা সম্ভব দ্রুত দেহের চোট নির্ণয় করা।

ঈ) বিষক্রিয়া হলে বিষের ধরন চেনা/জানা।

উ) রোগনির্ণয়।

৩.১.৪ ব্যান্ডেজের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা

ব্যান্ডেজ হলো প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতিবিশিষ্ট জীবাণুমুক্ত একখণ্ড কাপড়ের টুকরো যা ক্ষতস্থানকে শক্তভাবে ধরে রাখতে এবং পুনরায় আঘাতমুক্ত হতে সহায়তা করে। এছাড়াও অস্থিভঙ্গ বা মচকে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়া দেহাংশকে শক্তভাবে বেঁধে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

আকৃতি অনুসারে ব্যান্ডেজের ভাগ ঃ

ব্যান্ডেজকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) রোলার ব্যান্ডেজ

(খ) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ

(ক) রোলার ব্যান্ডেজ ঃ

রোলার ব্যান্ডেজ নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহার করা হয় ঃ

(১) ভেঙে বা মচকে যাওয়া দেহাংশকে শক্তভাবে বেঁধে রাখবার জন্য। আঘাতের মাত্রানুসারে ক্রেপ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(২) রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য।

(৩) ফোলা কমাবার জন্য।

(৪) ক্ষতস্থান পুনরায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবার জন্য।

(৫) কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীকে বহন করবার জন্য।

(৬) ক্ষতস্থান বা ভেঙে যাওয়া হাড় পুনরায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার থেকে আটকানোর জন্য।

(৭) স্প্লিট বাঁধবার জন্য।

(৮) ড্রেসিং ঠিক জায়গায় ধরে রাখবার জন্য।

রোলার ব্যান্ডেজের বিভিন্ন মাপ ঃ

যেমন— ১, ২ - ২.৫০, ৩ - ৩.৫০, ৪ - ৪.৫০ ইঞ্চি। সাধারণত আঙুলে ১ ইঞ্চি, মাথা ও হাতে ২ - ২.৫০ ইঞ্চি, পায়ে ৩ - ৩.৫০ ইঞ্চি এবং দেহকাণ্ডে ৪ - ৪.৫০ ইঞ্চি মাপের ব্যান্ডেজ ব্যবহৃত হয়।

রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহারের সাধারণ নিয়মাবলি ঃ

বর্ণনার সুবিধার জন্য ধরে নিতে হবে যে, শিক্ষার্থী খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতের তালু দেহের সামনের দিকে প্রসারিত আছে।

রোলার ব্যান্ডেজের সাধারণত দুটি অংশ থাকে— (i) মাথা এবং (ii) টেল বা মুক্তপ্রান্ত।

আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে ঔষধ দিয়ে মোটা করে তুলো জড়াতে হবে। রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করার সময় যে স্থানে ব্যান্ডেজ করতে হবে সেই স্থানটি যাতে নড়েচড়ে না যায় সেরকম অনড় করতে হবে। রোলার ব্যান্ডেজের মাথাটিকে একভাবে রেখে ব্যান্ডেজের মুক্তপ্রান্ত (টেল) অংশ আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের উপর রেখে ব্যান্ডেজের মাথার অংশটিকে ধীরে ধীরে ঘোরাতে হবে এবং ব্যান্ডেজের শেষ অংশে ক্লিপ দিয়ে আটকে দিতে হবে। ব্যান্ডেজ যেন মজবুত হয় ও আরামদায়ক হয়, আর যেন রক্ত চলাচলে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

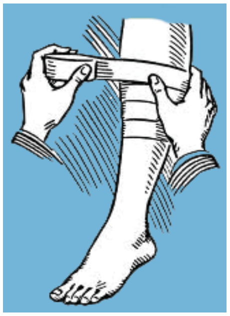

রোলার ব্যান্ডেজ বাঁধার প্রধান চারটে উপায় নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১। সরল পাক ঃ যে স্থানে ব্যান্ডেজ করা হবে সেই স্থানটি যদি সমান স্থূল হয় তখন সরল পাক ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। যেমন - আঙুল, কবজি প্রভৃতি।

২। উলটো পাক ঃ যে অঙ্গে ব্যান্ডেজ করা হবে সেই অঙ্গটিকে কয়েকবার ব্যান্ডেজ দিয়ে জড়ানো হয় এবং প্রত্যেকবার ব্যান্ডেজ জড়ানোর সময় ব্যান্ডেজটিকে ওই অঙ্গের নিম্নাভিমুখীভাবে উলটো পাক দিয়ে নিতে হয়। যেসকল অঙ্গে অসম স্থূলতা রয়েছে সেইসকল অঙ্গে অসম স্থূলতার জন্য তার উপর সরল ঘূর্ণন উপযুক্তভাবে রাখা যায় না। সেইসকল ক্ষেত্রে এই প্রথা অবলম্বন করা হয়।

৩। চার (৪) আকৃতির পাক ঃ এই ধরনের ব্যান্ডেজ কনুই বা গোড়ালির সন্ধির নিকট বাঁধবার সময় তীর্যকভাবে চারিদিকে ঘুরিয়ে ক্রমানুসারে একবার উপরে ও একবার নীচে এনে বাঁধলে ইংরেজির 8 (Eight) ও বাংলার ৪-এর আকারের ন্যায় হয়।

৪। স্পেইকা ঃ বক্ষদেশ, কুঁচকিতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে এই আকৃতির প্রথা অবলম্বন করতে হয়।

(খ) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ ঃ

কমপক্ষে ৩৮ ইঞ্চি লম্বা ও চওড়াবিশিষ্ট একখণ্ড কাপড়কে কর্ণ বরাবর কেটে নিলে দুটি ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ তৈরি হয়। ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের তিনটি বাহু ও ধার থাকে। ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের উপরের কোণটিকে শীর্ষ ও তার ঠিক বিপরীত বাহুকে ভূমি বলা হয় এবং ভূমির দুই প্রান্তের কোণকে প্রান্ত বলা হয়।

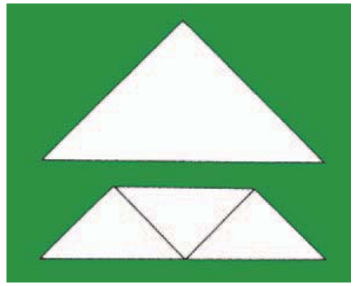

ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করা হয়—

১। সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করা হয়।

২। চওড়া ব্যান্ডেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৩। সরু ব্যান্ডেজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১। সামগ্রিকভাবে ব্যবহার ঃ ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ সামগ্রিকভাবে ভাঁজবিহীন অবস্থায় আর্ম স্লিং, ত্রিকোণ স্লিং, মাথার খুলিতে আচ্ছাদন ও ক্ষতস্থান ঢাকবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

A B

২। চওড়া ব্যান্ডেজ হিসেবে ব্যবহার ঃ চওড়া ব্যান্ডেজ হিসাবে মধ্যবিন্দুর উপর ভাঁজ করে এনে আবার তাকে আর একবার ভাঁজ করলে চওড়া ব্যান্ডেজ প্রস্তুত হয়।

৩। সরু ব্যান্ডেজ ঃ সরু ব্যান্ডেজ কলার ও কাঁধ স্লিং করতে এবং রিং প্যাড করতে ব্যবহার করা হয়।

৩.২.১ দাহক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা

দেহের কোনো জায়গায় রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক বা বিকিরণক্রিয়ার ফলে বাইরে থেকে প্রযুক্ত তাপের কারণে যখন দেহত্বক আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাকে দাহক্ষত বলে। দাহ যত গভীর হয় জীবনের পক্ষে ততই তা বিপজ্জনক। গোটা দেহের উপরিভাগের ১/৩ অংশ পুড়ে গেলে শেষপর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে। দাহক্ষত সাধারণত দুই প্রকার— (i) Dry Burn বা শুষ্কদাহ এবং (ii) Wet Burn বা ভিজাদাহ।

শুষ্কদাহ সম্পর্কে ধারণা ঃ

(i) সরাসরি আগুন বা অগ্নিশিখার দ্বারা (ii) উত্তপ্ত ধাতব বস্তুর দ্বারা। (iii) উচ্চবিদ্যুৎবাহী তারের দ্বারা। (iv) প্রখর সূর্যরশ্মির দ্বারা। (v) বজ্রাঘাতের দ্বারা। (vi) ঘর্ষণজনিত তাপের দ্বারা। (vii) শরীরে অ্যাসিড বা ক্ষার দ্'া।

ভিজাদাহ সম্পর্কে ধারণা ঃ

(i) উত্তপ্ত তরলের দ্বারা। (ii) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের দ্বারা। (iii) পিচ, আলকাতরা, ফিনাইল, আয়োডিন ইত্যাদি রাসায়নিক বস্তুর দ্বারা।

প্রাথমিক চিকিৎসা

ক্ষতস্থানে জল দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তিনটি শর্ত মানতে হবে ঃ

(i) গভীর পাত্রে পোড়া স্থানটি জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। (ii) জল সর্বদা চলমান জল বা ট্যাপের জল হতে হবে।

(iii) পরিশুদ্ধ জল দিতে হবে।

রাসায়নিক দাহের প্রাথমিক চিকিৎসা

(ক) অ্যাসিডে পুড়ে গেলে ঃ (i) মৃদু ক্ষার দিতে হবে। (ii) জল দিয়ে প্রথমে ধুতে হবে। (iii) তারপর খাবার সোডা, কাপড়কাচা সোডা বা কলিচুন দিতে হবে। (iv) চোখে অ্যাসিড পড়লে কয়েক ফোঁটা জল চোখে দিতে হবে এবং তারপর কাঁচা দুধ ফোঁটা ফোঁটা করে চোখে দিতে হবে। যদি মাতৃদুগ্ধ হয় তাহলে ভালো হয়।

(খ) ক্ষারে পুড়ে গেলে ঃ (i) হালকা অ্যাসিড দিতে হবে, যেমন লেবু, তেঁতুল বা টক দই।

দাহের প্রকৃতি অনুসারে তাদের ভাগ ও চিকিৎসা পদ্ধতি — (i) প্রথম মাত্রার দাহক্ষত (এরিযেমা) ঃ এতে চামড়া লাল হয়ে ওঠে, ফুলে ওঠে এবং জ্বালা করে। এর বৈশিষ্ট্য হলো চামড়া স্ফীত হওয়া। স্ফীতি বেশ তাড়াতাড়ি (৩-৬ দিনের মধ্যে) চলে যায় কিন্তু পোড়া জায়গায় থেকে যায় এর রঞ্জিত দাগ। এর পরে ওই চামড়ার খোলস উঠে যায়। এই অবস্থায় আমরা দুধের সর, নারকেল তেল, ডিম, বার্নল ব্যবহার করে থাকি।

(ii) দ্বিতীয় মাত্রার দাহক্ষত (ফোসকা পড়া) ঃ অনুরূপ দাহক্ষতের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তাতে ফুলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া হয় আরও জোরদার। তাতে ভীষণ জ্বালা করার সঙ্গে চামড়া আরও বেশি লাল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মাত্রার দাহক্ষতে চামড়ার গভীর স্তরগুলি জখম হয় না। যদি ঘা হয়ে সংক্রমণ না হয় তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যেই চামড়ার সমস্ত স্তরগুলি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সেই স্থানে কোনো ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয় না। ১০-১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ফোসকায় যদি সংক্রমণ হয় তাহলে শেষপর্যন্ত ঘা শুকোয় পরোক্ষ উপায়ে অনেকদিন ধরে। এই অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসকের কর্তব্য ড্রেসিং করে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো।

(iii) তৃতীয় মাত্রায় দাহক্ষতে (চামড়া মরে যায়) ঃ চামড়ার সমস্ত স্তর বিনষ্ট হয়। পোড়ার দ্বিতীয় অবস্থা অতিক্রম করে মাংসপেশি ঝলসে যায় এবং তা অস্থি বা হাড় পর্যন্ত আক্রান্ত করে। চামড়ার প্রোটিন ও রক্ত জমে গিয়ে এক চটা আকার ধারণ করে, যার তলায় থাকে জখম হওয়া ও মৃত কলা-কোশ। তৃতীয় মাত্রায় দাহক্ষত সর্বদা শুকোয় দ্বিতীয় টানে। জখম হওয়া জায়গায় প্রথমে সৃষ্টি হয় দানাযুক্ত কলা (গ্র্যানুলেশন টিস্যু), যেগুলি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয় আঁশযুক্ত কলায়।

উপরোক্ত প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার ক্ষতে দেহ হতে রক্তরস প্রোটিন প্লাজমা নির্গত হতে থাকে, ফলে রোগীর মধ্যে স্নায়বিক আঘাত দেখা যায়। সুতরাং, রক্তরস প্লাজমা বন্ধ করে দ্রুত চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করা উচিত। পাকা কলা মণ্ডের মতো করে আস্তে আস্তে লাগাতে হবে। তাছাড়া ডিমের কুসুম বাদ দিয়ে সাদা অংশটা মলমের মতো লাগাতে হবে। অতি সত্বর হাসপাতালে পাঠাতে হবে, কলার পাতা বা আরামদায়ক অন্য কিছুর উপরে শুইয়ে। অনেক ক্ষেত্রে ওই না শুকোনো ঘা ঢাকার জন্য শেষপর্যন্ত চামড়া পরিরোপণ (Skin Grafting) করতে হয়।

(iv) চতুর্থ মাত্রার দাহক্ষত (পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া) ঃ এই দাহক্ষত সৃষ্টি হয় দেহের কলার উপর খুবই উচ্চতাপের ক্রিয়ার ফলে (যেমন— উন্মুক্ত অগ্নিশিখা, বিগলিত ধাতু)। এটাই হলো সবচেয়ে সাংঘাতিক রকমের দাহক্ষত যাতে দগ্ধ হয় চামড়া, মাংসপেশি, অস্থি, দেহের অন্যান্য অংশ। এই দাহক্ষত শুকোয় খুবই আস্তে আস্তে। এই না শুকোনো ঘা ঢাকার জন্য চামড়া পরিরোপণ করতে হয়। দাহক্ষতে দেহে নানা বিপজ্জনক উপসর্গ সৃষ্টি হয়, যার কারণ কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের পরিবর্তন (ব্যথাজনিত শক)। অন্যদিকে রক্তের ভেতরের পরিবর্তন ও বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপ নষ্ট হওয়ার কারণগুলি হলো পোড়া জায়গার উপরিভাগ থেকে বেশি পরিমাণ রক্তের তরল পদার্থ প্লাজমা নির্গত ও নিঃসৃত হওয়া এবং পোড়া জায়গায় মৃতকলার পচনজনিত মুক্ত বিষাক্ত পদার্থগুলি দেহে শোষিত হওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসকের কর্তব্য ঃ রোগীর দেহের উপর থেকে উচ্চতাপের ক্রিয়া বন্ধ করা। দরকার দুর্দশাগ্রস্তের পরিধানের পোশাকের আগুন নেভানো। রোগীকে উচ্চতাপের অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া, তার শরীর থেকে জ্বলন্ত ও গরম পোশাকগুলি খুলে দেওয়া। অসতর্কতার জন্য চামড়ার সমগ্রতা কোনো জায়গায় নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ রেখে পোশাক-আশাক কেটে খোলাই ভালো। যে স্থানে দাহের ক্ষতের সঙ্গে পোশাক আটকে যায় ওই স্থানটি তেমনিভাবে রেখে তার চারধার থেকে পোশাক কেটে খুলতে হবে। দুর্দশাগ্রস্তকে খালি গায়ে রাখা উচিত নয়। বিশেষ করে শীতের দিনে ঠান্ডায় রোগীর শকের অবস্থা সৃষ্টি হয়। বরফ অথবা বরফঠান্ডা জল দাহক্ষতে ব্যবহার করতে হবে। যাতে তাপ শরীরের গভীরে প্রবেশ করতে না পারে। গরম জামাকাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা এবং গরম পানীয় পান করতে দেওয়া উচিত। সবচেয়ে ভালো, রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা। রোগীকে যতদূর সম্ভব নিশ্চল ও সুবিধামতো অবস্থানভঙ্গিতে রেখে, ডাক্তারি সাহায্য পাবার আগে পর্যন্ত রোগীর প্রতি প্রাথমিক চিকিৎসকের সজাগ দৃষ্টি প্রয়োজন।

কী করা অনুচিত ঃ (i) রোগীর দেহে কোনোভাবে কোনো অবস্থায় ময়লা লাগতে দেওয়া যাবে না।

(ii) পোড়া জায়গা হাতে স্পর্শ করা, অথবা সুচ ফুটিয়ে ফোসকার জল বের করা বা দাহক্ষতের উপরিভাগে ফেটে যাওয়া জামাকাপড়ের অংশ টেনে হালকা করা এবং দাহক্ষতের উপরিভাগে মলম ব্যবহার করা (ভেসলিন, চর্বিতেল প্রভৃতি) বা পাউডার ছিটানো কখনোই উচিত নয়। এসব দাহক্ষত শুকোতে বা তার জ্বালা দূর করতে কোনো সাহায্যই করে না, বরং তা পরবর্তীতে ডাক্তারি সার্জিকাল পরিচর্যার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

আগুন লাগলে কী করা উচিত ঃ

১. প্রারম্ভিক পর্বে হাতের কাছে পাওয়া জিনিস দিয়ে আগুনের মোকাবিলা করা উচিত।

২. অযথা চেঁচামেচি বা দৌড়াদৌড়ি করে ভীতির সৃষ্টি করবে না।

৩. যদি আগুন বৈদ্যুতিক বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়, তবে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে।

৪. আগুন লাগলে কোনো ঘরে বা বাথরুমে আশ্রয় নেবে না।

৫. আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে সঠিক নির্বাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

৬. সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত তলা খালি করে দেওয়া দরকার।

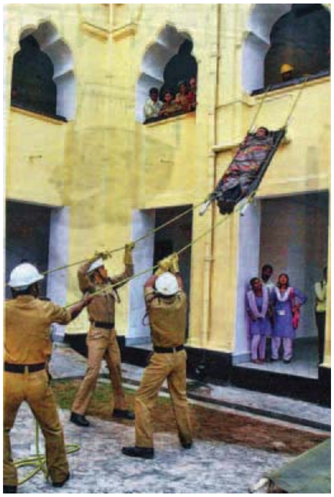

৭. আগুন লাগলে লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করা উচিত।

৮. ব্যক্তিগত সম্পত্তি পাওয়ার জন্য আগুনে প্রবেশ করবে না।

৯. ধোঁয়াপূর্ণ জায়গায় নীচু হয়ে বা হামাগুড়ি দিয়ে বিপন্মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

১০. 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' অনুযায়ী সমস্ত দরজা, জানালা ও ঘরগুলিতে অগ্নিনিরোধক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

১১. আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জাদি যথাসম্ভব অগ্নিনিরোধক করতে হবে।

১২. লোডশেডিং থাকলেও বৈদ্যুতিক সুইচগুলি অফ করে রাখতে হবে।

১৩. ঘরে ঢুকে গ্যাসের গন্ধ পেলে সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিতে হবে। গ্যাস নব বন্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে, আর গ্যাস নব বন্ধ না থাকলে বন্ধ করতে হবে। রান্নার গ্যাস-সরঞ্জামের সামান্য খুঁত হয়েছে বা লিক হচ্ছে সন্দেহ হলেই গ্যাস সরবরাহকারীকে খবর দিতে হবে। রান্না হয়ে গেলেই আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে। রাতে শোবার আগে বা বাড়ি থেকে বেরোবার আগে দেখে নিতে হবে গ্যাসের নব ও রেগুলেটর বন্ধ আছে কিনা।

১৪. বাড়িতে বয়স্কদের বিছানায় শুয়ে বিড়ি বা সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাকলে অবিলম্বে তাদের তা ত্যাগ করতে হবে।

১৫. বাড়িতে বা স্কুলে একাধিক সিঁড়ি ও অগ্নি নিরাপত্তামূলক স্থান রাখতে হবে।

১৬. বহুতল বসতবাড়িতে অগ্নিনির্বাপণের জন্য পর্যাপ্ত জলাধার পরিপূরণের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।

১৭. বিপদের সময় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হলে বাহির পথটা সবসময়ে পরিষ্কার ও বাধাহীন রাখতে হবে।

১৮. আগুন লাগার পর যদি ফ্ল্যাটের মধ্যে আটকে যাও তখন ভেজা কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে দরজা, জানালার মুখ এঁটে রাখতে হবে। একটি মাত্র জানালা খুলে তার নীচের দিকে শুয়ে আর একটি উজ্জ্বল কাপড়/রুমাল বাইরের দিকে নেড়ে নিজের অবস্থান সম্পর্কে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

১৯. বসতি এলাকায় বাজি পোড়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

২০. আপৎকালীন নির্গমনের পথে, 'ধূমপান নিষেধ' সম্পর্কিত বোর্ড, নিকটবর্তী দমকল কেন্দ্রের ফোন নম্বর সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এমন জায়গায় অবশ্যই লিখে রাখতে হবে।

অগ্নিকাণ্ডের জায়গা থেকে মানুষকে উদ্ধার করার কৌশল ঃ

১) ঘরের ভেতরে আগুন লাগলে ও সেখানে মানুষ আটকে থাকলে উদ্ধারের সময় অবশ্যই প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সহযোগিতা নেওয়া উচিত।

২) ওই ঘরের মেঝে সংলগ্ন জায়গায় কেবল বিশুদ্ধ বাতাস আছে। তাই ওই ঘরে ঢুকতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে।

৩) ওই ঘরের মেঝেতে বা খাটে আটকে পড়া মানুষটিকে হামাগুড়ি দিয়েই বের করে আনতে হবে।

৪) মানুষটিকে উদ্ধারের আগে মুখে ভিজে রুমাল/কাপড়ের টুকরো বেঁধে নিতে হবে।

৫) আগুন জ্বললে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়, যা অত্যন্ত বিষাক্ত। সুতরাং, আগুন-লাগা ঘরে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে চারপাশে থাকা জিনিস দিয়েই উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

৬) আগুন-লাগা ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ থাকলে কখনোই তা খুলবে না। খুললে বাইরের বাতাস ঘরে ঢুকে আগুনের শিখাকে বাড়িয়ে দেবে।

পোড়া ও ফোসকার প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

(১) আগুনে পোড়া মানুষকে শুইয়ে দিতে হবে।

(২) রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে।

(৩) আগুনে পোড়া অংশে ধীরগতিতে প্রবাহিত ঠান্ডা জলের ধারা দিতে হবে।

(৪) আংটি, বালা, হাতঘড়ি, জুতো, মোজা ও এঁটে দেহের সঙ্গে লেগে যেতে পারে এমন বস্তু দগ্ধ মানুষটির দেহ থেকে খুলে নিতে বলতে হবে।

(৫) অ্যান্টিসেপটিক লোশন বা মলম ক্ষতস্থানে লাগাতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে হবে।

(৬) রোগীকে প্রচুর পরিমাণ জল ও তরল পদার্থ পান করাতে হবে।

(৭) রোগী সচেতন থাকলে মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে জল খেতে দিতে হবে।

(৮) হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হলে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে।

(৯) শরীরে পোড়া অংশ বেশি হলে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

পোশাক-পরিচ্ছদে আগুন-লাগা মানুষকে কীভাবে সাহায্য করা যায় ঃ

(১) জামাকাপড়ে আগুন লাগলে সুবিধামতো উপায়ে আগুন নেভাতে হবে।

(২) কম্বল, কাঁথা, লেপ, তোশক চেপে ধরে আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হবে।

(৩) অধিক পরিমাণে ধারাবাহিক জল দিয়েও আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হবে।

(৪) আগুনে পোড়ার ক্ষতস্থানে পর্যাপ্ত চলমান জল দিলে রোগীর পক্ষেও সুবিধাজনক। এতে যেমন আগুন নেভে তেমনি দেহের উপরে পোড়া জায়গাটা ঠান্ডাও করবে। এতে দেহের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে।

(৫) জামাকাপড়ে আগুন লাগলে একেবারে ছোটাছুটি না করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করতে হবে।

(৬) আগুন-লাগা পোশাক সম্ভব হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুলে ফেলতে পারলে ভালো।

কী করবে না

১। বসতবাড়ি কখনোই সহজদাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি করা উচিত নয়।

২। জ্বলন্ত স্টোভে কখনোই তেল ভরবে না ও স্টোভে অতিরিক্ত পাম্প করবে না। কারণ স্টোভ অতিশয় বিপজ্জনক। কেরোসিন বা যে-কোনো দাহ্য বস্তু স্টোভের কাছে রাখবে না।

৩। ঘরে ঢুকে গ্যাসের গন্ধ পেলে কোনো আলো জ্বালাবে না বা নেভাবে না।

৪। শোবার ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার মজুত করে রাখবে না।

৫। বাড়ির ভেতরে পেট্রোল, স্পিরিট বা সহজদাহ্য কোনো জিনিস রাখতে দেবে না।

৬। একটি বৈদ্যুতিক প্লাগ পয়েন্ট থেকে একাধিক বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করবে না।

৭। জ্বলন্ত বা চলন্ত কোনো যন্ত্রে বা জেনারেটরে কখনও তেল ঢালবে না। তেল ঢালার সময় মোমবাতি ব্যবহার বিপজ্জনক।

৮। দেশলাই, বিড়ি-সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো না নিভিয়ে কোথাও ফেলতে দেবে না।

৯। কোনো অবস্থাতেই ইলেকট্রিক তার টানবে না বা হুকিং করবে না।

৩.২.২ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অগ্নি-দুর্ঘটনার বিপন্মুক্তির পদ্ধতি

১) বিদ্যালয়গুলি এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি হওয়া উচিত যা সহজদাহ্য নয়।

২) একাধিক তলবিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলিতে ন্যূনতম ২টি সিঁড়ি থাকা আবশ্যক।

৩) কোনো অস্থায়ী কাঠামোর নীচে ক্লাস চালানো উচিত নয়।

৪) স্কুলে ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার হয়ে গেলে সাবধানে পাত্রবন্দি অবস্থায় পৃথক স্থানে রাখতে হবে।

৫) বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিল-এর রান্নার ব্যবস্থা কোনো সুরক্ষিত জায়গায়, শ্রেণিকক্ষ থেকে ন্যূনতম ১০০ ফুট দূরত্বে হওয়া আবশ্যক।

৬) বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করানো উচিত, কোথাও ত্রুটি গোচরে আসলে অবিলম্বে সংশোধন করানো উচিত।

৭) বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত জলাধার ও তা পরিপূরণের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।

৮) আপৎকালীন পরিকল্পনা, কর্তব্য সম্পর্কে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রাথমিক অগ্নিনির্বাপণ থেকে শুরু করে সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয় খালি করে দেওয়া পর্যন্ত সম্যক জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

পাড়ার অস্থায়ী মণ্ডপে সুষ্ঠু অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপগুলি কী কী ঃ

১। অস্থায়ী কোনো মণ্ডপ তৈরির আগে নিরাপত্তা সম্পর্কীয় বিষয়ে দমকল বিভাগের পরামর্শ ও অনুমতি নিতে হবে।

২। কাপড় বা ত্রিপলের কাছাকাছি কোনো বৈদ্যুতিক তার রাখা যাবে না।

৩। অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা সর্বদা তৈরি রাখতে হবে।

৪। মণ্ডপে পেট্রোম্যাক্স বা ওই জাতীয় খোলা আলো ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৫। জরুরি প্রয়োজনে মণ্ডপ থেকে বেরোবার পথ ঠিক করে রাখতে হবে।

৬। অস্থায়ী মণ্ডপের কাছাকাছি বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বা বোর্ড বসানো নিষেধ।

৭। লাইসেন্স আছে এমন কোনো সংস্থার দ্বারা ইলেকট্রিকের কাজ করাতে হবে।

৮। অস্থায়ী মণ্ডপের কাছে বাজি পোড়ানো নিষেধ।

গ্রামবাসী, শহরবাসী, বস্তিবাসী সকলে যদি এগিয়ে এসে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাগুলি মেনে চলে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সামর্থ্য ও প্রত্যেকের কর্তব্যমতো সঠিক কাজটি সঠিক সময়ে করে তাহলে বিদ্যালয়, সমাজ ও রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হবে। তাহলেই সম্পদ, সম্পত্তি ও প্রাণহানির ঘটনা রোধ করা সম্ভব হবে। অগ্নি নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে সকলকেই এক-একজন স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করতে হবে। সকলের সহযোগিতা ও সক্রিয় ভূমিকার বিশেষ প্রয়োজন। সরকার এগিয়ে এসেছে নতুন অগ্নি নিরাপত্তা আইন নিয়ে। সকলের জন্যই সকলে মিলে গড়ে তুলতে হবে এক অগ্নি-নিরাপদ সমাজ।

৩.৩.১ কুকুরের কামড়

কুকুরের কামড় কখনো-কখনো বিপজ্জনক হয়। কুকুরের কামড়ে মানুষের জীবনহানিও হতে পারে। গৃহপালিত বা পোষা কুকুরের জীবাণুনাশক টিকা দেওয়া থাকলে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত একথা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা হচ্ছে না। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবহেলা না করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করবার কথা বলা হচ্ছে। সাধারণত পাগলা কুকুর, বিড়াল, নেকড়ে ও শেয়ালের কামড়ে জলাতঙ্ক হতে পারে। বাদুড় ও অন্যান্য জানোয়ারও এই রোগ ছড়াতে পারে। সবচেয়ে ভয়ংকর হলো পাগলা কুকুরের কামড়। এই ধরনের কুকুরের লালায় হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বা র‍্যাবিস ভাইরাস থাকে। ক্ষত গভীর বা বড়ো হলে রক্তপাত হতে পারে। তাতে জীবাণু সংক্রমণ হলে দু-ঘণ্টা বা তারপরে জ্বর হতে পারে। ক্ষতের জায়গায় পুঁজ হতে পারে, ফুলে যায় এবং লাল হয়।

জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে কী কী লক্ষণ দেখা যায় ঃ

(১) কামড়ের জায়গায় ব্যথা আর চিনচিন করতে পারে।

(২) অনিয়মিত শ্বাস, কান্নাকাটি, জ্বর, ঢোক গিলতে ব্যথা ও অসুবিধা হয়।

(৩) প্রচুর ঘন চটচটে লালা পড়ে।

(৪) প্রথমদিকে জল খেতে ভয় হয় এবং পরে জল জিনিসটাতেই ভয় হয়।

(৫) শান্ত থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে হঠাৎ রেগে যায়।

(৬) রোগী সজাগ কিন্তু উৎকণ্ঠিত ও উত্তেজিত হয়ে থাকে।

(৭) মৃত্যু এগিয়ে এলে ফিট (খিঁচুনি) আর পক্ষাঘাত হয়। জলাতঙ্কে আক্রান্ত ব্যক্তির লালা, প্রস্রাব ও ঘাম বিষাক্ত, এগুলোর ছোঁয়াও বিপজ্জনক।

প্রাক্‌চারণ ঃ

(১) কুকুরে কামড়ানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাবানজল দিয়ে পরিষ্কার করে তার উপর জীবাণুনাশক লাগাতে হবে।

(২) ক্ষতস্থানটি ঢাকা না দিয়ে খোলা রাখতে হবে।

(৩) আক্রান্তের ধনুষ্টংকারের টিকা না নেওয়া থাকলে, টিটেনাস টক্সয়েড ইনজেকশন নিতে হবে।

(৪) কামড়াবার ১০ দিন থেকে ২ বছরের মধ্যে জলাতঙ্কের প্রথম লক্ষণগুলি দেখা যায়। একবার জলাতঙ্ক শুরু হয়ে গেলে রোগীকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জলাতঙ্কের প্রতিষেধক চিকিৎসা শুরু করতে হবে। প্রতিষেধক টিকা নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিতে হবে।

(৫) ক্ষতটা গভীর হলে ১০-১৫ মিনিট ধরে জলের ধারা দিতে হবে।

(৬) রক্তপাত হতে থাকলে জায়গাটা উপরের দিকে তুলে রাখতে হবে। ১০ মিনিটের মধ্যে রক্ত বন্ধ না হলে ডাক্তারের সাহায্য নিতে হবে।

(৭) ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, অন্যান্য চিকিৎসাসহ ধনুষ্টংকারের টিকাও নিতে হবে।

(৮) ক্ষতস্থান রগড়ানো বা মালিশ করা উচিত নয়, কারণ র‍্যাবিস ভাইরাস শরীরের গভীরে চলে যেতে পারে।

এড়ানোর জন্য কী করতে হবে ঃ

(১) কোনো জানোয়ার কামড়ালে তাকে ১৫ দিন নজরদারিতে রাখতে হবে। দেখতে হবে পশুটি অস্বাভাবিক আচরণ করছে কিনা বা মারা গেছে কিনা।

(২) সম্ভব হলে সমস্ত রাস্তার কুকুরকে টিকা দিতে হবে।

(৩) পোষা কুকুরকেও নিয়মিত টিকা দেওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৪) কোনো পশুপাখিকে অসুস্থ মনে হলে বা সে অস্বাভাবিক ব্যবহার করলে সকলকে সদাসতর্ক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(৫) জানোয়ার কামড়ানোর পরেই টিকা নেওয়া শুরু করতে হবে। যদি জানোয়ারটি মারা যায় অথবা তাকে খুঁজে না পাওয়া যায় তবে সবকটি টিকার ডোজ অবশ্যই নিতে হবে।

কর্মপত্র

Section-1:Recap Zone

১। দু-এক লাইনে উত্তর দাও ঃ

(i) প্রাথমিক চিকিৎসার জনক কে?

(ii) প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফার্স্ট এইড কাকে বলে?

(iii) রোলার ব্যান্ডেজের দুটি অংশের নাম লেখো?

(iv) পাগলা কুকুরের লালায় কোন রোগের জীবাণু থাকে?

(v) আঙুলে কী মাপের রোলার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়?

(vi) স্পেইকা কী?

Section-2:Group work

২। অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি ঃ

(i) রোলার ব্যান্ডেজ কয়ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

(ii) হাত ও পা ছড়ে বা কেটে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে করবে?

(iii) সরল পাক ও চার (৪) আকৃতির পাক কী?

(iv) দাহক্ষত কয়প্রকার ও কী কী?

(v) বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের অগ্নিদুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করো।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ

(i) জলাতঙ্কের কারণ কী? এর লক্ষণগুলি আলোচনা করো।

(ii) পোশাক-পরিচ্ছদে আগুন লাগলে মানুষকে কীভাবে সাহায্য করবে?

(iii) দাহক্ষত কী? শুষ্ক দাহ ও ভিজেদাহ সম্পর্কে তোমার ধারণাগুলি লেখো।

(iv) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ সম্পর্কে যা জানো লেখো।

(v) প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি আলোচনা করো।

৩। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ

(i) প্রাথমিক চিকিৎসার জনক হলেন লুই পাস্তুর।

(ii) বসতি এলাকায় বাজি পোড়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

(iii) দাহক্ষত সাধারণত দুই প্রকার।

(iv) জ্বলন্ত স্টোভে কখনোই তেল ভরবে না।

(v) আকৃতি অনুসারে ব্যান্ডেজের দুটি ভাগ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

(i) প্রাথমিক চিকিৎসার জনক হলেন________________ ।

(ii) সাধারণত ________________ ১ ইঞ্চি মাপের ব্যান্ডেজ বাঁধতে হয়।

(iii) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজের উপরের কোণটিকে ________________ বলে।

(iv) সূর্যরশ্মির দ্বারা পুড়ে গেলে তাকে ________________ বলে।

(v) পাগলা কুকুরে কামড়ালে ________________ রোগ হয়।

৫। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ

(i) রোলার ব্যান্ডেজের দুটি অংশের নাম কী?

(ক) মাথা এবং টেল (খ) মাথা এবং হাত (গ) হাত এবং পা (ঘ) চোখ এবং কান।

(ii) শোয়ার ঘরে কী মজুত রাখা উচিত নয়?

(ক) ফ্যান (খ) আলমারি (গ) ঘড়ি (ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার।

(iii) জলাতঙ্ক রোগী কী খেতে ভয় পায়?

(ক) মিষ্টি (খ) ফল (গ) জল (ঘ) ভাত।

(iv) আগুন জ্বললে কী গ্যাস উৎপন্ন হয়?

(ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন (গ) সিলিকন (ঘ) কার্বন।

(v) জলাতঙ্ক রোগীর মুখ থেকে কী ঝরে?

(ক) লালা ঝরে (খ) জল ঝরে (গ) বমি হয় (ঘ) রক্ত পড়ে।

৬। বাঁদিকের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলিয়ে লেখো ঃ

(i) জলাতঙ্ক	(a) বজ্রাঘাত
(ii) ব্যান্ডেজ	(b) রাসায়নিক দাহ
(iii) শুষ্ক দাহ	(c) একখণ্ড জীবাণুমুক্ত কাপড়
(iv) অ্যাসিডে পুড়ে যাওয়া	(d) প্রাক্চারণ
(v) প্রাথমিক চিকিৎসা	(e) পাগলা কুকুরে কামড়

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রেতা সুরক্ষা

মানক: পথপ্রদর্শক

৪.১.১. ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কে ধারণা

সারা দুনিয়ায় আর্থিক লেনদেনের তিন ভাগের দুই ভাগ জোগান দেয় উপভোক্তারা, অথচ সেই উপভোক্তাদের মতামত কোনো গুরুত্বই পায় না। 'প্রকৃত অর্থে সবাই উপভোক্তা'। অর্থনৈতিক বাজারে উপভোক্তারাই সব থেকে গরিষ্ঠ। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কথা শোনাই হয় না। ১৯৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের উপভোক্তাদের কাছে একটি অত্যন্ত স্মরণীয় দিন। এই দিন থেকে এ দেশে উপভোক্তা সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ (Consumer Protection Act, 1986) চালু করা হয়।

আইন প্রবর্তন হওয়ার দীর্ঘদিন পরেও এ-দেশে উপভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত নয়। কারণ—

☞ অধিকার সম্পর্কে উপভোক্তাদের অজ্ঞতা।

☞ অধিকাংশ উপভোক্তাই সংগঠিত নন।

☞ অধিকাংশ উপভোক্তাই নিজেদের অধিকার প্রয়োগে উদ্যোগী হন না।

☞ কোথায় এবং কীভাবে প্রতিকার পাওয়া যাবে তা অধিকাংশ উপভোক্তাই জানেন না।

উপভোক্তা সুরক্ষা আইন (C.P. Act, 1986)-এ উপভোক্তাদের ছয় দফা অধিকার দেওয়া হয়েছে। উপভোক্তা বিরোধ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট ফোরাম তৈরি করা হয়েছে।

The Consumer Protection Act, 1986- এই আইনটি ১৯৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে এবং এই উপভোক্তা স্বার্থরক্ষাকারী ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে স্মরণে রেখে ২৪ ডিসেম্বর দিনটিকে ভারতবর্ষে 'জাতীয় উপভোক্তা দিবস' (National Consumer Day) হিসেবে পালন করা হয়।

এই আইন চালু হওয়ার আগে ভারতবর্ষে ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে বেশ কিছু আইন চালু ছিল বটে, কিন্তু পূর্বেকার কোনো আইনেই দ্রুত প্রতিকার পাওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তার জন্য ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান ছিল না। **The Consumer Protection Act, 1986**-এ সর্বপ্রথম ক্ষতিগ্রস্ত উপভোক্তার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিধান দেওয়া হয়েছে।

তবে এই আইনের সুবিধা কেবলমাত্র সেই সব ক্রেতারাই পাবেন যারা ব্যবহারের জন্য কেনাকাটা করবেন। ব্যবসার জন্য কেনাকাটা করলে এই আইনের সুবিধা পাবেন না।

অবশ্য স্বনিযুক্তির মাধ্যমে শুধুমাত্র জীবিকার্জনের স্বার্থে ব্যবসার জন্য কেনাকাটা করলেও এই আইনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

আইনে এই সমস্ত ক্রেতাদের **উপভোক্তা (Consumer)** হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপভোক্তা (Consumer) মনোনীত ব্যবহারকারী বা সুবিধাভোগীরাও **উপভোক্তা (Consumer)** হিসেবে বিবেচিত হবেন। আইনে উপভোক্তাদের ছটি অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে—

(ক) জীবন বা সম্পত্তির পক্ষে বিপজ্জনক এমন জিনিস বা পরিসেবা বিপণনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার অধিকার।

(খ) জিনিস বা পরিসেবার গুণমান, পরিমাণ, শুদ্ধতা, কার্যকারিতা, দাম ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য লাভের অধিকার।

(গ) বাছাইয়ের অধিকার।

(ঘ) শুনানির অধিকার।

(ঙ) প্রতিকার লাভের অধিকার।

(চ) উপভোক্তা শিক্ষার অধিকার।

এই আইনের সুবিধা হলো যে উপভোক্তা নিজে বা তার মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে কিংবা বক্তব্য পেশ করতে পারেন, উকিল নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক নয়।

- **কেনাকাটা করতে গিয়ে প্রায়ই আমরা ঠকে যাই। কীভাবে?**

জিনিস কেনার বা পরিসেবা নেওয়ার সময় আমাদের প্রত্যাশা থাকে—

১। সঠিক পরিমাণ (মাপ, ওজন, সংখ্যা বা আয়তন)।

২। সঠিক দাম।

৩। সঠিক গুণমান।

৪। নিরাপত্তা - কেনা জিনিস বা পরিসেবা ব্যবহার করে যেন আমাদের জীবন বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি কিংবা আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

এই সব ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা ঘাটতি হলেই ক্রেতা ঠকে যান। ক্রেতা যাতে ঠকে না যান বা ঠকে গেলে যাতে সহজে এবং দ্রুত প্রতিকার পান তার জন্য সরকার বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাকেই বলে ক্রেতা সুরক্ষা।

৪.১.২ সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে

১। **সঠিক পরিমাণ, সঠিক দাম** ঃ ক্রেতারা যাতে সঠিক দামে সঠিক পরিমাণ জিনিস পান তার জন্য সরকার আইন করে অনেক ব্যবস্থা নিয়েছে।

(ক) বাটখারা ও ওজনযন্ত্রগুলিতে বৈধ পরিমাপ দপ্তরের ছাপ থাকা বাধ্যতামূলক, যা দেখে বোঝা যাবে যে বাটখারা ও ওজনযন্ত্রগুলি সঠিক।

(খ) কাপড় ইত্যাদি মেপে দেওয়ার দণ্ডটি ধাতুর এবং দণ্ডের দুই প্রান্তে বৈধ পরিমাপ দপ্তরের ছাপ থাকা বাধ্যতামূলক, যা দেখে বোঝা যাবে যে দণ্ডটি সঠিক।

(গ) কেরোসিন তেল-সহ আয়তনে বিক্রয়যোগ্য যে-কোনো তরল পদার্থ মেপে দেওয়ার পরিমাপক পাত্রের নির্দিষ্ট স্থানে বৈধ পরিমাপ দপ্তরের ছাপ থাকা বাধ্যতামূলক, যা দেখে বোঝা যাবে যে পাত্রটি সঠিক।

(ঘ) মোড়কবন্দি (প্যাকেজড) করে যে-সমস্ত জিনিস বিক্রি হয়, তার গায়ে জিনিসের নাম, পরিমাণ (মাপ, ওজন, সংখ্যা বা আয়তন), প্রস্তুতকারীর পুরো নাম ও ঠিকানা, তৈরি করার তারিখ, সর্বোচ্চ খুচরো বিক্রয়মূল্য এবং জিনিসে ত্রুটি থাকলে যার কাছে অভিযোগ জানাতে হবে, সেই অভিযোগ নিষ্পত্তিকারীর ঠিকানা লেখা থাকা বাধ্যতামূলক।

মনে রাখতে হবে, প্যাকেটের গায়ে লেখা বিক্রয়মূল্যের চাইতে বেশি দাম নেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২। **সঠিক গুণমান**—ক্রেতারা যাতে সঠিক গুণমানের জিনিস বা পরিসেবা পান তার জন্য সরকার বেশ কিছু জিনিসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানক (স্ট্যান্ডার্ড) নির্দিষ্ট করেছে এবং লোগো বা চিহ্ন প্রকাশ করেছে, যেগুলি দেখে ওইসব জিনিস বা পরিসেবা কিনলে ক্রেতারা সঠিক গুণমানের জিনিস বা পরিসেবা পেতে পারেন।

জিনিস বা পরিসেবার নাম	গুণমানের নির্দেশক	লোগো
সোনার গয়না	হলমার্ক	मानक: पथप्रदर्शक
গুঁড়ো মশলা, ভোজ্য তেল, ঘি, মধু, ডাল, আটা, ময়দা ইত্যাদি।	আগমার্ক	भारत सरकार AGMARK एग मार्क GOVERNMENT OF INDIA
বিস্কুট, বোতলীকৃত পানীয় জল, সিমেন্ট, বেবিফুড, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি।	আই এস আই	IS 15298 ISI CM/L-3793581 Part-2
পশম ও পশমজাত জিনিস	উলমার্ক	WOOLMARK

রেশম ও রেশমজাত জিনিস	সিল্কমার্ক	SILK MARK
হ্যান্ডলুম বস্ত্র	হ্যান্ডলুম মার্ক	Handloom
চিকিৎসালয়	এন এ বি এইচ	NABH
চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষাগার	এন এ বি এল	NABL ACCREDITED M-0351

৩। নিরাপত্তা ঃ

• খাদ্যে ভেজাল রোধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার প্রথমে The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 এবং পরে এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ The Food Safey and Standards Act, 2006 আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে মানুষের শারীরিক সুরক্ষার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে এবং খাদ্যদ্রব্য বিপণনের উপর নানান নিয়ন্ত্রণ এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, যাতে করে ভেজাল খাবার বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং প্রয়োজনে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

কিছু উদাহরণ ঃ

- ☞ খাদ্যবস্তুর প্যাকেটে তার পুষ্টিগুণ এবং সেটি কোন তারিখের মধ্যে ব্যবহার করলে সব থেকে ব্যবহারোপযোগী থাকবে, তা লেখা থাকতে হবে।
- ☞ বেবিফুড অবশ্যই ISI চিহ্নযুক্ত হতে হবে এবং তার প্যাকেট বা টিনের গায়ে 'মাতৃদুগ্ধই শিশুর পক্ষে শ্রেষ্ঠ' এই মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।
- ☞ আজিনোমটোর (মোনোসোডিয়াম গ্লুটামেট) প্যাকেটের গায়ে '১২ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের উপযোগী নয়' এই মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে।
- ☞ প্যাকেট-বন্দি ছাড়া গুঁড়ো মশলা বিক্রি করা যাবে না।
- ☞ খাদ্যলবণ আয়োডিনযুক্ত না হলে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আয়োডিনযুক্ত নয়, এমন খাদ্যলবণ বিক্রি করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

- খাবারে রং বা সংযোজক ব্যবহার করতে হলে সেই রং বা সংযোজক অবশ্যই ISI চিহ্নযুক্ত হতে হবে এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় নির্দিষ্ট খাবারে মেশাতে হবে। অননুমোদিত রং বা অননুমোদিত মাত্রায় রঙের ব্যবহার আইনত দণ্ডনীয়।
- খাদ্যসামগ্রী প্লাস্টিক প্যাকেটে রাখতে হলে 'ফুড গ্রেড প্লাস্টিক' ব্যবহার করতে হবে।
- খাদ্যদ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্লাস্টিকের কাঁটা, চামচ 'ফুড গ্রেড প্লাস্টিক'-এ তৈরি হতে হবে।

- রসিদ ছাড়া ওষুধ বিক্রি করা যাবে না।
- ওষুধে প্যাকেটের গায়ে সেটি কোন তারিখের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই তার উল্লেখ থাকতে হবে।
- মেডিকেল প্রেসক্রিপশনে চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং প্রাথমিক নির্ণয় (Provisional diagnosis) উল্লেখ থাকতে হবে।
- চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনে ওষুধের ব্র্যান্ড নাম ও জেনেরিক নাম, দুটোই লিখতে হবে।
- ক্যানসার, ডায়াবেটিস, মৃগীরোগ, গ্লকোমা, বাত ইত্যাদি রোগ নিরাময় করা হয় বলে কোনো বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না।
- কোনোরকম ম্যাজিক চিকিৎসার বিজ্ঞাপনে দেওয়া যাবে না।

৪। **প্রতিকারের ব্যবস্থা ঃ** ঠকে গেলে ক্রেতারা যাতে নামমাত্র খরচে সহজে এবং দ্রুত প্রতিকার পান তার জন্য সরকার আইন করে সম্পূর্ণ পৃথক আদালত চালু করেছে। কেবলমাত্র ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ নিস্পত্তির জন্যে গঠিত এই আদালতগুলিকে বলে '**কনজিউমার ফোরাম**' বা ক্রেতা আদালত।

৫। **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা ঃ** উপভোক্তারা যদি চান, তবে প্রথমেই ক্রেতা আদালতে অভিযোগ না করে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের অফিসে আবেদন জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের আধিকারিকেরা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়পক্ষকে ডেকে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত দ্রুত মীমাংসা হয়ে যায়। আর এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হল, পুরো প্রক্রিয়াটাই সম্পূর্ণ নিখরচায়। অর্থাৎ আপোস মীমাংসার আবেদন করার জন্যে কোনো ফি লাগে না।

৪.১.৩. খাদ্য-ভেজাল-শারীরিক ক্ষতি

খাদ্যে ব্যবহৃত ভেজাল দ্রব্য বা খাদ্য থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন ক্ষতিকারক দ্রব্য শরীরে কীরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় সে সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

ক্রমিক নং	সম্ভাব্য ভেজাল	যেসব খাদ্যদ্রব্যে মেশানো হয়	শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব
১।	আর্জিমন বীজ, আর্জিমন তেল	সরষের তেল, অন্যান্য ভোজ্য তেল ও স্নেহপদার্থ	শোথ, উদরী রোগ, গ্লকোমা, হৃৎপিণ্ডের অবরোধ।
২।	টিওসিপি (TOCP)	তেল	প্যারালাইসিস
৩।	র‍্যানসিড তেল	তেল	ভিটামিন 'এ' এবং 'ই'কে ধ্বংস করে।
৪।	কৃত্রিমভাবে রং করা বহিরাগত বীজ	পোস্ত, কালোজিরে ইত্যাদি	স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, ক্যানসারের আশঙ্কা।
৫।	রং করা নষ্ট হওয়া চা পাতা, বা অন্য পাতা, কাঠের গুঁড়ো প্রভৃতি।	চা	স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, পাকস্থলিতে ব্যথা, ক্যানসারের আশঙ্কা।
৬।	মিনারেল অয়েল	ভোজ্য তেল ও স্নেহজাতীয় খাদ্য	ক্যানসার
৭।	আর্সেনিক	আপেল প্রভৃতি বিভিন্ন ফলের উপর লেড আর্সেনেট স্প্রে করা হয়।	দুর্বলতা, মাথাঘোরা, কাঁপুনি, খটকা, প্যারালাইসিস, মৃত্যু।
৮।	সিসা	জল, প্রাকৃতিক ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য	সিসা-দূষণজনিত লক্ষণ, যেমন-অনিদ্রা, রক্তহীনতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি।
৯।	তামা	খাদ্য	বমিভাব, ডায়ারিয়া।
১০।	দস্তা	খাদ্য	পেট ব্যথা, বমিভাব।
১১।	মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট	চাইনিজ ফুড, মাংস বা মাংসজাত খাদ্য	শিশুদের মস্তিষ্কের ক্ষতি। গর্ভস্থ ভ্রূণের মস্তিষ্কের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। মোটা হওয়া, অটিজম, মৃগীরোগ হতে পারে।
১২।	সালফার ডাইঅক্সাইড এবং সালফাইট	সংরক্ষিত খাদ্য, মিষ্টি	পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ, ক্যানসারের আশঙ্কা।

ক্রমিক নং	সম্ভাব্য ভেজাল	যেসব খাদ্যদ্রব্যে মেশানো হয়	শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব
১৩।	অ্যালুমিনিয়াম	লাড্ডু, বরফি, পান	মানসিক অবসাদ, হাড় স্পঞ্জের মতো হয়ে যায়, স্মৃতিবিভ্রম ঘটে।
১৪।	রোডামিন-বি	সরবত, হাওয়াই মিঠাই, মঠ	কিডনি, লিভার, প্লীহা-ঘটিত রোগ।
১৫।	ইউরিয়া	মুড়ি, দুধ	গেঁটেবাত সহ চর্ম, চোখ ও শ্বাসনালিতে প্রদাহের সৃষ্টি করে।
১৬।	রোডামিন-বি	রোডামিন বি	ক্যানসার
১৭।	লেড ক্রোমেট	লেড ক্রোমেট	ক্যানসার
১৮।	মেটানিল ইয়েলো	বিরিয়ানি, তেলেভাজা, পোলাও	ক্যানসার

উল্লিখিত ধাতু বা যৌগিক পদার্থগুলির খাদ্যে উপস্থিতি যখন সহ্যমাত্রা Tolerance limit ছাড়িয়ে যায় তখন সংশ্লিষ্ট শরীরে রোগ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে।

৪.১.৪ উপভোক্তাদের অবশ্য করণীয়

♦ ভেজাল দ্রব্য, খাদ্যে অননুমোদিত রং ব্যবহার প্রভৃতির খারাপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নিজে সচেতন হবে এবং অন্যান্যদের অতি অবশ্যই সচেতন করতে হবে।

♦ বহু মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী ও বিপণনকারী, সবজিওয়ালা, মৎস্যবিক্রেতা এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী ও বিপণনকারী নিজেরাই জানেন না তাঁদের ব্যবহৃত অননুমোদিত রং বা রাসায়নিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক। তাঁদের সচেতন করতে হবে, যাতে ওইরূপ দ্রব্য বা রং ব্যবহারে তাঁরা বিরত থাকেন।

♦ ক্ষতিকারক দ্রব্য বা রং-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্য নিতে হবে।

৪.১.৫. ক্রেতা আদালতে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি

☞ সঠিক পদ্ধতিতে লিখিত ন্যূনতম তিনটি অভিযোগপত্র এবং যতজন অভিযুক্তপক্ষ আছেন তার সমসংখ্যক অতিরিক্ত প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট ফোরামে জমা দিতে হবে।

☞ অভিযোগপত্র জমা দেবার সময় অল্প কিছু ফি লাগে। দাবির পরিমাণের উপর এই ফি নির্ভর করে।

☞ তবে, দাবির পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা কার্ডধারী BPL শ্রেণিভুক্ত উপভোক্তার অভিযোগ দাখিল করতে কোনো ফি লাগে না।

☞ যদি অভিযোগ সঠিক বলে বিবেচিত হয়, তবে ত্রুটিযুক্ত জিনিস মেরামত করা বা বদলে দেওয়া, সঠিক পরিসেবা নিশ্চিত করা, জিনিস বা পরিসেবার মূল্য ফেরত দেওয়া, এমনকি বিক্রেতা বা পরিসেবা প্রদানকারীর গাফিলতির জন্যে যদি উপভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণেরও আদেশ পাওয়া যেতে পারে।

কর্মপত্র

১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(i) কত সালে উপভোক্তা সুরক্ষা আইন চালু হয়?

(ii) কোন দিনটিকে ভারতবর্ষে 'জাতীয় উপভোক্তা দিবস' হিসাবে পালন করা হয়?

(iii) বেবিফুডের প্যাকেটে বা টিনে কী ঘোষণা করতে হবে?

(iv) ক্রেতা আদালত কাকে বলে?

(v) মুড়িতে মিশ্রিত ভেজাল দ্রব্যের নাম কী?

২। সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো ঃ

(i) ভারতের জাতীয় উপভোক্তা দিবস কোনটি?

(ক) ২৪ ডিসেম্বর (খ) ২৮ ডিসেম্বর (গ) ২৪ নভেম্বর (ঘ) ২৪ অক্টোবর।

(ii) বেবিফুডের প্যাকেটে বা টিনে কী চিহ্ন থাকবে?

(ক) ISI (খ) হলমার্ক (গ) সিল্ক মার্ক (ঘ) এন. এ. বি. এইচ.।

(iii) কেবলমাত্র ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত আদালতের নাম কী?

(ক) পৌরসভা (খ) গ্রাম পঞ্চায়েত (গ) ক্রেতা আদালত (ঘ) বিধানসভা।

(iv) সোনার গয়নার গুণমানের নির্দেশক কী?

(ক) আগমার্ক (খ) হলমার্ক (গ) উলমার্ক (ঘ) সিল্ক মার্ক।

(v) আপেলের উপর কী ভেজাল স্প্রে করা হয়?

(ক) হলুদ (খ) সিসা (গ) আর্সেনিক (ঘ) ইউরিয়া।

প্রকল্প ঃ (১) ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক একটি সচেতনতা প্রকল্প গ্রহণ করবে।

(২) শিক্ষার্থীরা বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে যে সকল খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে তাতে কোনো ভেজাল আছে কীনা দেখবে এবং তার ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করবে।

(৩) স্থানীয় বাজার পরিদর্শন করবে এবং খাদ্যবস্তু, শাকসবজি, মাছ, মশলা প্রভৃতিতে ভেজালের ক্ষতিকারক প্রভাব নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে সচেতন করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিপর্যয় মোকাবিলা

৫.১.১ বন্যা

বিভিন্ন কারণে স্থলভাগের বিস্তীর্ণ এলাকা অস্থায়ীভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ার ঘটনাকে বন্যা বলে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের একটি অন্যতম উদাহরণ হলো বন্যা। দেশের প্রায় সব নদী অববাহিকায় বন্যা দেখা দেয়। সাধারণত অতিবৃষ্টি ও নদীনালা, খালবিল ইত্যাদি জলাশয় ও জলাধারের বহনক্ষমতার অভাবে বাঁধের উপর সম্মিলিত চাপ বেশিরভাগ বন্যার মূল কারণ। বন্যার জলের স্রোতে সব ভেসে গিয়ে বা ভেঙে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাসিন্দাদের সম্পদ। সাধারণত বৃক্ষরোপণ করে, জলাধার, নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, বিকল্প নিকাশি নালা প্রভৃতি নির্মাণ করে, নদীর তলদেশে জমা পলি সরিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা যায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হলো বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানো।

৫.১.২ বন্যার কারণ

(i) অত্যধিক বৃষ্টি হবার ফলে জলাধারের জলবৃদ্ধি হলে অথবা বাঁধে ফাটল ধরলে বা বাঁধ ভেঙে গেলে নদীর জল কূল ছাপিয়ে প্লাবিত হওয়ার কারণে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়।

(ii) তাছাড়াও কোনো কারণে নদীর গতিপথ আটকে গেলে, নদী সরু হয়ে গেলে বা নদীর তলদেশে অত্যধিক পলিসঞ্চয়ের ফলে, নদী তার স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তন করলে নদীতে অতিরিক্ত জলবহন ক্ষমতার অভাব হয়। ফলে নদী তার নাব্যতা হারায় এবং নদীর জল তখন কূল ছাপিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকাকে প্লাবিত করে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে।

(iii) অত্যধিক বৃষ্টি থেকে হড়পা বান, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় হতে পারে; এর ফলে উঁচু থেকে হঠাৎ প্রবল জলস্রোত পাথরের চাঁইসহ নদীপথে সমতলের দিকে ধেয়ে আসে। হড়পা বান প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ার প্রায় ৬ ঘণ্টার মধ্যে ঘটে যা মূলত আকাশ ভাঙা বৃষ্টি, ঘূর্ণীঝড় প্রভৃতির কারণে হয়।

(iv) বৃষ্টির জলকে তাড়াতাড়ি নদী-খাল-বিল প্রভৃতির মধ্যে নিয়ে ফেলার মতো নিকাশির অপ্রতুলতা বন্যার অন্যতম কারণ।

(v) বরফ গলার ফলে নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়েও বন্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বর্তমানে পরিবেশ দূষণের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলস্বরূপ মেরুপ্রদেশে জমে থাকা বরফ গলে অথবা পর্বতশীর্ষের বা হিমবাহের বরফ গলেও বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

(vi) উপকূলে প্রবল ঘূর্ণীঝড় ও প্রবল ঢেউ বা জলোচ্ছ্বাস বন্যার পূর্বাভাস নির্দেশ করে এবং তা উপকূলবর্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করে।

(vii) অনেকসময় সমুদ্রতলদেশে ভূমিকম্পের ফলে প্রবল সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা সুনামির ফলেও উপকূলভাগে ভয়ংকর বন্যা দেখা দেয়।

(viii) ভরা কটালের ফলেও নদী মোহনায় সাময়িক বন্যা দেখা দিতে পারে।

(ix) মূলত শহর ও নগরের বেশিরভাগ বন্যার কারণ হলো জলনিকাশি নালাগুলি আবর্জনায় বন্ধ হয়ে থাকা।

(x) ভূমিরূপের বিশেষ গঠনগত কারণেও বন্যা হয়। যেমন — দেশের প্রায় সব নদী অববাহিকায় বিশেষ করে আমাদের দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বেশি বন্যাপ্রবণ। দেশের প্রায় ৬০% বন্যা এই অঞ্চলে হয় আর দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৪৭% এই অঞ্চলে বাস করে।

(xi) বিশেষ আবহাওয়াজনিত কারণও বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য অনেক সময় দায়ী হয়। যেমন — দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আমাদের রাজ্যে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। সেই সময় প্রায় ৭৫% বৃষ্টিপাত হয় আর প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে সমস্ত জল গিয়ে জলাভূমি বা নদীতে পড়ে, যার ফলে প্রায় প্রতি বছরই এই সময়টাতে প্লাবন দেখা দেয় ও বন্যার ভ্রূকুটি সৃষ্টি হয়।

৫.১.৩ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি

বন্যার ফলে যেসকল দৃষ্টান্তমূলক প্রভাব পড়ে সেগুলি যথাক্রমে ঃ

(i) **ঘরবাড়ি এবং পরিকাঠামোর ভেঙে পড়া বা ক্ষয়ক্ষতি —** জলের তোড়ে পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে বা নষ্ট হয়, জল জমে থাকার জন্য ভূমিধসের সম্ভাবনা তৈরি হয়। উপকূল এলাকায় মাছ ধরার সরঞ্জাম ও নৌকা হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। দুর্বল ভিতযুক্ত ঘর, কাদামাটির দেয়াল যা জলে নরম হয়ে যায়, সব ভেঙে পড়তে পারে আর তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাসিন্দারা ও তাদের সম্পদ।

(ii) **হতাহতের ঘটনা এবং জনস্বাস্থ্য —** মানুষ এবং পশু জলে ডুবে মারা যায়, কেউ কেউ মারাত্মক আঘাতও পায়। ডায়ারিয়া, ভাইরাস সংক্রমণ ও ম্যালেরিয়ার মতো মহামারি দেখা দেয়।

(iii) **জল সরবরাহে বিঘ্ন ও পানীয় জলের সংকট —** কুয়ো, ভূগর্ভস্থ জল, পাইপের জল প্রভৃতি সবই দূষিত হয়ে পড়ে, আর পরিষ্কার জল নাও পাওয়া যেতে পারে। ফলে পানীয় জলের সংকট দেখা দেয়।

(iv) **শস্য এবং খাদ্য সরবরাহে অসুবিধা —** প্রচুর মাঠের ফসল জলে ডুবে নষ্ট হওয়ায় হঠাৎ করে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। সেইসঙ্গে পশুখাদ্যও নষ্ট হয়। গুদাম এবং খাদ্যসামগ্রী মজুত করার অন্য সুবিধাও জলে ডুবে যায়, তার ফলেও হঠাৎ করে খাদ্যসংকট দেখা দেয়।

(v) **চাষের জমির ক্ষতি —** বন্যায় মাটির চরিত্রও পালটে যায়, মাটির উপরের অংশ বন্যার জলে ধুয়ে যাওয়ায় বা লবণাক্ত জলের প্রভাবে জমি উর্বরতা হারায়।

৫.১.৪ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর উপায়

(i) জলাধার, নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, বিকল্প নিকাশি নালা প্রভৃতি নির্মাণ করে এবং গাছপালার সংখ্যা বৃদ্ধি করে জলের বেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। নদীর পলি সরানো, গাছ লাগানো কর্মসূচি প্রভৃতি কর্মসূচির অংশ হতে পারে।

(ii) বানভাসি এলাকায় যেখানে আগে থেকেই বসতি আছে, সেখানে বিপদসংকুলতা কমানোর সবচেয়ে ভালো পথ হলো সেখানকার লোকজনকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া। বন্যাকবলিত অঞ্চলে খুব বড়োসড়ো উন্নয়নমূলক কাজের অনুমতি না দেওয়াই উচিত। স্কুল, হাসপাতাল, পঞ্চায়েত অফিস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গৃহ নিরাপদ জায়গায় করা দরকার।

(iii) বাঁধ থেকে জল ছাড়া ও আটকে রাখার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

(iv) উঁচু জায়গায় বাড়িঘর তোলা যেতে পারে, বাড়িঘর জলাধার থেকে দূরে তৈরি করা উচিত। বাড়িঘর বন্যা প্রতিরোধকভাবে তৈরি করা ও জনগোষ্ঠীর দ্বারা বহুমুখী আশ্রয়স্থল তৈরি করা উচিত।

(v) চাষবাসের ক্ষেত্রেও বন্যাকে মাথায় রেখে বন্যায় ক্ষতি হয় না এমন বীজ রোপণ করা যেতে পারে।

(vi) বন্যার সতর্কতা জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি নিরাপদ আশ্রয় কোথায় আছে তা চিহ্নিত করে সময় নষ্ট না করে সেখানে আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

৫.১.৫ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি আটকাতে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতি

(i) **মানচিত্র তৈরি করে পূর্বসতর্কতা ঃ** এলাকায় বন্যার ঝুঁকি কমাতে প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো বন্যাপ্রবণ অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করা, ছাত্রছাত্রীরা যা সহজেই করতে পারে।

বিগত নথি থেকে জানা যায় বানভাসি এলাকায় কখন বন্যা আসে আর কতটা বিস্তৃত হয়। মূল মানচিত্রের সঙ্গে অন্যান্য মানচিত্র ও তথ্য একসঙ্গে করলে সম্পূর্ণ বানভাসি এলাকার চিত্র বোঝা যায়। বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকলে আগেরবারের জলের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে সতর্কতা জারি করা যেতে পারে। উপকূল এলাকার ঢেউয়ের উচ্চতা ও ভূমির চরিত্র থেকে বানভাসি এলাকা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বন্যাসংক্রান্ত দুর্যোগ-মানচিত্র বন্যার সময় জলের গতি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। কাছাকাছি নিরাপদ আশ্রয় কোথায় আছে তা চিহ্নিত করে রাখা যায় বলে প্রয়োজনে সময় নষ্ট না করে সেখানে আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

(ii) **প্রশিক্ষণ নিয়ে সংস্কারমূলক প্রকল্পভিত্তিক কাজ করে ঃ** গাছপালার সুরক্ষা, স্রোত ও অন্যান্য জলাধার থেকে নুড়ি-পাথর ইত্যাদি পরিষ্কার করা, লেক ও পুকুর সংরক্ষণ করা প্রভৃতির মাধ্যমেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

বন্যার তীব্রতা কমাতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের এলাকার নিকাশি নালার সংস্কার করার কাজে হাত দিতে পারে। বালির বস্তা ব্যবহার করার মাধ্যমে জল আটকানোর কাজ করা, বন্যার স্বাভাবিক গতিবেগকে আটকানো ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাখতে পারে এবং অংশগ্রহণমূলকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গে মিশে বন্যার জল ঢোকা রুখতে নদীবাঁধ মেরামতি, বালির বস্তা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম মজুত করার কাজে শামিল হতে পারে।

বিপর্যয় প্রতিরোধের অংশগ্রহণকারী পরিকল্পনা

- জনসাধারণের কী কী থাকা দরকার
  - মনোভাব
  - জ্ঞান
  - দক্ষতা
- সমষ্টির কী কী থাকা দরকার
  - পরিকাঠামো
  - সংগঠন
  - নীতি

বন্যার পূর্ববর্তী সময়ে কী করতে হবে ঃ

- সামগ্রিকভাবে বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করতে হলে এলাকার প্রতিটি মানুষ ও পরিবারকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিক সময়ে সঠিকভাবে পালন করতে হবে।
- গোষ্ঠীগুলিকে বিপর্যয়ের আগে এলাকাবাসীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, তাদের সকলকে এই বিপর্যয় প্রতিরোধ কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য।

- এলাকার জনসাধারণকে বিপর্যয় প্রতিরোধের সামগ্রিক কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট সচেতনতার ধারণা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘরবাড়ি বিপর্যয়-প্রতিরোধী পরিকল্পনামতো তৈরি করা ও ছোটোখাটো মেরামত করা ।
- যেসব এলাকাবাসীর বাড়িঘর মোটামুটি মজবুত ও নিরাপদ সেখানে অন্যান্যদের দামি ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও সম্পত্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থাগ্রহণ।
- বিপর্যয় এলে কোন কোন রাস্তা দিয়ে নিরাপদ আবাসে পৌঁছোতে হবে সে সম্পর্কে গ্রামবাসীদের অবহিত করা।

- উঁচু জায়গায় মজবুত বাড়ি তৈরি করতে হবে।
- সবসময় বাঁধের ভিতরে বাড়ি তৈরি করতে হবে।
- ভিটেবাড়ি নীচু হলে বন্যার আগেই মাটি দিয়ে উঁচু করতে হবে।
- মাটি যাতে বন্যার জলে ভেসে না যায় তার জন্য বেশি বেশি বৃক্ষরোপণ করতে হবে সর্বত্র।
- বন্যাপ্রবণ এলাকার শিশু, যুবক-যুবতি সকলকে সাঁতার শিখতে হবে।
- বন্যা থেকে বাঁচবার নকল মহড়া অনুশীলন করতে হবে বারেবারে।

বন্যার সময় কী করতে হবে ঃ

- ঘর ও ছাদের দরজা-জানালা পেরেক মেরে বন্ধ করা।
- নিরাপদ আবাসে পৌঁছোনোর রাস্তাঘাট ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা।
- ঘরবাড়ি থেকে মই, বেলচা, কাঠের বালতি ইত্যাদি জিনিসপত্র সরিয়ে রাখা যাতে এসব জিনিস হাওয়ায় উড়ে গিয়ে কাউকে আঘাত করতে না পারে।
- বাঁধ পরীক্ষা করা।
- মজবুত, শক্তপোক্ত ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোনো বাড়িতে অন্যদের দামি জিনিসপত্র, সারের বস্তা, খাদ্যশস্য ইত্যাদি সরানোর ব্যবস্থা নেওয়া ।
- নৌকা, তাঁত, মাছ ধরার জাল, পাম্পসেট ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে রাখা।
- প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকা সংগ্রহ এবং নথিপত্র ইত্যাদিকে প্লাস্টিকের ব্যাগে সংরক্ষণ করা যাতে সেগুলি জল লেগে নষ্ট না হয়।
- নিয়মিতভাবে রেডিয়োতে আবহাওয়ার সতর্কতা শোনা, যাতে আধিকারিকেরা ব্যক্তিগতভাবে জানতে না পারলেও সকলে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন।
- আটা, ময়দা, চিড়ে, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি মজুত করা, অন্তত ২-৩ দিন একটি পরিবারের চাহিদামতো জল প্লাস্টিকের জেরিক্যানে ও প্যাকেটে মজুত করা।

- হারিকেন, টর্চ, দেশলাই, ব্যাটারি, হাতের কাছে তৈরি রাখা।
- বিপর্যয়ের আভাস পাওয়ামাত্র পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ আবাসে সরানোর কাজ শুরু করা।
- বিপদ থেকে বাঁচতে সকলে যাতে নিরাপদ আবাসে বিপর্যয়ের সময় থাকেন তা নজরে রাখা।
- সকলে যাতে খাওয়াদাওয়া করতে পারেন সেদিকে নজর দেওয়া।
- গুজব যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সে বিষয়ে খেয়াল রাখা।
- চিকিৎসা সংক্রান্ত শিবির পরিচালনা।

- কেবলমাত্র নলকূপের জলই পান করতে হবে।
- কুয়ো/পুকুরের জল পান করার আগে ফুটিয়ে নিতে হবে।
- ডায়ারিয়া হলে যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে হাতের কাছে সহজপাচ্য পানীয়, যেমন— চায়ের লিকার, ভাতের ফ্যান, ডাবের জল ইত্যাদি খেতে দিতে হবে।
- এরপরও যদি ডায়ারিয়া না কমে তাহলে অবিলম্বে স্বাস্থ্যকর্মী বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বা ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা।
- সুরক্ষিত উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেওয়া।
- ব্যাটারিচালিত রেডিয়ো ব্যবহার করা।

বন্যার সময় কী করবে না ঃ

- কুয়ো ও পুকুরের জল না ফুটিয়ে বন্যার সময় খাবে না।
- যেখানে-সেখানে জঞ্জাল ফেলবে না।
- খোলা জায়গায় পায়খানা করবে না।

- বন্যার জলে অতি প্রয়োজন ছাড়া নামবে না।
- বাসি খাবার খাবে না।
- কোনো ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবে না।
- ঘরের জানালা-দরজা খোলা রাখবে না।

বন্যার পরবর্তী সময়ে কী করবে ঃ

- প্রশাসনিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিয়ম মেনে চলা।
- রান্না, শৌচাগার প্রস্তুতি, খোঁজখবর ও উদ্ধারে সহায়তা ।

- বিশুদ্ধ জল ও শৌচাগার ব্যবহার করতে হবে, যাতে মহামারি না ছড়ায়।
- নিরাপদ আবাস ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।
- যাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁদের সম্পর্কে কিছু জানা থাকলে তা স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো।
- জঞ্জাল, ময়লা ও আবর্জনা পরিষ্কার।
- যত শীঘ্র সম্ভব ভেঙে পড়া বা ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর মেরামতি।
- ছোটখাটো ঋণের ব্যবস্থা করে আয়ের ব্যবস্থা করা।

৫.১.৬ বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিধি

জলাধার, নিকাশি নালার নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণ করে এবং গাছপালার সংখ্যা বৃদ্ধি করে জলের বেগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পলি সরানো, গাছ লাগানো প্রভৃতি জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিরোধ কর্মসূচির অংশ হতে পারে। বানভাসি এলাকায় যেখানে আগে থেকে বসতি আছে সেখানকার লোকজনকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গরিব লোকেরা যাতে নদীর চরে ঘরবাড়ি না করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। এইসব জায়গায় আইন করে ঘরবাড়ি তৈরিতে বাধা দেওয়া প্রয়োজন। স্কুল, হাসপাতাল, পঞ্চায়েত অফিস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গৃহনির্মাণ নিরাপদ জায়গায় করা দরকার। বাড়িঘর যাতে বন্যাপ্রতিরোধ করতে পারে সেভাবে তৈরি করা প্রয়োজন।

সব বিপর্যয়কে একেবারে বন্ধ করা যায় না, কিন্তু বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করা যায়। বিপর্যয় প্রতিরোধ, বিপর্যয় মোকাবিলার পন্থা। বিপর্যয়কে নিত্যসঙ্গী করে বাঁচতে শেখায় জীবন।

বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় বিপর্যয়ের পূর্ববর্তী সময়, বিপর্যয়ের সময় ও বিপর্যয়ের পরবর্তী সময়ের জন্য সুসংহত দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় মোট ৯টি সক্রিয় কর্মীগোষ্ঠী গঠন করতে হবে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, মাতা কমিটির সদস্য, যুব প্রতিনিধি ও জনসাধারণের প্রতিটি স্তরের সক্রিয় সদস্যদের নিয়ে ৬-১০ জন সদস্যের এক-একটি গোষ্ঠী গঠন করতে হবে। গোষ্ঠীগুলির নাম ও কাজ নিম্নে আলোচিত হলো —

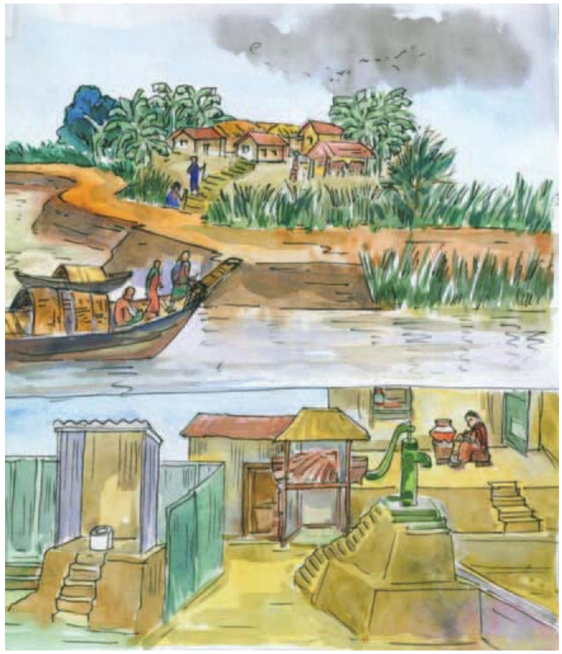

১. বন্যা সতর্কীকরণ গোষ্ঠী

২. আশ্রয়স্থল ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী

৩. বিপর্যস্ত এলাকা থেকে সরিয়ে আনা ও উদ্ধারকারী গোষ্ঠী

৪. প্রাথমিক শুশ্রূষা ও চিকিৎসাকারী গোষ্ঠী

৫. জল ও শৌচালয় পরিসেবা গোষ্ঠী

৬. মৃতদেহ সৎকার গোষ্ঠী

৭. পরামর্শদান গোষ্ঠী

৮. ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন গোষ্ঠী

৯. ত্রাণ ও সমন্বয়সাধন গোষ্ঠী

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করবার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠন করা প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ বন্যা সতর্কীকরণ গোষ্ঠীর কাজের নমুনা উল্লেখ করা হলো।

১। বন্যা সতর্কীকরণ গোষ্ঠীর কাজ —

(ক) বন্যার পূর্ববর্তী সময়ে সতর্কীকরণ ঃ

- সারাদিন ধরে রেডিয়ো / টেলিভিশন ও প্রশাসনিক ওয়্যারলেস মারফত প্রচারিত আবহাওয়া সতর্কীকরণের উপর একটানা লক্ষ রাখা।

- বিপর্যয়ের আগাম আভাস পাওয়ামাত্রই মাইক বা অন্য কিছুর মাধ্যমে গ্রামের জনগোষ্ঠীর কাছে খবর পৌঁছে দেওয়া। প্রয়োজনে সাইকেল, গোরুর গাড়ি, নৌকা বা অন্য কোনো পরিবহনের সাহায্য নিতে হতে পারে।

- নিকটবর্তী প্রশাসনিক অফিসগুলির টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানা যাতে এই গোষ্ঠীর কাছে থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) বন্যার সময় (যখন আবহাওয়ার সতর্কীকরণ পাওয়া গেছে) ঃ

- গ্রামের সর্বত্র, বিশেষ করে যেসব এলাকাকে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেইসব এলাকাতে বিপদসংকেত পৌঁছে দেওয়া।
- যত শীঘ্র সম্ভব আশ্রয়শিবিরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

(গ) বন্যার পরবর্তী সময় ঃ

- রেডিয়ো মারফত বন্যার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জানা।
- দুর্যোগ পরবর্তী সময় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে এলাকায় তথ্য সরবরাহ।
- অন্যান্য সক্রিয় গোষ্ঠী, যেমন - উদ্ধার ও আবাসস্থলগুলির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তথ্য বিনিময় ও নিবিড় যোগাযোগ রাখা।

১১। অন্যান্য গোষ্ঠীসমুহ—

এছাড়াও এলাকা পাহারা দেবার জন্য টহলদারী গোষ্ঠী, যোগাযোগ রক্ষাকারী গোষ্ঠী, পুলিশি সহায়তাকারী গোষ্ঠী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও ত্রাণসংগ্রহ গোষ্ঠী প্রভৃতি।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সকল গোষ্ঠীতে কাজ করতে হবে এমন বিষয় নয়। শিক্ষার্থীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করবে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর সদস্যদের লক্ষ রাখতে হবে, অতি উৎসাহে কোনো ছাত্রছাত্রী বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখিন না হয়। এই বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা আগামী দিনের দেশের সুনাগরিক। আমরা বিপর্যয় বন্ধ করতে পারব না। ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিপর্যয়কে নিত্যসঙ্গী করে বাঁচতে শেখে ও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অসহায় মানুষগুলির জন্য কিছু করতে পারে সেই মানসিকতার উন্মেষের জন্য এই প্রকল্প।

কর্মপত্র

Section-1:Recap Zone

১। দু-এক লাইনে উত্তর দাও ঃ

(i) ‘হড়পা বান’ কী?

(ii) বন্যা কাকে বলে?

(iii) কীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(iv) কীভাবে বন্যা হয়?

(v) আমাদের দেশের কোন অঞ্চলে বেশি বন্যা হয়?

২। সঠিক উত্তরটি বেছে লেখো ঃ

(i) বন্যাপ্রবণ এলাকায় শিক্ষার্থীদের অবশ্যই কী শেখা উচিত?

(ক) গান (খ) সাঁতার (গ) বাজনা (ঘ) নাচ।

(ii) ডায়ারিয়া হলে রোগীকে কী খাওয়ানো উচিত?

(ক) চায়ের লিকার (খ) ফ্যাটজাতীয় খাবার (গ) মাংস (ঘ) বড়ো মাছ।

(iii) বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কীভাবে?

(ক) জলসেচের ব্যবস্থা করে (খ) পাম্প করে জল কমিয়ে দিয়ে (গ) জলাধার নির্মাণ করে (ঘ) বৃষ্টি কমানোর ব্যবস্থা করে।

(iv) বন্যার সময় কোন জল পান করা উচিত?

(ক) নলকূপের (খ) পুকুরের (গ) নদীর (ঘ) কুয়োর

(v) সমুদ্রের তলদেশে কী ঘটলে উপকূলভাগে বন্যা দেখা দিতে পারে?

(ক) জাহাজ ডুবে গেলে (খ) বৃষ্টি হলে (গ) ভূমিকম্প হলে (ঘ) অতিরিক্ত লোক সমুদ্রে স্নান করলে

৩। সঠিক উত্তরটির পাশে সত্য এবং ভুল উত্তরটির পাশে মিথ্যা লেখো ঃ

(i) হড়পা বান বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় হয়।

(ii) বন্যার সময় বাসি খাবার খাওয়া উচিত।

(iii) বন্যার সময় জল না ফুটিয়ে খাবে না।

(iv) বন্যার জলে সাঁতার কাটা উচিত।

(v) প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী গঠন করা প্রয়োজন।

৪। রচনাধর্মী প্রশ্নাবলি ঃ

(i) বন্যার সময় কী কী করা উচিত?

(ii) বন্যার সময় আমাদের কী ক্ষয়ক্ষতি হয়?

(iii) বন্যার পূর্ববর্তী সময়ে কী কী করা উচিত?

প্রকল্প ঃ বন্যার পূর্বে, বন্যার সময় কী করবে এবং কী করবে না এবিষয়ে একটি সচেতনতা প্রকল্প গ্রহণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পথনিরাপত্তা

৬.১.১ পথনিরাপত্তায় ট্রাফিক পুলিশ

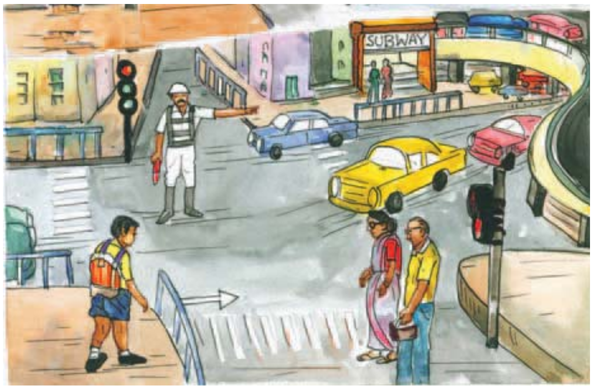

দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার প্রতীক ট্রাফিক পুলিশ। প্রচণ্ড গরম, দিনভর বর্ষা, মারাত্মক শীত সব ঋতুতে, সবসময়েই ট্রাফিক পুলিশকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রীনিরাপত্তার জন্য কর্তব্যসম্পাদন করতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। দুর্ঘটনার হাত থেকে যানবাহন ও ব্যক্তিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকে ট্রাফিক পুলিশ। মহানগর এবং শহরে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে, তার জন্য সদাসতর্ক থেকে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করে চলে ট্রাফিক পুলিশ। যেসকল গাড়িচালক ও পথচারী পথচলার নিয়মকানুন অমান্য করেন, তাদের প্রতি ট্রাফিক পুলিশ কঠোর মনোভাব দেখালেও, প্রকৃতপক্ষে মানুষের এবং সমাজের বন্ধু হয়েই এরা কাজ করে থাকেন। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, ছোটোদের, পথচলার নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের, প্রবীণ-প্রবীণাদের, প্রতিবন্ধী মানুষদের রাস্তা পার করে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ট্রাফিক পুলিশ। বাঁশি বাজিয়ে গতিশীল গাড়িকে সংকেত-নির্দিষ্ট স্থানে থামিয়ে রেখে, হাত ধরে পথচারীকে রাস্তা পারাপার করে দিতে কোনোরকম দ্বিধা ট্রাফিক পুলিশের মধ্যে দেখা যায় না। আবার যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে মুহূর্তে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত ব্যক্তির সেবা করা, প্রয়োজনে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা ও সমগ্র দুর্ঘটনাপূর্ণ স্থানটিকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করে ট্রাফিক পুলিশ। শুধু তাই নয়, পথচারী এবং গাড়িচালকদের সঠিক পথনির্দেশ করে দেবার ক্ষেত্রেও ট্রাফিক পুলিশ সামনের সারিতেই থাকে। বর্তমানে শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পথনিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য তাঁরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও শুরু করেছেন। প্রতি বছর ভারতে জানুয়ারি মাসের প্রথম সোমবার থেকে **পথনিরাপত্তা সপ্তাহ** পালনের মাধ্যমে সবাইকে সচেতন করার প্রয়াস তারা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং, ট্রাফিক পুলিশ নানাভাবে কাজের মধ্য দিয়ে রাস্তায় পথ চলতে, পথচারী ও গাড়িচালকদের জীবনরক্ষা করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন বলে ট্রাফিক পুলিশকে আমরা আমাদের জীবনরক্ষক, বন্ধু ও সহায়ক বলতে পারি।

৬.১.২ পথরেখা

পথনিরাপত্তার জন্য যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয় পথরেখা (Road Marking) তাদের অন্যতম—

(ক) স্টপলাইন বা গাড়ি থামবার দাগ ঃ প্রতিটি ক্রসিং-এ এই দাগ দেখা যায়। দাগটির সামনে Stop লেখা থাকে। সিগন্যাল লাল হবার সঙ্গে সঙ্গে যে রাস্তায় যানবাহন বন্ধ হয় সেই রাস্তার গাড়িগুলি ওই দাগ বরাবর থেমে যায়। এরপরই স্টপলাইনের সামনের পথচারীদের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়ে পথচারীরা রাস্তা পার হয়।

(খ) পথচারীদের রাস্তা পার হওয়ার স্থান ঃ

১। **জেব্রা ক্রসিং** — স্টপলাইনের সামনে সাদা-কালো দাগ দেওয়া পথচারীদের রাস্তা পার হওয়ার নির্দিষ্ট স্থানকে জেব্রা ক্রসিং বলে। এছাড়াও হেরিং বোন ক্রসিং ও সিম্পল ক্রসিং-এর ব্যবহার করা হয়।

জেব্রা ক্রসিং　　*হেরিং বোন ক্রসিং*　　*সিম্পল ক্রসিং*

২। **ফুটব্রিজ** — ব্যস্ততম রাস্তাগুলিতে রাস্তা পার হওয়ার জন্য ফুটব্রিজ থাকে।

৩। **আন্ডারপাস**— মাটির তলা দিয়ে যাতায়াতের জন্য যে পথ থাকে তাকে আন্ডারপাস বলে।

(গ) মধ্যরেখা ঃ প্রধান রাস্তার মাঝখান দিয়ে হলুদ বা সাদা দাগ দেওয়া থাকে। এই দাগকে মধ্যরেখা বলে। এর দুই পাশ দিয়ে গাড়িগুলি বিপরীত দিকে যাতায়াত করে।

(ঘ) গাড়ি পার্কিং-এর নির্দিষ্ট দাগ ঃ রাস্তার পাশে গাড়ি পার্কিং করার স্থান দাগ দিয়ে নির্দিষ্ট করা থাকে।

(ঙ) টার্নিং দাগ ঃ রাস্তায় সামনে বাঁক থাকলে টার্নিং-এর দাগ দেওয়া হয়।

(চ) লেন ঃ সমস্ত গাড়ি নির্দিষ্ট লেন ধরে যাতায়াত করবে। লেন পরিবর্তন করতে হলে নির্দিষ্ট নিয়ম যথাযথ মেনে লেন পরিবর্তন করতে হবে এবং তার পিছনের গাড়িকে নির্দিষ্ট সংকেত দিতে হবে।

৬.১.৩ কার্ব ড্রিল

(ক) আলোর সংকেত বা ট্রাফিক পুলিশ না থাকলে বা জেব্রা ক্রসিং না থাকলে কার্বের উপর দাঁড়িয়ে প্রথমে ডান, তারপর বাঁ, তারপর আবার ডান দিকের রাস্তার দিকে নজর দিতে হবে এবং রাস্তায় চলমান গাড়ি

থাকলে গাড়ির দূরত্ব, যে রাস্তা পার হতে হবে তার দূরত্ব ও গাড়ির গতিবেগ প্রভৃতি বিষয়ে সতর্ক হওয়ার পর রাস্তা পার হতে হবে। একে কার্ব ড্রিল বলে।

(খ) রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির দূরত্ব ও চালকের সংকেত লক্ষ করতে হবে।

(গ) রাস্তায় যানবাহন দ্রুতগতিতে চলাচল করলে কখনোই রাস্তায় নামা উচিত নয়।

পথ চিহ্নিতকরণ —

বিভাজনরেখা / মধ্যবর্তী রেখা ঃ সমস্ত দ্বিমুখী রাস্তার মাঝখানে একটি দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই রেখা সাদা বা হলুদ রং-এর হয়ে থাকে। রেখার প্রস্থ নির্ভর করবে স্থান সংকুলানের সম্ভাব্যতার উপরে। এই দাগটির মূল উদ্দেশ্য হলো একটি রাস্তাকে দুটি অংশে বিভক্ত করা। বিভাজনরেখার মধ্য দিয়ে রাস্তার দুইধারে গমনপথ ও আগমনপথের নির্দিষ্টকরণ হলো পথনিরাপত্তার অন্যতম শর্ত।

যেসমস্ত রাস্তায় হলুদ রং-এর মধ্যবর্তী রেখা দেখতে পাওয়া যায় ও তার দুইপাশ দিয়ে যে যানবাহনগুলি যাতায়াত করে তারা কোনো অবস্থাতেই ওই হলুদ দাগটি অতিক্রম করতে পারবে না। যেসমস্ত রাস্তায় সাদা রং-এর মধ্যবর্তী রেখা দেখতে পাওয়া যায় তার দুইপাশ দিয়ে যে যানবাহনগুলি যাতায়াত করে তারা পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে তবেই ওই সাদা দাগটি অতিক্রম করতে পারবে। যদিও তার জন্য উৎসাহিত করা হয় না। বিপরীতমুখী যানবাহনের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যই এই বিভাজনরেখা রাস্তায় দেখা যায়।

লেন ব্যবস্থা ঃ প্রতিটি রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের হালকা, ভারী ও মিশ্রগতির যানবাহন দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল মিশ্রগতি ও প্রকৃতির যানবাহনকে যদি আমরা সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা ছাড়া, রাস্তায় চলতে দিই তাহলে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যানজট, দুর্ঘটনা এবং ভোগান্তি। এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে রাস্তার প্রতিটি ভাগে সাদা রং-এর বিচ্ছিন্ন দাগ দেখতে পাওয়া যায়। যেগুলি রাস্তার প্রতিটি ভাগকে রাস্তার পরিসর অনুযায়ী দুই বা ততোধিক ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত করে। একেই লেন ব্যবস্থা বলে। যেসমস্ত রাস্তায় লেন ব্যবস্থা দেখতে

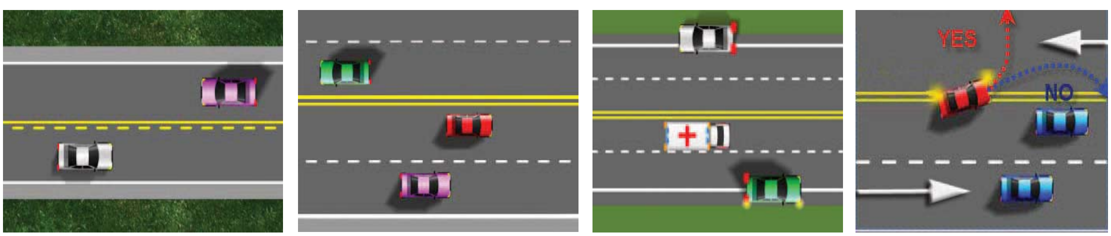

পাওয়া যায় সেখানে যানবাহনের গতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট লেন-এ চলা উচিত। অর্থাৎ উচ্চগতির যানবাহন একদম ডান দিকের লেন দিয়ে যাবে, অপেক্ষাকৃত কম গতির যানবাহন এবং যেসমস্ত যানবাহনকে বারংবার দাঁড়াতে হয়; যেমন বাস, মিনিবাস ইত্যাদিকে বাঁদিকের লেন দিয়ে চলা উচিত। এছাড়াও কোনো রাস্তার মোড় থেকে যে যানবাহনগুলি যেদিকে যাবে তাদের সেই দিকের লেনে দাঁড়িয়ে সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত।

ডবল সাদা/হলুদ লাইন

যে-সমস্ত রাস্তায় ভারী এবং দ্রুতগতির যানবাহন চলাচল করে, সেখানে হলুদ রং-এর দুটি সমান্তরাল নিরবচ্ছিন্ন দাগ আঁকা থাকে। ট্রাফিকের প্রবাহকে এই লাইন পার হতে দেওয়া হয় না।

গোটা ও ভাঙা লাইনের সংমিশ্রণ

কোনো কোনো রাস্তায় নিরবচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সাদা/হলুদ মধ্যবর্তী রেখা সমান্তরালভাবে আঁকা থাকে। সেক্ষেত্রে যে যানবাহনগুলির ডানদিকে নিরবচ্ছিন্ন রেখা থাকে, তারা সেই রেখা পার করতে পারবে না। আবার যে যানবাহনগুলির ডানদিকে বিচ্ছিন্ন রেখা থাকবে, তারা প্রয়োজনে তা পার করতে পারবে।

একটি হলুদ লাইন ঃ ব্যস্ত রাস্তায় নিরবচ্ছিন্ন হলুদ/সাদা মধ্যবর্তী রেখা আঁকা থাকে। কোনো যানবাহন কোনো অবস্থাতেই তা পার করতে পারবে না।

স্টপ লাইন

জেব্রা ক্রসিং-এর আগে একটি মোটা লাইন আঁকা থাকে তাকে স্টপ লাইন বলে। সব বাহনকে এই লাইনের আগে দাঁড়াতে হবে, যখন সিগন্যাল লাল থাকবে বা ট্রাফিক পুলিশ থামার নির্দেশ দেবে। এই লাইন অমান্য করলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বর্ডার বা ধারের লাইন

এই লাইনগুলি রাস্তার ধারে নিরবচ্ছিন্ন লাইন। ড্রাইভার যতদূর সাবধানে চালাতে পারে তার সীমা নির্ধারণ করে।

পার্কিং নিষিদ্ধ লাইন

কার্বের উপর সাদা-কালো বা হলুদ-কালো ডোরাকাটা দাগ থাকলে সেই অংশকে নো-পার্কিং জোন বা পার্কিং নিষিদ্ধ অঞ্চল বলা হয়।

পথচারীর পারাপারের স্থান

রাস্তার উপর যে অংশে সাদা-কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে তাকে জেব্রা ক্রসিং বলে। পথচারীরা এই জেব্রা ক্রসিং দিয়েই রাস্তা পার হবে। রাস্তার উপর এই অংশেই পথচারীদের অধিকার যানবাহনের আগে। এছাড়াও পথচারীদের রাস্তা পার হওয়ার জন্য হেরিং বোন ক্রসিং ও সিম্পল ক্রসিং থাকে।

সাধারণভাবে ট্রাফিক পেইন্ট দিয়ে এই মার্কিংগুলি করে। অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে রোড স্টাড, ক্যাটস আই ও থার্মোপ্লাস্টিক স্ট্রিপ বা পট্টি। এই মার্কিংগুলি রাস্তায় দেওয়া থাকে ট্রাফিকের সুচারু প্রবাহ ও সড়ক সুরক্ষার জন্য।

৬.১.৪ ট্রাফিক পুলিশের নির্দেশ ও ট্রাফিক আলোর সংকেত

(ক) ট্রাফিক পুলিশ যেদিকের রাস্তায় Stop সংকেত দেবে সেই রাস্তা দিয়ে সমস্ত যানবাহন চলাচল থেমে থাকবে এবং উলটোদিকের যানবাহন চলাচল শুরু করবে। কিছুক্ষণ পর ট্রাফিক পুলিশ তার অবস্থান পরিবর্তন করবে। ফলে বন্ধ থাকা রাস্তাটি খুলে যাবে ও খোলা রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যাবে।

(খ) জেব্রা ক্রসিং-এ রাস্তা পারাপারের সংকেত লাল থাকলে রাস্তা পারাপার নিষিদ্ধ থাকে। আলোটি যখন সবুজ হবে, যানবাহন থেমে গেলে রাস্তা পারাপার করা উচিত।

(গ) **আলোর সংকেত ঃ** নিয়ম মেনে গাড়ি চলাচলের জন্য রাস্তায় কিছু আলোকসংকেত দেওয়া থাকে, যেগুলি ট্রাফিক পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

১) লাল আলো দেখলে দাঁড়াতে হবে এবং রাস্তায় 'Stop' রেখার পিছনে অপেক্ষা করতে হবে।

২) সবুজ আলো দেখলে এগিয়ে যেতে হবে। বাঁদিকে বা ডান দিকে ঘুরতে চাইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং এগিয়ে যাওয়ার সময় যদি কোনো পথচারী রাস্তা অতিক্রম করছেন লক্ষ করা যায়, তাকে রাস্তা অতিক্রম করার সুযোগ দিতে হবে।

৩) অ্যাম্বার আলো সতর্কীকরণ সংকেত। সবুজ সংকেত পরিবর্তিত হয়ে অ্যাম্বার আলো দেখা গেলে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করে 'Stop'রেখার পিছনে দাঁড়াতে হবে। লাল সংকেত পরিবর্তিত হয়ে অ্যাম্বার আলো দেখা গেলে গাড়ি চালানোর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অর্থাৎ, গাড়ি দাঁড় করানোর জন্য লাল সংকেতের পূর্বে এবং গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সবুজ সংকেতের পূর্বে অ্যাম্বার সংকেত ব্যবহার করা হয়। তবে Stop রেখা অতিক্রম করে যাওয়ার পর অ্যাম্বার সংকেত দেখা গেলে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য গাড়ি দাঁড় না করিয়ে নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যেতে হয়।

৪) তিরচিহ্নবিশিষ্ট সবুজ সংকেত শুধুমাত্র ওইদিকে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

১নং সংকেত *২নং সংকেত* *৩নং সংকেত* *৪নং সংকেত*

৬.১.৫ পরিযান চিহ্ন (Traffic Sign) :

বাধ্যতামূলক সড়ক সংকেত

থামো
Stop

রাস্তা দাও
Give Way

প্রবেশ নিষেধ
No Entry

সাইকেল নিষিদ্ধ
Cycle Prohibited

পথচারী নিষিদ্ধ
Pedestrians Prohibited

সব গাড়ি নিষিদ্ধ
All Motor Vehicles Prohibited

হর্ণ নিষিদ্ধ
Horn Prohibited

নো পার্কিং
No Parking

সাবধানতামূলক সড়ক সংকেত

ট্রাফিক সংকেত
Trafic Signal

সামনে স্কুল
School Ahead

পথচারীর ক্রসিং
Pedestrian Crossing

কাজ চলছে
Men at Work

প্রহরারত লোকের ক্রসিং
Guarded Level Crossing

প্রহরাবিহীন লেবেল ক্রসিং
Ungurded Level Crossing

ডানদিকে বাঁক
Right Hand Curve

বামদিকে বাঁক
Left Hand Curve

তথ্যমূলক সড়ক সংকেত

পেট্রল পাম্প
Petrol Pamp

হাসপাতাল
Holpital

প্রাথমিক চিকিৎসার পোস্ট
First Aid Post

খাবার জায়গা
Eating Place

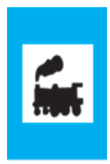

রেল স্টেশন
Railway Station

সামনে সুড়ঙ্গ
Tunnel Ahead

পথচারীর ভূমিগত পথপার
Pedestrian Subway

দিক চিহ্ন
Direction Sign

৬.১.৬ গাড়িচালকের হাতের সংকেত

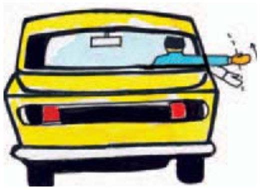

Passing Signal

এই সংকেতটি পিছনের গাড়িকে আগে যেতে দেবার জন্য

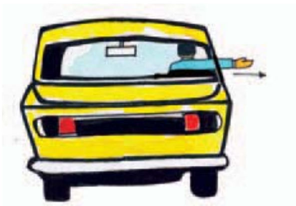

Right Turn Signal

এই সংকেতটি গাড়ি ডান দিকে ঘোরানোর জন্য।

Left Turn Signal

এই সংকেতটি গাড়ি বাঁদিকে ঘোরানোর জন্য।

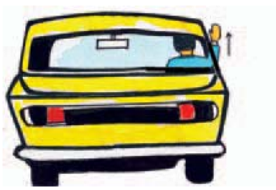

Stop Signal

এই সংকেতটি গাড়ি দাঁড় করানোর জন্য।

Slow Down Signal

এই সংকেতটি গাড়ির গতি আস্তে করার জন্য।

কৈশোর অতিক্রান্ত হবার আগেই এ সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষার্থীর চলাফেরায় নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে ও যানবাহনের গতিবেগ, বিভিন্ন ধরনের পরিযান চিহ্ন (Traffic Signs) সম্পর্কে সহজ ধারণা দেবে। এর সঙ্গে সঙ্গে সঠিকভাবে রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

৬.১.৭ সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও

শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক থেকে অভিভাবক ও গাড়ির চালকদের সচেতনতা

রাতে গাড়ি চালানো

রাতে গাড়ি চালানোর জন্য অতিরিক্ত সাবধানতা এবং সতর্কতার দরকার হয়। পথচারী, বাইসাইকেল, পশু এবং হাতে টানা গাড়ির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, কারণ এগুলি আলো ছাড়া চলে এবং দেখা কঠিন।

- নিরাপদভাবে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার এবং থামার সময় রাখার জন্য গাড়ি ধীরে চালাতে হবে।
- অন্ধকার হয়ে গেলে হেডলাইট জ্বালিয়ে নিতে হবে।
- রাস্তা যেখানে ভালোভাবে আলোকিত আছে সেখানে ডিপড হেডলাইট ব্যবহার করতে হবে।
- হেডলাইটগুলি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝেই সেগুলি পরীক্ষা করুন। এছাড়াও সঙ্গে অতিরিক্ত বাল্‌ব রাখতে হবে।
- উইনডস্ক্রিন পরিষ্কার রাখতে হবে, কারণ নোংরা উইন্ডস্ক্রিন আপনার দৃষ্টি ব্যাহত করতে পারে।
- যদি কোনো আগত গাড়ি হাই বিমে আলো জ্বালিয়ে আসে, তাহলে চোখ ধাঁধানো আলোর দিকে আর না তাকিয়ে সতর্ক হয়ে ধীরে ধীরে গাড়ির গতি কমাতে হবে।
- পিছনের অনুসরণ করা আলোর তীব্রতা কমানোর জন্য ভিতরের রিয়ার-ভিউ (পিছনে দেখার) আয়না রাতের পজিশনে রাখতে হবে বা সামান্য হেলিয়ে দিন বা বাইরের রিয়ার-ভিউ আয়না সামান্য হেলিয়ে রাখতে হবে।
- এক চোখের গাড়ি দেখতে ভুল করবে না - একটি গাড়ি যার একটি হেডল্যাম্প ফিউজ হয়ে গেছে সেটি দুই চাকার গাড়ি বলে ভুল করবে না।
- ওভারটেক করার আগে নিশ্চিত করতে হবে যে আগত যানবহন নিরাপদ দূরত্বে আছে।

রাতে দৃষ্টি এবং গাড়ি চালানোর দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কিছু পরামর্শ

- রাতে নামার আগে গাড়ির বাইরের সমস্ত আলো (সামনের এবং পিছনের, ব্রেক লাইট এবং হাই বিম) ঠিকমতো কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে জানলা এবং হেডলাইট যেন পরিষ্কার থাকে (ভিতর এবং বাইরে থেকে)। নোংরা জানলা আলোর তীব্রতা কমাতে

পারে এবং দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত করতে পারে, যার ফলে দেখা আরও কষ্টকর হয়। নোংরা হেডলাইটের কার্যকারিতা লক্ষণীয় পরিমাণে কম হয়।

- কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় হাই বিম ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে—সেগুলি নিজের দেখার ক্ষমতা কমাবে এবং অন্য গাড়ির চালকদের কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ করে দিতে পারে।
- অন্য কোনো গাড়ির হাই বিম জ্বললে সেই গাড়ির দিকে হাই বিম ফ্ল্যাশ করা এড়িয়ে চলতে হবে—এটা তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং অন্যান্য চালকদের দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করবে।
- অন্যান্য গাড়ির হেডলাইটের প্রতিফলন এড়ানোর জন্য. রিয়ার-ভিউ আয়না অ্যাডজাস্ট করতে হবে—বেশির ভাগ গাড়িতে 'দিন-রাত'-এর রিয়ার-ভিউ আয়না থাকে যা আলোর তীব্রতা কমানোর জন্য হেলানো যায়।
- গাড়ি চালানোর সময় গাড়ির ভিতরের লাইট জ্বালানো এড়িয়ে চলতে হবে—যদি মানচিত্র দেখতে হয় তাহলে নিরাপদে আগে গাড়িকে রাস্তার ধারে দাঁড় করাতে হবে।
- পাহাড়ের উপরে, রাস্তার বাঁকে এবং রাস্তার সংযোগস্থলে চোখে আলোর ঝলকানি দেখলে সতর্ক থাকতে হবে কারণ আলোর ঝলক অন্য গাড়ির হেডলাইট হতে পারে।
- সংঘর্ষ এড়ানোর জায়গা বেশি রাখতে হবে যাতে সম্ভাব্য ঝুঁকি সহজে দেখতে পাওয়া যায় এবং প্রতিক্রিয়া করার জন্য আরও সময় পাওয়া যায়।
- রাতে গাড়ি চালানোর জন্য প্রচুর মনঃসংযোগের প্রয়োজন হয় যা ক্লান্তিকর হতে পারে। ক্লান্তি এড়ানোর জন্য ঘন ঘন বিরাম নিতে হবে যাতে চোখ বিশ্রামের সময় পায়।

রাতে গাড়ি চালানোর অসুবিধা

- খারাপ দৃশ্যমানতা, রাতে দৃশ্যমানতা অর্ধেকের চেয়েও কম থাকে। হেডলাইট যত শক্তিশালীই হোক না কেন সেটা সূর্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না। রঙের অনুধাবনও কমে যায়, কারণ হেডলাইট সূর্যের মতো এত বিস্তৃত বর্ণালীর আলো নিঃসৃত করতে পারে না। দিনের মতো অনেক দূর থেকে পথে থাকা কোনো প্রতিবন্ধক দেখতে পাবে না।
- নিদ্রাচ্ছন্নতা দুর্ঘটনা ঘটার একটি প্রধান কারণ, যা এখন সবচেয়ে বেশি ঘটছে। মনে রাখতে হবে আমরা নিশাচর প্রাণী নই, আমাদের শরীর অন্ধকারে বিশ্রাম নেওয়ার মতো করেই তৈরি হয়েছে। যদি নিজে সতেজও থাকেন, কেউ কি সেই ড্রাইভারের সঙ্গে একই রাস্তায় গাড়ি চালাতে চাইবেন যে ১৮ ঘণ্টা না ঘুমিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে?
- যারা তাদের হাই বিম জ্বালিয়ে রেখে গাড়ি চালায় তারা এক লেনের হাইওয়েতে অন্যদের অন্ধ করে দিতে পারে (এটা যদিও এক্সপ্রেসওয়ের ক্ষেত্রে বড়ো সমস্যা নয়)।

- নেশাগ্রস্ত গাড়ি চালকের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশি। হাইওয়েতে মদ্যপদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশ না থাকায় এবং সাধারণভাবে সন্ধ্যার দিকে মদ্যপান করার প্রবণতা বেশি থাকায় রাতের রাস্তায় মদ্যপের সংখ্যা বেশি থাকে।
- চারিদিকে লোকজন না থাকলে এবং ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকলে, অপরাধের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়। ভারতীয় হাইওয়েগুলিতে রাতে অপরাধমূলক কাজকর্মের সংখ্যা বেশি থাকে।
- বহু গাড়ির হেডলাইট, টেইল-লাইট এবং ব্রেক ল্যাম্প সঠিকভাবে কাজ করে না। অন্ধকারে দৃশ্যমানতা কম থাকার সঙ্গে এটা মিলে অবস্থা সঙ্গিন করে তোলে। মনে করার চেষ্টা করতে হবে যে রাতে পার্ক করা ট্রাকে গিয়ে ধাক্কা মারার কতগুলি ঘটনা শুনেছ। এটা কখনও দিনের বেলা ঘটে না।
- অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সহায়তা। ভারতীয় রাস্তায় দুর্ঘটনার পরে আঘাতের চিকিৎসা একটু ধীরে প্রাপ্ত হয়। দুর্ঘটনা এবং হাসপাতালে পৌঁছোনোর মধ্যে যে সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারান তার সংখ্যা বেশি। রাতে কর্মীদলে সদস্য কম থাকায় চিকিৎসা সহায়তা পেতে দেরি হয়।
- গাড়ি সারানোর সহায়তা পেতে সমস্যা। গাড়িতে যদি যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে খোলা আছে এমন গ্যারেজের সংখ্যা কম হবে এবং সেগুলির মধ্যে দূরত্ব অনেক বেশি হবে।
- খাওয়ার জন্য ভালো জায়গার অভাব। খুব কম রেস্তোরাঁ আছে যারা পরিষ্কার, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার সারা রাত পরিবেশন করে। পছন্দ খুবই সীমিত।
- হারিয়ে গেলে পথ জানার জন্য রাস্তায় খুব বেশি মানুষজন পাবে না।

রাতে গাড়ি চালানোর সুবিধা

- সর্বোচ্চ গতি কম রেখেও গড় গতি সবসময় বেশি পাবে। এর প্রধান কারণ হলো রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা কম থাকা।
- হাইওয়েতে গোরুর গাড়ি, তিন চাকার গাড়ি, সাইকেল চালক এবং পশুদের থাকার সম্ভাবনা কম।
- শীতল হাওয়া ইঞ্জিনকে ভালো রাখে। শীতল হাওয়ার ঘনত্ব গরম হাওয়ার চেয়ে বেশি। তাই আরও ভালো দহন পান, যার ফলে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা আরও ভালো হয়। রাতে লক্ষণীয়ভাবে ইঞ্জিন আরও সতেজ থাকে।
- যানবাহন কম থাকায় এবং শীতল হাওয়ার কারণে জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- কোনও অন্ধ (ব্লাইন্ড) মোড় থেকে কোনো গাড়ি এলে হেডলাইটের কারণে সেটা বুঝতে পারবে (যদি সেই গাড়ির হেডলাইট জ্বলে)।

- এটা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়, কিন্তু মানুষের কাছে রাতে গাড়ি চালানো অত্যন্ত উপভোগ্য। ফাঁকা রাস্তা, শীতল আবহাওয়া, সতেজ ইঞ্জিন, গাড়ির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং মনের মতো সংগীতের সঙ্গে কিছুর তুলনা হয় না। কিন্তু নিরাপত্তাকে সবার আগে রাখতে হবে এবং রাতে গাড়ি চালানো যতটা সম্ভব কম করতে হবে।

রাতে সাইকেল চালক

- হালকা রঙের পোশাক বা ফ্লুরোসেন্ট পোশাক পরতে হবে যাতে সড়কের অন্যান্য ব্যবহারকারীরা দিনের আলোতে এবং কম আলোতে দেখতে পান।
- অন্ধকারে প্রতিফলক (রিফ্লেক্টিভ) পোশাক এবং/অথবা সরঞ্জাম (বেল্ট, হাতের বা পায়ের ব্যান্ড) পরতে হবে।
- রাতে সাইকেলে সামনে সাদা এবং পিছনে লাল লাইট থাকা প্রয়োজন। সেটাতে একটি লাল রিয়ার রিফ্লেক্টরও লাগাতে হবে (এবং অ্যাম্বার প্যাডের রিফ্লেক্টর)। সাদা সামনের রিফ্লেক্টর এবং স্পোক রিফ্লেক্টরও দৃশ্যমান থাকতে সাহায্য করবে। ফ্ল্যাশিং লাইট লাগানো যায়। কিন্তু যে-সমস্ত সাইকেল চালকরা রাস্তার আলো নেই এমন এলাকায় সাইকেল চালাচ্ছে, তাদের একটি অবিরত জ্বলছে এমন সামনের লাইট ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়।
- রাতে সামনের এবং পিছনের লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে এবং লাল রিয়ার রিফ্লেক্টর ব্যবহার করতে হবে।

৬.১.৮ রক্ষীবিহীন রেলওয়ে ক্রসিং-এ যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন

সারা বিশ্বে রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিং বিপদের একটি কারণ। বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়েতে মোট ৩২৬৯৪ সংখ্যক লেভেল ক্রসিং আছে, যার মধ্যে ১৪৮৫৩ রক্ষীবিহীন। যেখানে প্রধানত সড়ক ব্যবহারকারীদের অপর্যাপ্ত সাবধানতা অবলম্বন করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে; যারা বাধ্যতামূলক সাইনবোর্ড, সিগন্যাল এবং প্রাথমিক ট্রাফিক নিরাপত্তা নিয়ম পালন করতে ব্যর্থ হন। রক্ষীযুক্ত লেভেল ক্রসিং-এর মাত্র ৫৪% ইন্টারলকড অর্থাৎ নিরাপত্তার একটি অতিরিক্ত স্তর হিসাবে গেট সিগন্যাল সুরক্ষিত।

ভারত সরকার দ্বারা গঠিত উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা কমিটি অনুসারে ভারতীয় রেলওয়েতে ২০১১-১২ সালে ১৫,০০০ মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলে হওয়া দুর্ঘটনার ৪০% এবং মৃত্যুর ৬০% লেভেল ক্রসিং-এর কারণে ঘটে। রেলওয়ের উচ্চ পর্যায়ের কমিটি রিপোর্ট অনুযায়ী রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিং-এর কারণে ৫৯% মৃত্যু ঘটে।

সড়ক ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং অসুবিধা কমানোর জন্য ব্যস্ত লেভেল ক্রসিং রোড ওভারব্রিজ (আর.ও.বি.)/রোড আন্ডারব্রিজ (আর.ইউ.বি.) এবং সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে (এল.এইচ.এস.) দিয়ে ধীরে ধীরে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

এই অননুমোদিত চলাচলের কারণে দিনে কমপক্ষে একটি মৃত্যু ঘটে। আর এটা ঘটে সচেতনতা বৃদ্ধির সমস্ত চিরাচরিত প্রথা ব্যবহার করা সত্ত্বেও (বিপদ সংকেত, শিক্ষামূলক কার্যক্রম এবং সচেতনতা অভিযান) কিন্তু কিছুই কাজ করেনি। এটা সেই সমস্ত মানুষদের অবহেলা প্রদর্শন যারা গাড়ি চালিয়ে, সাইকেল চালিয়ে বা হেঁটে পারপার করেন।

এখানেই পারাপার করার সময়, বিশেষত গাড়ি চালিয়ে পার করার সময় সাবধান হওয়ার গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়। রক্ষীযুক্ত লেভেল ক্রসিং-এ যখন লাল আলো দেখা যাবে (লাল পথচারীর চিহ্নসহ) তখন আপনার স্টপ লাইন পার করা বা পেরিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সেই সঙ্গে কোনো অ্যালার্মের শব্দ শোনা গেলে বা গেট নামানো হলে পার করবেন না। যদি অন্য আরেকটি ট্রেন আসে তাহলে অ্যালার্মের শব্দ পরিবর্তন হতে পারে। যদি কোনো লাইট, অ্যালার্ম বা গেট না থাকে তাহলে উভয় দিকে দেখে এবং কোনো শব্দ হচ্ছে কিনা শুনে পার হতে হবে।

৬.১.৯ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ

প্রয়োজনে সকলকেই সড়ক পথে যাতায়াত করতেই হয়। তাই পথচারীদের সড়ক দুর্ঘটনা কখনই কাম্য নয়। সবচেয়ে বড়ো দুঃখের কথা আমরা ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করি না। পথচারীদের সুরক্ষাবিধি জানা সত্ত্বেও তার প্রতি উদাসীনতার জন্যই দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

ভারতে সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ঃ

বছর	মোট সড়ক দুর্ঘটনা	মোট নিহত ব্যক্তি	মোট আহত ব্যক্তি
২০০৫	৪৩৯২৫৫	৯৪৯৬৮	৪৬৫২৮২
২০০৬	৪৬০৯২০	১০৫৭৪৯	৪৯৬৪৮১
২০০৭	৪৭৯২১৬	১১৪৪৪৪	৫১৩৩৪০
২০০৮	৪৮৪৭০৪	১১৮৯৬০	৫২৩১৯৩
২০০৯	৪৮৬৩৮৪	১২৫৬৬০	৫১৫৪৫৮
২০১০	৪০০৬২৮	১৩৫৫১৩	৫২৭৫১২
২০১১	৪৯৭৬৮৬	১৪২৪৮৫	৫১১৩৯৪
২০১২	৪৯০৩৮৩	১৩৮২৫৮	৫০৯৬৬৭
২০১৩	৪৪৩০০১	১৩৭৪২৩	৪৬৯৮৮২
২০১৪	৪৫০৮৯৮	১৪১৫২৬	৪৭৭৭৩১

এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় ভারতে প্রতি মিনিটে একটি করে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে, আর প্রতি চার মিনিটে একটি করে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে। এখানে কিছু ভুল আচরণের জন্যও দুর্ঘটনা ঘটার কারণ বিশ্লেষণ করা হলো।

১। অতিরিক্ত গতি ২। মদ্যপান করে গাড়ি চালানো ৩। চালকের অমনোযোগ ৪। রেড লাইট এর নির্দেশ ৫। সিট বেল্ট বা হেলমেট ব্যবহার না করা

অতিরিক্ত গতি ঃ ইঁদুর দৌড়ের যুগে সবাই সবাইকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। অন্যকে পিছনে ফেলে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়। আর এই উচ্চগতির দুর্ঘটনায় আহতের জখম হওয়ার মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়, এমনকি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। উচ্চগতির জন্য গাড়ি পিছলে যাওয়ার বা নিয়ন্ত্রণের ভুলে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়।

মদ্যপান করে গাড়ি চালানো ঃ মদ্যপান মানুষের মনঃসংযোগ নষ্ট করে দেয়। হাত-পা কাজ করতে বেশি সময় নেয়। ঘুম ঘুম ভাবের জন্য দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। সর্বোপরি শরীরকে উত্তেজিত করে তোলে। আর এসব কারণেই দুর্ঘটনা ঘটে তা মারাত্বক আকার নেয়।

চালকের অমনোযোগ ঃ চালকের অমনোযোগ বড়ো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। ইদানিং এই অমনোযোগের অন্যতম কারণ হলো গাড়ি চালানোর সময় মোবাইলে কথা বলা। এর ফলে মস্তিস্কের বেশি অংশ ফোনে কাজ করে, আর অল্প অংশ কাজ করে গাড়ির নিয়ন্ত্রণে। এই বিভাজনের জন্যই বিচার ক্ষমতা ব্যাহত করে সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রেড লাইট এর নির্দেশ না মানা ঃ সময় পার করে দেওয়ার সময় আমাদের নেই। তাই সময় বাঁচাবার জন্য রেড লাইটের পরোয়া না করে সত্বর এগিয়ে যায়। অনেকের ধারণা রেড লাইটে দাঁড়ানো মানেই সময় এবং জ্বালানি অপচয়। ধারণাটাই ভুল । উলটে সড়ক ব্যবহারকারীর জীবন বিপন্ন হতে পারে, অন্য চালকদের অনুপ্রাণিত করে ক্রসিং-এ একটা যানজটের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

সিট বেল্ট ও হেলমেট ব্যবহার না করা ঃ চারচাকার চালকের জন্য সিট বেল্ট এবং দু-চাকার চালকের জন্য হেলমেট বাধ্যতামূলক। নতুবা জরিমানা অবধারিত। সমীক্ষায় দেখা যায় সিট বেল্ট ও হেলমেট ব্যবহারকারীর কোনো কারণে দুর্ঘটনার সময় আঘাত খুবই কম লাগে। তাই এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে দু-চাকায় অতিরিক্ত যাত্রী থাকলে সকলেরই হেলমেট ব্যবহার করা উচিত।

পরিবেশের উপর ট্রাফিকের কু-প্রভাব ঃ

(১) সুরক্ষা (২) শব্দ (৩) জ্যাম এবং ভিড় (৪) বায়ুদূষণ (৫) সৌন্দর্যের অবনতি।

দুর্ঘটনার বিভিন্ন কারণ ঃ

চালক	ঃ	অতিরিক্তগতি, আইন অমান্য, চিহ্ন বুঝতে অক্ষম, ক্লান্তি, মদ্যপান
পথচারী	ঃ	অসাবধানী, অশিক্ষা, ভুল ভাবে রাস্তা পারাপার
যাত্রী	ঃ	নিজের শরীরকে জানালা বা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া, ভুল দিক দিয়ে গাড়িতে ওঠানামা, চলন্ত যানে লাফিয়ে ওঠা, হেলমেট না পরা বা সিট বেল্ট না বাঁধা

বাহন ঃ ব্রেক বা স্টিয়ারিং ফেল করা, টায়ার ফেটে যাওয়া, অতিরিক্ত ভারবহন করা

রাস্তা ঃ গর্ত, ভাঙা রাস্তা, অবৈধ স্পিড ব্রেকার, সঠিক চিহ্ন না থাকা, কম আলো

আবহাওয়া ঃ কুয়াশা, বরফ, বর্ষণ, হাওয়া, ঝড়

দুর্ঘটনার সতর্কতা ঃ

(১) সড়ক সুরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা ও জনজাগরণ

(২) আইনকে মান্যতা দিতে বাধ্য করা

(৩) বাহনের নকশা বা রাস্তার পরিকাঠামো সুরক্ষিতভাবে নির্মাণ করা

দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল ঃ (১) মৃত্যু (২) আঘাত (৩) সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি

১। দু-এক লাইনে উত্তর দাও ঃ

(i) কোন মাসে এবং কী বারে পথসপ্তাহ পালন করা হয়? (ii) স্টপ লাইন কী? (iii) জেব্রা ক্রসিং কাকে বলে? (iv) ফুট ব্রিজ কী? (v) আন্ডারপাস কী? (vi) টার্নিং দাগ কী? (vii) কার্ব ড্রিল কাকে বলে?

২। শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

(i) লাল আলোক সংকেত দেখলে গাড়িকে ________________ রেখার পিছনে অপেক্ষা করতে হয়। (ii) ____________ আলোক সংকেত দেখলে গাড়ি এগিয়ে যাবে। (iii) পথচারীদের রাস্তা পারাপারের জন্য ____________ থাকে। (iv) গাড়ি দাঁড় করাবার জন্য লাল সংকেতের পূর্বে ________________ আলোক সংকেত ব্যবহার করা হয়। (v) গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ____________ সংকেতের পূর্বে অ্যাম্বার আলোকসংকেত ব্যবহার করা হয়।

৩। বাঁদিকের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান দিকের বাক্যাংশ মিলিয়ে লেখো ঃ

(i) টার্নিং দাগ	(ক) মধ্যরেখা
(ii) রাস্তার মাঝের দাগ	(খ) রাস্তা পার হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান
(iii) জেব্রা ক্রসিং	(গ) ‘STOP’ রেখা
(iv) লাল আলো	(ঘ) সবুজ আলো
(v) গাড়ি এগিয়ে যাওয়ার সংকেত	(ঙ) রাস্তার বাঁক

প্রকল্প ঃ ১ পথনিরাপত্তা বিষয়ক একটি সচেতনতা প্রকল্প গ্রহণ করা।

২ সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও বিষয়ক সচেতনতা—(শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক থেকে অভিভাবক ও গাড়ির চালকদের সচেতনতা)

সপ্তম অধ্যায়

৭.১.১ ব্রতচারী

তরুণ দল

বাংলা মা-র দুর্নিবার আমরা তরুণ দল;
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সংকটে অটল,
গঙ্গা রাঢ় পাল রাজার
বীর্য গরিমা—
চণ্ডীদাস জয়দেবের
ছন্দ-ভঙ্গিমা—
হোসেন শার - ঈশা খাঁর শক্তি মহিমা
ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে অবিরল
নিঃস্বতার দৈন্য ভাব
করব উৎসাদন
অজ্ঞতার অন্ধকার
করব নির্বাসন ;—
নবযুগের উন্মেষের জ্বালব দীপ উজল।
সংযমের পৌরুষের
পালব প্রেরণা;
শ্রম-যোগের উদ্‌যোগের
সাধব সাধনা;
বাংলা মা-র লাঞ্ছনার মুছব অশ্রুজল
বাংলা মা-র দুর্নিবার অথবা তরুণ দল।

---

* এই গানে ‘বাংলা’ কথাটির জায়গায় ‘ভারত’ কথাটি ব্যবহার করা যায়।

বাংলা মা-র দুর্নিবার আমরা তরুণ দল;

কেন্দ্রের দিকে সকলে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে প্রথমে এই লাইনটি একবার গাইতে হবে। ২য় বার গান-এর লাইনটা করবার সময় ডান দিকে ঘুরে চলতে হবে ১নং পায়ের তালে, বাঁ হাত কপাল থেকে মুঠো অবস্থায় সামনে নিয়ে যেতে হবে, বাঁ পায়ের সঙ্গে বাঁ হাত এবং ডান পায়ের সঙ্গে ডান হাত মিলিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সংকটে অটল,

এক নং পায়ের তালে চলতে হবে এবং হাতের ভঙ্গি পালটাতে হবে।

শ্রান্তিহীন- বাঁ হাত বুকের কাছে এনে পাঞ্জা সোজা করে (আঙুল সব জোড়া) বাঁ-পাশে নিতে হবে।

ক্লান্তিহীন - একইভাবে ডান হাত ডান দিকে করতে হবে।

সংকটে - বাঁ হাত বাঁদিকে ভঙ্গি করতে হবে।

অটল - ডান হাত কপাল থেকে সামনে ছোড়া, এইভাবে লাইনটা দু-বার করতে হবে।

বাংলা মা-র .... তরুণ দল - প্রথম ভঙ্গি করতে হবে।

গঙ্গা রাঢ় পাল রাজার

বীর্য গরিমা— প্রথম ভঙ্গি করতে হবে।

চণ্ডীদাস - জয়দেবের

ছন্দ-ভঙ্গিমা—

৪ নং পায়ের তালে হবে। হাত নটরাজ ভঙ্গি হবে অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে ঘুরে বাঁ পা ডান পায়ের সামনে হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করে, ডান হাত উপরে, পাঞ্জা ভিতরদিকে, বাঁ হাত বুকের কাছে এনে কিছু কাটার ভঙ্গি করে নীচুতে নিতে হবে। আবার উলটো করে ডান পা বাঁ পায়ের সামনে, বাঁ হাত উপরে, ডান হাত বুকের কাছ থেকে কিছু কাটার ভঙ্গি করে নীচুতে নিতে হবে।

হোসেন শার - ঈশা খাঁর শক্তি মহিমা

লাইনে ডান দিকে ঘুরে ১ নং পায়ের তালে চলা এবং বাঁ হাত কপাল থেকে সামনে ছোড়া, ডান হাত কপাল থেকে ছোঁড়া অর্থাৎ প্রথম ভঙ্গি করতে হবে।

ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে অবিরল

এক লাফ দিয়ে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে ঘুরে দু-হাত বুকের কাছ থেকে ঢেউ খেলানোর মতো উপর থেকে নীচের দিকে ঠেলে ঠেলে আনতে হবে।

ঢেউ তাদের - দু-হাত বুকের কাছ থেকে ঢেউ দেখানো, **দেয় মোদের -** দু-হাত বুকে এনে নিজেকে দেখানো। **চিত্তে অবিরল-** বুকের কাছে মুঠো করে সামনে দু-হাত ছুড়ে খুলতে হবে। ২ বার হবে।

বাংলা মা-র দুর্নিবার আমরা তরুণ দল;

প্রথম ভঙ্গি করতে হবে।

নিঃস্বতার দৈন্য ভাব

করব উৎসাদন

বৃত্তাকারে লাইনে চলতে চলতে (১ নং পায়ের তালে) বাঁ হাত অর্ধমুষ্টি অবস্থায় বুকের কাছে এনে বাঁদিকে সোজাভাবে নেওয়া, অনুরূপভাবে ডান হাত অর্ধমুষ্টি অবস্থায় ডান দিকে মেলতে হবে।

অজ্ঞতার অন্ধকার

করব নির্বাসন ;—

নীচু হয়ে ১ নং পায়ের তালে চলতে চলতে বাঁ হাত দিয়ে নীচের দিকে কেটে ঢেউ ঠেলে বাঁদিকে নিতে হবে।

অনুরূপভাবে ডান দিকে ঢেউ কেটে ডান দিকে ঠেলে দেওয়ার ভঙ্গি করতে হবে।

নবযুগের উন্মেষের জ্বালব দীপ উজল।

লাইনে চলা অবস্থায় দু-হাত বুকের কাছে এনে রাবার টানার মতো করে প্রথমে বাঁ পা সামনে, বাঁ হাত উপরদিকে (এটা বাইরের দিকে মুখ থাকবে) ও ডান হাত নীচের দিকে টানা। অনুরূপভাবে ডান পা সামনে এগিয়ে ডান হাত উপরে, বাঁ হাত নীচুতে টানতে হবে (ভিতরদিকে মুখ থাকবে)।

সংযমের পৌরুষের

পালব প্রেরণা;

লাইনে চলতে চলতে দু-হাত বুকের সমান অর্ধমুষ্টি অবস্থায় সামনে মেলা, আর দু-হাত একসঙ্গে বুকের কাছে আনতে হবে। এভাবে দু-বার করতে হবে।

শ্রম-যোগের উদ্‌যোগের

সাধব সাধনা;

চলতে চলতে দু-হাত অর্ধমুষ্টি অবস্থায় মাথার উপর তুলে প্রথমে বাঁ পা সামনে, দু-হাত বাইরের দিকে ছোড়া, অনুরূপভাবে ডান পা সামনে দু-হাত ভিতরদিকে ছোড়ার ভঙ্গি করতে হবে। ২ বার হবে।

বাংলা মা-র লাঞ্ছনার মুছব অশ্রুজল

লাইনে চলতে চলতে

বাংলা মা-র— বাঁ পা সামনে, বাঁ হাত বুকের কাছ থেকে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বাঁদিকে নেওয়া।

লাঞ্ছনার— ডান হাত অনুরূপভাবে ডান দিকে মেলতে হবে।

মুছব— বাঁ হাত বাঁদিকে মেলতে হবে।

অশ্রুজল— নীচু হয়ে ডান হাত দিয়ে চোখের জল মোছার ভঙ্গি করতে হবে।

বাংলা মা-র দুর্নিবার আমরা তরুণ দল

প্রথম ভঙ্গি করতে হবে।

বি.দ্র. - ছেলেদের জন্য বাঁ হাত মুঠো অবস্থায় সামনে ধনুক ধরার মতো ডান হাত তির টেনে আনার মতো করে কাঁধ সামনে করে নাচাতে নাচাতে ১ নং পায়ের তালে চলা হবে।

ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বা ছোটোদের জন্য বাঁ হাত কপাল থেকে সামনে ছোড়া, পুনরায় ডান হাত কপাল থেকে সামনে ছোড়ার ভঙ্গি করতে হবে।

৭.১.২ কুচকাওয়াজ

আদেশ — 'পিছে মুড়'

সাবধান অবস্থা থেকে ডান পায়ের গোড়ালি ও বাঁপায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে ডান দিক থেকে ১৮০ ডিগ্রি পিছনে ফিরতে হবে। বাঁ পা মাটি থেকে ৬ ইঞ্চি সামনের দিকে উপরে তুলে ডান পায়ের পাশে রাখতে হবে।

আদেশ — 'খুলি লাইন চল'

দলনেতা 'খুলি লাইন চল' আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের লাইনের ছাত্রছাত্রীরা বাঁ পায়ের গোড়ালিকে সামনে ৩০ ইঞ্চি দূরে মাটিতে রাখবে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলবে 'এক ঠেরো'। পরে ডান পা সামনের দিকে ৬ ইঞ্চি উপরে তুলে বাঁ পায়ের পাশে রাখবে এবং বলবে 'এক'। তারপর বাঁ পা মাটি থেকে ৬ ইঞ্চি উপরে তুলে ডান পায়ের পাশে রাখবে এবং বলবে 'দো'।

মাঝের লাইন 'খুলি লাইন চল' আদেশে কোনোধরনের অঙ্গসঞ্চালন করবে না।

পিছনের লাইনের ছাত্রছাত্রীরা বাঁপায়ের গোড়ালিকে ৩০ ইঞ্চি পিছনে রাখবে, সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলবে 'এক ঠেরো'। পরে ডান পা ৬ ইঞ্চি উপরে তুলে বাঁ পায়ের পাশে রাখবে এবং বলবে 'এক'। তারপর বাঁ পা ৬ ইঞ্চি উপরে তুলে ডান পায়ের পাশে রাখবে এবং বলবে 'দো'।

আদেশ — 'নিকট লাইন চল'

এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সামনের লাইনের ছাত্রছাত্রীরা 'খুলি লাইন চল'-এ পিছনের লাইনের ছাত্রছাত্রীদের মতো কার্যকলাপ করবে। অর্থাৎ বাঁ পা ৩০ ইঞ্চি পিছনে রেখে পর্যায়ক্রমে ডান পা ও বাঁ পায়ের সঞ্চালন ঘটাবে। মাঝের লাইন একই জায়গায় স্থির থাকবে। পিছনের লাইন 'খুলি লাইন চল'-এ সামনের লাইনের মতো কার্যকলাপ করবে।

আদেশ 'তেজ চল'

সাবধান অবস্থায় দলনেতা 'তেজ চল' আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা বাঁ পা হাঁটু না ভেঙে সামনের দিকে যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলে ৩০ ইঞ্চি দূরে গোড়ালিকে মাটিতে রাখবে। ডান হাতের কনুই সোজা রেখে কাঁধের সমান উচ্চতায় সামনে তুলতে হবে এবং বাঁ হাতের কনুই সোজা রেখে পিছনে যতটা সম্ভব তুলতে হবে। চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে। সমন্বয়সাধনের জন্য সবাই মুখে বলবে 'এক' বা 'বাঁ' (Left)।

এরপর ডান পা বাঁ পায়ের মতো হাঁটু না ভেঙে ৩০ ইঞ্চি দূরে গোড়ালিকে মাটিতে রাখতে হবে। বাঁ হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় কনুই সোজা রেখে কাঁধের সমান উচ্চতায় সামনের দিকে তুলতে হবে। ডান হাতকেও মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় কনুই সোজা রেখে যতটা পিছনে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে যেতে হবে। সমন্বয়সাধনের জন্য সবাই মুখে বলবে 'দো' বা 'ডাঁন' (Right)।

তেজ চলের সময় সাধারণত ছাত্ররা এক মিনিটে ১১৬ কদম (পদক্ষেপ) যাবে। ছাত্রীরা এক মিনিটে ১১০ কদম যাবে।

আদেশ — 'সামনে সিলুট করনা সামনে সিলুট'

দলনেতা আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের আঙুল জোড়া অবস্থায় ডান পাশ দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার পথে কাঁধের সমান উচ্চতায় তুলতে হবে। হাতের তালু সামনের দিকে থাকবে। পরে কনুইয়ের কাছ থেকে ভাঁজ করে ডান হাতের তর্জনীকে কপালের ভুরুর ঠিক উপরে মাঝামাঝি জায়গায় রাখতে হবে। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত মাটির সমান্তরালে থাকবে।

দলনেতা সিলুট 'ডাউন' বলার সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের কনুইকে শরীরের সামনে এনে হাতটিকে অতি দ্রুত শরীরের সামনের দিক দিয়ে শরীরের পাশে আনতে হবে।

৭.১.৩ ক্যালিসথেনিক্স

খালি হাতে ব্যায়াম

প্রথম ব্যায়াম ঃ

(আরম্ভের অবস্থান ঃ সাবধান অবস্থানে দাঁড়াতে হবে)

(১) ডান পা ডান দিকে কিছুটা দূরে রেখে হাত দুটো সোজা কাঁধের উপর তুলতে হবে।

(২) ওই অবস্থায় শরীরকে ডান দিকে মোচড় দিয়ে কোমর থেকে ঝুঁকে হাত সোজা রেখে পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করতে হবে। অবশ্যই পা-দুটো সোজা রাখতে হবে।

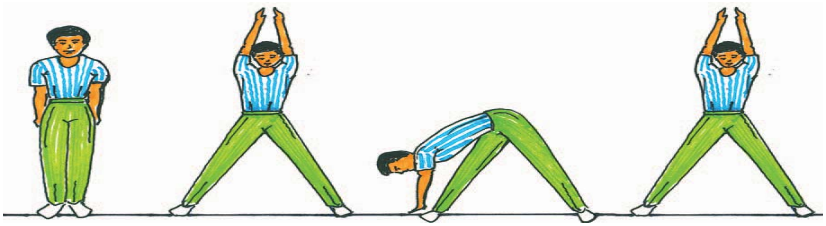

আরম্ভের অবস্থান, ৪ ১ ২ ৩

(৩) এরপর হাত সোজা রেখে কোমর থেকে শরীরটা উপরদিকে তুলে বাঁদিকে মোচড় দিয়ে ১নং অবস্থানে আসতে হবে।

(৪) এবার আরম্ভের সাবধান অবস্থানে আসতে হবে।

(৫—৮) বিপরীতভাবে বাঁ পায়ে করতে হবে।

দ্বিতীয় ব্যায়াম ঃ

(আরম্ভের অবস্থান ঃ সাবধান অবস্থানে দাঁড়াতে হবে)

(১) ডান পা সামনে বাড়িয়ে মাটিতে হাঁটু ভাঁজ করে রেখে দু-হাত সোজা করে সামনের দিকে কাঁধবরাবর তুলতে হবে।

(২) ওই অবস্থান থেকে দু-হাত কানের পাশ দিয়ে উপরদিকে তুলে শরীরকে কোমর থেকে পিছনদিকে ঝোঁকাতে হবে। পিছনের পা অবশ্যই সোজা রাখতে হবে।

(৩) এরপর একইভাবে ১নং অবস্থানে আসতে হবে।

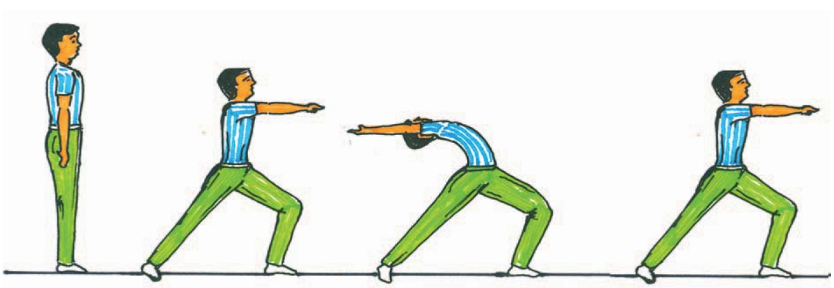

আরম্ভের অবস্থান, ৪ ১ ২ ৩

(৪) এবার সাবধান অবস্থানে আসতে হবে।

(৫—৮) বিপরীতভাবে বাঁ পায়ে অভ্যাস করতে হবে।

তৃতীয় ব্যায়াম ঃ

(আরম্ভের অবস্থান ঃ সাবধান অবস্থানে দাঁড়াতে হবে)

(১) দু-হাত দু-পাশে সোজা করে কাঁধবরাবর তুলে বাঁ পা হাঁটু ভাঁজ করে বাঁ পাশে রাখতে হবে।

(২) ওই অবস্থান থেকে কানের পাশ দিয়ে হাত উপরে তুলে বাঁ পা পাশের দিকে সোজা করে ছড়িয়ে দিতে হবে।

(৩) পা আবার ভাঁজ করে এবং হাত দু-পাশে নামিয়ে ১নং অবস্থানে আসতে হবে।

আরম্ভের অবস্থান, ৪ ১ ২ ৩

(৪) হাত নামিয়ে সাবধান অবস্থানে আসতে হবে।

(৫—৮) বিপরীতভাবে বাঁ পায়ে অভ্যাস করতে হবে।

চতুর্থ ব্যায়াম ঃ

(আরম্ভের অবস্থান ঃ সাবধান অবস্থানে দাঁড়াতে হবে)

(১) বাঁ পা বাঁদিকে অল্প ফাঁক করে দু-হাত দু-পাশ দিয়ে কনুই থেকে ভাঁজ করে মাথার পিছনে রেখে পায়ের পাতার উপর বসতে হবে।

(২) ওই অবস্থান থেকে দু-হাত দু-পাশে কাঁধবরাবর সোজা করে ছড়িয়ে দিতে হবে।

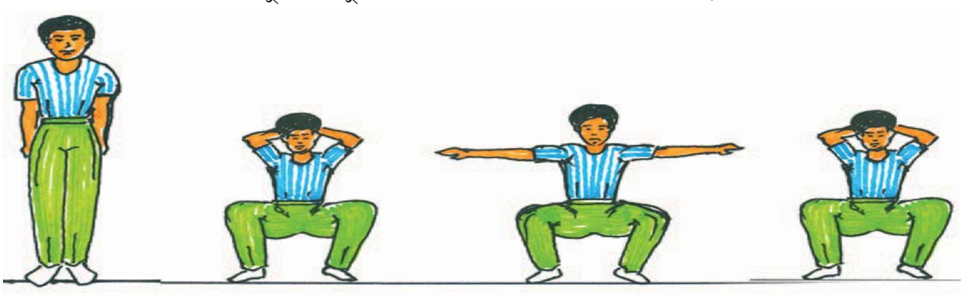

আরম্ভের অবস্থান, ৪ ১ ২ ৩

(৩) আবার হাতকে কনুই থেকে ভাঁজ করে মাথার পিছনে আনতে হবে।

(৪) পায়ের ভরে সোজা হয়ে হাত নামিয়ে সাবধান অবস্থানে আসতে হবে।

(৫—৮) বিপরীতভাবে ডান পা ফাঁক করে অভ্যাস করতে হবে।

অষ্টম অধ্যায়

একক ক্রীড়া

৮.১.১ যোগাসন

শশঙ্গাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক থাকবে, আমরা যেমন শ্বাস নেওয়া-ছাড়া করে থাকি তেমনই থাকবে। শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হবে না।

পদ্ধতি ঃ

১. বজ্রাসনের ভঙ্গিতে বসতে হয়।

২. এরপর দু-হাতের বুড়ো আঙুল বাইরের দিকে রেখে দু-হাত দিয়ে গোড়ালি ধরতে হয়।

৩. এরপর সামনের দিকে ঝুঁকে মাথার তালু হাঁটুর সামনে মাটিতে রাখতে হয়।

৪. ডিগবাজি খাওয়ার ভঙ্গিতে নিতম্ব উপরদিকে করতে হয়।

সময়কাল ঃ মনে মনে দশ গুনতে হয়, তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে ক্রমশ দশ থেকে বাড়িয়ে তিরিশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

উপকারিতা ঃ স্মরণশক্তি বাড়ায়। সর্দিকাশি, টনসিল, সাইনুসাইটিস, মস্তিষ্কের অবসাদ, থাইরয়েডের গণ্ডগোল, হাঁপানি দূর করে। মাথা ধরা, কানের প্রদাহ, অনিদ্রা দূর করতে সাহায্য করে। এই আসন উচ্চতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই আসনে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করে।

সতর্কতা ঃ চোখের উগ্র রোগ, ঘাড়ের ব্যথা, অস্থির ক্ষয়জনিত রোগ, কোমরে উগ্র ব্যথা, হাঁটু ও ঘাড়ের উগ্র ব্যথায় এবং উচ্চ রক্তচাপ থাকলে এই আসন না করাই ভালো।

উষ্ট্রাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক। আমরা স্বাভাবিকভাবে যে রকম শ্বাসপ্রশ্বাস নিই এবং ছাড়ি তেমনভাবেই শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হবে ও ছাড়তে হবে। শ্বাসক্রিয়া কখনোই বন্ধ করা চলবে না।

পদ্ধতি ঃ

১. প্রথমে হাঁটু ভেঙে নিলডাউনের ভঙ্গিতে বসতে হয়।

২. এবার পিছনদিকে হেলে ডান হাত দিয়ে ডান গোড়ালি এবং বাঁ গোড়ালি ধরে রাখতে হয়।

৩. হাতের বুড়ো আঙুল ভিতরদিকে থাকবে।

৪. আস্তে আস্তে মাথা পিছনদিকে হেলাতে হয়।

৫. পায়ের পাতা মাটিতে পাতা থাকবে।

সময়কাল ঃ মনে মনে দশ গোনা পর্যন্ত অভ্যাস করতে হয়। পরে অভ্যাস হয়ে গেলে ক্রমশ তিরিশ পর্যন্ত গোনা যেতে পারে।

উপকারিতা ঃ কোমরের ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস দূর করে। বুকের খাঁচা প্রসারিত করে। মেরুদণ্ডকে নমনীয় রাখে।

সতর্কতা ঃ যাদের হাঁটুতে উগ্র ব্যথা আছে, যাদের শরীরের ভারসাম্যের সমস্যা আছে, যারা পোলিয়ো আক্রান্ত, চোখের উগ্র সমস্যা আছে, হাড়ের অপুষ্টিজনিত রোগ আছে তাদের যোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া এই আসন করা উচিত নয়।

বামনাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক।

পদ্ধতি ঃ

১. প্রথমে সুখাসনে (বাবু হয়ে) বসতে হয়।

২. এবার ডান পা হাঁটু থেকে মুড়ে পদ্মাসনের ভঙ্গিমায় ডান পায়ের পাতা বাঁ ঊরুর উপর রাখতে হয়।

৩. এরপর দু-হাতের উপর ভর দিয়ে ডান হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়।

৪. বাঁ-পা হাঁটু থেকে মোড়া থাকবে এবং বাঁ-গোড়ালি ডান হাঁটুর সঙ্গে লেগে থাকবে। বাঁ-পায়ের পাতা মাটিতে পাতা থাকবে। লক্ষ রাখতে হবে ডান হাঁটু এবং পায়ের পাতা যেন এক সরলরেখায় থাকে।

৫. দু-হাত কনুই থেকে ভেঙে নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের কাছে রাখতে হয়।

৬. পা-বদল করে অনুরূপভাবে অভ্যাস করতে হয়।

সময়কাল ঃ মনে মনে দশ গোনা পর্যন্ত ব্যালান্স করতে হয়। অভ্যাস হয়ে গেলে ক্রমশ সময় বাড়ানো যেতে পারে।

উপকারিতা ঃ পায়ের মাংসপেশির পক্ষে উপকারী। দেহের ব্যালান্স বা ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। মনের অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দূর করে, মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধি করে, মনে স্থিরতা আনে।

সতর্কতা ঃ যাদের হাঁটুতে ব্যথা, হাড়ের ব্যাথা আছে তাদের এই আসনের জন্য যোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

পদ্মাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক থাকবে।

পদ্ধতি ঃ

১. প্রথমে সামনের দিকে দু-পা ছড়িয়ে বসতে হয়।

২. এরপর ডান পা হাঁটু থেকে মুড়ে বাঁ-উরুর উপর রাখতে হয়।

৩. এরপর অনুরূপভাবে বাঁ-পা হাঁটু থেকে মুড়ে ডান উরুর উপর রাখতে হয়।

৪. মেরুদণ্ড সোজা থাকবে।

৫. দু-হাত সোজা করে হাঁটুর উপর রাখতে হয়।

সময়কাল ঃ মনে মনে দশ গুনতে হয়, অভ্যাস হয়ে গেলে তিরিশ গোনা পর্যন্ত অভ্যাস করা যেতে পারে।

উপকারিতা ঃ পায়ের পেশির দুর্বলতা ও ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা, অল্প হাঁটাচলায় হাঁফ ধরা, মেরুদণ্ডের আড়ষ্টভাব, অনিদ্রায় ও স্মৃতিশক্তি হ্রাসে এই পদ্মাসন খুবই উপকারী। মনঃসংযোগ বাড়াতে সাহায্য করে এই আসনটি।

তৌলঙ্গাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।

পদ্ধতি ঃ

১. প্রথমে পদ্মাসনে বসতে হয়।

২. এবার এই অবস্থান থেকেই দুই কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে অর্ধেক শুতে হয়।

৩. নিতম্বকে দু-হাতের তালুর উপর রাখতে হয়।

৪. দেহকে কিছুটা ইংরেজি 'ইউ' আকৃতির মতো করতে হবে।

৫. মাথা ও দু-হাঁটু একই সমান্তরালে রাখতে হয়।

সময়কাল ঃ শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনে শেষ করতে হবে।

উপকারিতা ঃ পেটে মেদ বা চর্বি জমতে দেয় না। পেট, পিঠ ও হাতের পেশি মজবুত করে। যারা স্নায়ুব্যথায় ভোগে তাদের উপশম দেয়।

সতর্কতা ঃ হাঁটুব্যথা, ঘাড়ে ব্যথায় যোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই করা বিধেয়।

শীতলী প্রাণায়াম

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক থাকবে।

পদ্ধতি ঃ

১. পদ্মাসন, অর্ধপদ্মাসন না করতে পারলে বাবু হয়ে সুখাসনে বসতে হয়।

২. মেরুদণ্ড সোজা রেখে দু-হাতের তালু দু-হাত সোজা রেখে দু-হাঁটুর উপর রাখতে হয়।

৩. এবার জিভকে নলের মতো সরু করে ধীরে ধীরে শ্বাস টানতে হয়, তার ফলে গলায় শীতল ভাব অনুভূত হবে। বাতাস টানলে একটা মৃদুমন্দ শব্দ শোনা যাবে।

সময়কাল ঃ অভ্যাসের প্রথমে চার সেকেন্ড শ্বাস টানতে হবে, পরে আরও বাড়ানো যেতে পারে।

উপকারিতা ঃ হাই ব্লাডপ্রেশার, নার্ভাস টেনশন, স্নায়বিক দুর্বলতা, অবসাদ, ক্লান্তি, একটুতে রেগে যাওয়া, চঞ্চলতা, খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি নিবারণে এই প্রাণায়াম বিশেষভাবে উপকারী। উৎকণ্টা প্রশমিত করে। মনের স্থিরতা নিয়ে আসে।

সতর্কতা ঃ যাদের হাঁপানি আছে, সর্দিকাশির ও ঠান্ডা লাগার ধাত আছে, তাদের এই আসন করার ক্ষেত্রে যোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

জানুশিরাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে হবে, অর্থাৎ আমরা প্রতিনিয়ত যেভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিই বা ছাড়ি।

অভ্যাসের পদ্ধতি ঃ

প্রারম্ভিক অবস্থা—প্রথমে সামনে পা ছড়িয়ে মাটিতে বসতে হবে। পায়ের পাতা জোড়া থাকবে। হাত শরীরের পাশে থাকবে।

১. এরপর ডান পায়ের হাঁটু ভাজ করে ডান গোড়ালি বাঁ দিকের কুঁচকিতে লাগাতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে ডান পায়ের পাতা বাঁ পায়ের উরুর পাশে যেন লেগে না থাকে।

২. এরপর দু-হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল/গোড়ালি ধরে আস্তে আস্তে মাথা হাঁটুতে ঠেকাতে হবে।

৩. বাঁ পা সোজা থাকবে।

৪. দু-হাতের কনুই মাটিতে ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

৫. এই অবস্থায় আসনটি ধরে রাখার পর (স্বাভাবিকভাবে যতক্ষণ পারা যায়) প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

৬. এবার বাঁ পায়ের পরিবর্তে ডান পা সোজা করে অনুরূপভাবে আসনটি অভ্যাস করতে হবে।

সময়কাল ঃ এক-একটি পায়ের জন্য মনে মনে দশ গোনা অভ্যাস হয়ে গেলে তিরিশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। দুই থেকে তিনবার করা যেতে পারে।

নিষেধ ঃ যারা উচ্চ রক্তচাপ, হাঁটুর উগ্র ব্যথা, কোমরের ব্যথার শিকার তারা এই আসন করার ক্ষেত্রে যোগ চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নেবে।

উপকারিতা ঃ এই আসন অলসতা, অম্বল, অক্ষুধা দূর করে। এছাড়া ডায়াবেটিস, সায়াটিকা প্রতিরোধ করে। স্নায়ুর দুর্বলতা, পেটে বায়ু প্রভৃতিতে ভীষণ উপকারী এই আসনটি। তাছাড়া এই আসন অভ্যাসের ফলে মেরুদণ্ড ও কোমরের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায়। পায়ের পেশি সুগঠিত ও সবল হয়।

পূর্ণ ধনুরাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসপ্রক্রিয়া স্বাভাবিক।

অভ্যাসের পদ্ধতি ঃ

প্রারম্ভিক অবস্থা— প্রথমে উপুড় হয়ে পা জোড়া রেখে সোজাভাবে শুতে হবে। হাত শরীরের পাশে থাকবে।

১. দু-পা হাঁটু থেকে মুড়ে ভাঁজ করতে হবে।
২. এবার ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এবং বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে কনুই দুটো ভাঁজ করে দু-পায়ের পাতা সামনের দিকে টেনে মাথায় ঠেকাতে হবে।
৩. কনুই দুটোকে মাথার দু-পাশে সামনের দিকে রাখতে হবে।
৪. হাঁটু দুটো যতটা সম্ভব সংলগ্ন রাখতে হবে।
৫. অন্তিম অবস্থায় আসনটি কিছু সময় ধরে রাখার পর ধীরে ধীরে প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

সময়কাল ঃ মনে মনে দশ গুনতে হবে, অভ্যাস হয়ে গেলে এটা ক্রমশ বাড়ানো যেতে পারে।

নিষেধ ঃ উচ্চ রক্তচাপ, ফ্রোজেন শোল্ডার, উগ্র হাড়ের অসুখ, পেশির দুর্বলতা ইত্যাদি থাকলে নিজে থেকে এই আসন না করাই শ্রেয়। যোগ বিশেষজ্ঞের ও যোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপকারিতা ঃ পেটে চর্বি ও বায়ু জমতে দেয় না। পিঠ ও কোমরের ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল, কোলাইটিস, হাঁপানি রোগে উপকারী। বুকের খাঁচা গঠনের ত্রুটি দূর করতে সাহায্য করে এই আসন। মেরুদণ্ড, কোমর, ঘাড় ও হাঁটুর নমনীয়তা বৃদ্ধি করে।

শঙ্খাসন

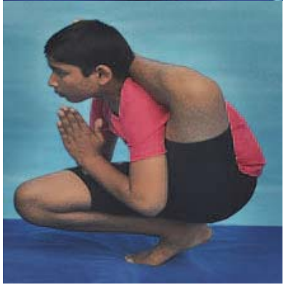

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক।

অভ্যাসের পদ্ধতি ঃ

প্রারম্ভিক অবস্থা— প্রথমে সুখাসনে বা বাবু হয়ে বসতে হয়।

১. এবার ডান পা-র সন্ধিস্থল দু-হাত দিয়ে ধরে মাথার উপর দিয়ে তুলে মাথার পিছনে কাঁধের উপর রাখতে হবে।

২. এরপর সামনে দু-হাত রেখে বাঁ পায়ের আঙুলের ডগার উপর ভর দিয়ে গোড়ালির উপর বসে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

৩. এবার দু-হাতের তালু জোড়া করে বুকের কাছে এনে নমস্কারের ভঙ্গিতে রাখতে হবে।

৪. এরপর হাত-পা বদল করে অর্থাৎ বাঁ পা কাঁধের উপর রেখে ডান পায়ের উপর ভর দিয়ে অনুরূপভাবে অভ্যাস করতে হবে।

৫. অন্তিম অবস্থায় আসনটি কিছু সময় ধরে রাখার পর ধীরে ধীরে প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

সময়কাল ঃ মনে মনে দশ গুনতে হবে, অভ্যাস হয়ে গেলে তিরিশ পর্যন্ত গোনা যেতে পারে। ডান পা ও বাঁ পা মিলিয়ে এক সেট থেকে দু-সেট অভ্যাস করা যেতে পারে।

নিষেধ ঃ যাদের সন্ধিস্থলে উগ্র ব্যথা, পায়ের পেশি নমনীয় নয়, স্থিতিস্থাপকতা কম, হাঁটু ও গোড়ালির সন্ধিতে ব্যথা, পিঠের পেশি ও মেরুদণ্ডের ব্যথা তাদের এই আসন না করাই শ্রেয়। প্রয়োজনে যোগ চিকিৎসক বা যোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

উপকারিতা ঃ শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করে। পায়ের পেশির স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে। পেটে চর্বি জমতে দেয় না। পায়ের পেশি মজবুত করে। হাতের পেশির শিথিলতা দূর করে।

ধনুরাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক। আমরা প্রতিনিয়ত যেভাবে শ্বাস নিই ও ছাড়ি সেইরকমই থাকবে।

অভ্যাসের পদ্ধতি ঃ

প্রারম্ভিক অবস্থা— প্রথমে উপুড় হয়ে সোজাভাবে শুতে হবে।

১. এবার দু-পা হাঁটু থেকে মুড়ে ভাঁজ করতে হবে এবং গোড়ালি নিতম্বের কাছে আনতে হবে।

২. এরপর ডান হাত দিয়ে ডান পা ও বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের গোছদুটি শক্ত করে ধরতে হবে।

৩. মাটি থেকে বুক ও উরু উপরের দিকে টেনে তুলতে হবে।

৪. তলপেট কিন্তু মাটিতে ঠেকে থাকবে।

৫. দৃষ্টি থাকবে সামনের দিকে এবং ঘাড় পিছনদিকে হেলিয়ে রাখতে হবে।

৬. অন্তিম অবস্থায় কিছু সময় ধরে রাখার পর ধীরে ধীরে প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

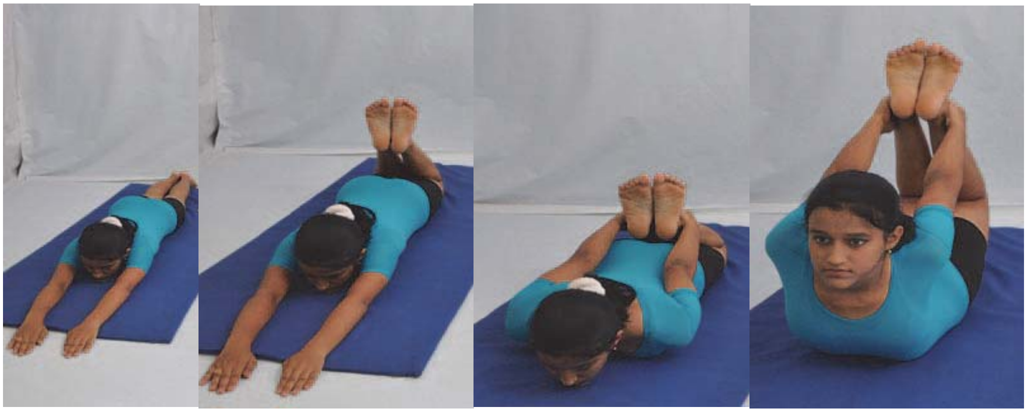

সময়কাল ঃ মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনতে হবে। পরে অবশ্য তিরিশ পর্যন্ত গোনা যেতে পারে। দু-বার, তিনবার অভ্যাস করা যেতে পারে।

নিষেধ ঃ উচ্চ রক্তচাপ, কোমর, হাঁটু, কাঁধের সন্ধিস্থলে ব্যথা, পেশির দুর্বলতার ক্ষেত্রে যোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

উপকারিতা ঃ পেটে চর্বি ও বায়ু জমতে দেয় না। পিঠে ও কোমরে ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্বল, কোলাইটিস, হাঁপানি রোগে উপকারী এই আসন। বুকের খাঁচা গঠনের ত্রুটি দূর করতে সাহায্য করে।

বকাসন

শ্বাসক্রিয়া ঃ এই আসনের সময় শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে হবে।

অভ্যাসের পদ্ধতি ঃ

প্রারম্ভিক অবস্থা— প্রথমে মাটিতে দু-পা ছড়িয়ে বসতে হবে।

১. এবার পা-দুটো হাঁটু থেকে মুড়ে ভাঁজ করে বুকের কাছে আনতে হবে।

২. গোড়ালি দুটো উরুমূলের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

৩. এরপর হাঁটু দুটো একটু ফাঁক করে সামনে ঝুঁকতে হবে।

৪. দু-হাত পায়ের পাতার দু-পাশে রাখতে হবে।

৫. এবার দুটো হাঁটু দু-বগলের পাশে রেখে হাতের উপর ভর দিয়ে সমস্ত শরীরটাকে মাটি থেকে শূন্যে তুলতে হবে।

৬. অন্তিম অবস্থা কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর ধীরে ধীরে প্রারম্ভিক অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

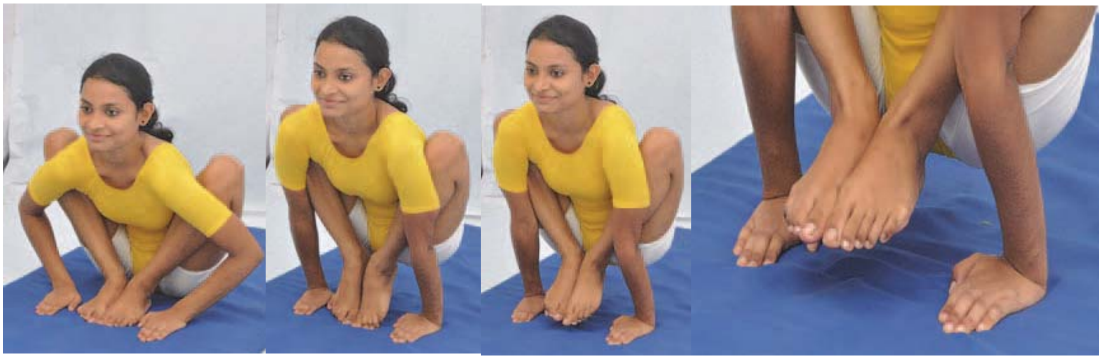

সময়কাল ঃ আসনটি করার সময় মনে মনে দশ গুনতে হবে, পরে ক্রমশ তিরিশ পর্যন্ত গোনা যেতে পারে। দু-বার থেকে তিনবার অভ্যাস করা যেতে পারে।

নিষেধ ঃ যাদের শোল্ডার জয়েন্ট দুর্বল, ডিসলোকেশন বা স্থানচ্যুতির ভয় থাকে, কবজিতে চাপ দিলে ব্যথা বাড়ে, হাতের পেশিতে ব্যথার উদ্ভব হয়, শরীরের ব্যালান্স রাখতে পারে না, পেশিগত রোগ (মাসকুলার এট্রফি) থাকে তারা অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে এই আসন করবে, নচেৎ নয়।

উপকারিতা ঃ এই আসনটি পেটের মাংসপেশির দুর্বলতা দূর করে, পেটে চর্বি জমতে দেয় না, হাত কাঁপা দূর করে, কাঁধের বাত, পেশির বাত ইত্যাদির বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে।

৪.২.১ জিমনাস্টিকস

অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন গ্রুপের কিছু ব্যায়াম নীচে দেওয়া হলো —

(১) স্ট্র্যাডেল জাম্প

ক) হাত দুটো পিছনদিকে সোজা করে দু-পা জোড়া করে দাঁড়াতে হবে।

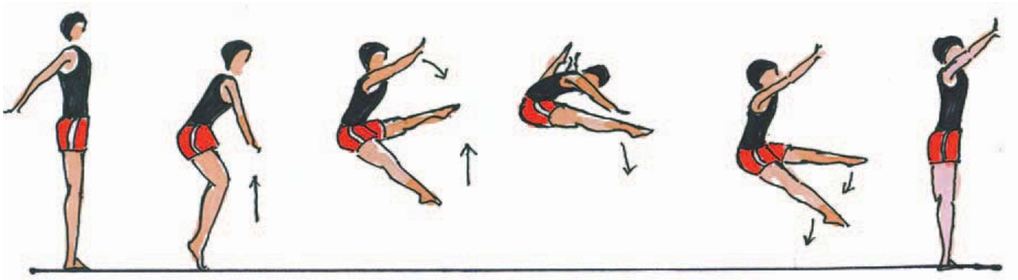

খ) এরপর দু-পায়ে মাটিতে সজোরে চাপ দিয়ে হাতকে সামনের দিকে দোলা দিয়ে কাঁধের ঝাঁকুনিতে শরীরকে শূন্যে তুলতে হবে।

গ) শূন্যে লাফিয়ে ওঠার সময় দু-পা সামনের দিকে কোনাকুনি ফাঁকা করে কোমর থেকে ভাঁজ করতে হবে এবং সোজা রেখে দু-হাত সোজা করে পায়ের সমান্তরাল ফাঁকা করতে হবে।

ঘ) এরপর কোমরের ভাঁজ খুলে জোড়া পায়ে মাটিতে দাঁড়াতে হবে।

(২) এক হাতে কার্ট হুইল

ক) দু-হাত উপরে তুলে বাঁ পা সামনে বাড়িয়ে পাশাপাশি পা ফাঁকা করে বাঁ হাতে হ্যান্ড স্ট্যান্ড অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে।

খ) ওই অবস্থা থেকেই ডান পা মাটিতে নামাতে হবে এবং হাত দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে বাঁ পা ডান পায়ের পাশে রাখতে হবে। দু-হাত কাঁধের উপর থাকবে।

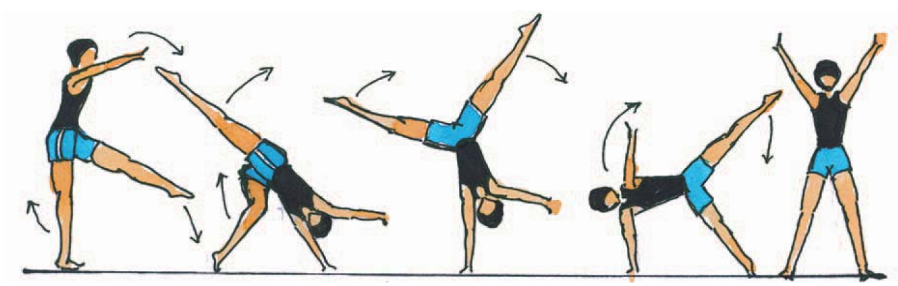

(৩) ডাইভ রোল

ক) দু-এক-পা দৌড়ে হাত দুটো সামনে বিস্তার করে জোড়া পায়ে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে পিছনে তুলে শরীরটা সোজা রেখে শূন্যে তুলতে হবে।

খ) ওই অবস্থা থেকে শরীর মাটির দিকে আসার সময় হাত দুটোর ভরে শরীরটা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে কাঁধ এবং পিঠের সাহায্যে সামনে গড়িয়ে দিয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হবে।

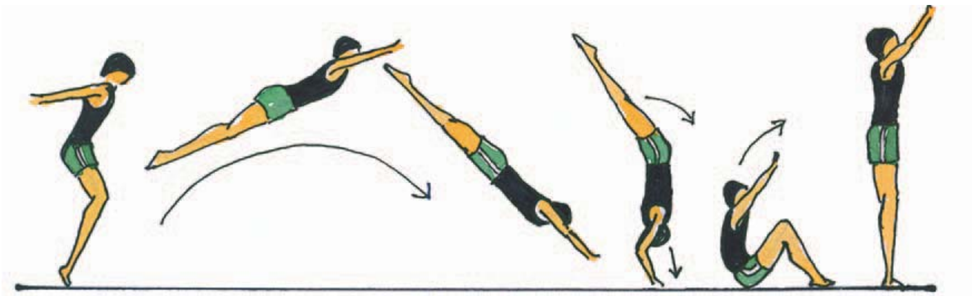

(৪) জাম্প ৩৬০° টার্ন

ক) হাত দুটো পিছনে সোজা করে রেখে দু-পায়ে দাঁড়াতে হবে।

খ) এরপর দু-পায়ে মাটিতে সজোরে ধাক্কা দিয়ে দু-হাত দোলা দিয়ে কাঁধের ঝাঁকুনিতে উপরদিকে লাফিয়ে উঠতে হবে।

গ) ওঠার সময় কোমর ও কাঁধের সাহায্যে যে-কোনো একদিক দিয়ে এক পাক ঘুরে মাটিতে দাঁড়াতে হবে।

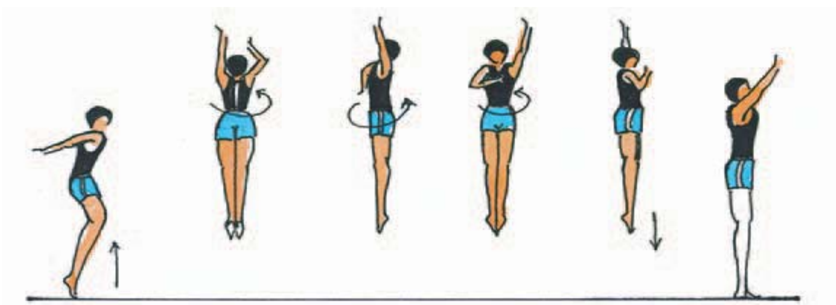

(৫) বসা অবস্থা থেকে পিছনে ওয়াক ওভার

ক) প্রথমে পা দুটো জোড়া করে সামনের দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে বসতে হবে। হাত দুটো নিতম্বের দু-পাশে মাটিতে রাখতে হবে। হাতের আঙুলগুলি যেন পিছনদিকে থাকবে।

খ) এরপর এক-পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে এবং অন্য পা সোজা রেখে শরীরটা উপরদিকে তুলতে হবে।

গ) এরপর প্রথমে সোজা রাখা পা কোমর থেকে আন্দোলিত হয়ে উপরদিকে যাবে এবং পরক্ষণে ভাঁজ করা পা মাটিতে ধাক্কা দিয়ে উপরদিকে তুলতে হবে।

ঘ) শরীরটা ধাক্কা দিয়ে যখন উপরদিকে যাবে তখন হাতদুটো কাঁধ থেকে ভিতরদিকে মোচড় দিতে হবে এবং পাদুটো পরপর মাটিতে আনতে হবে।

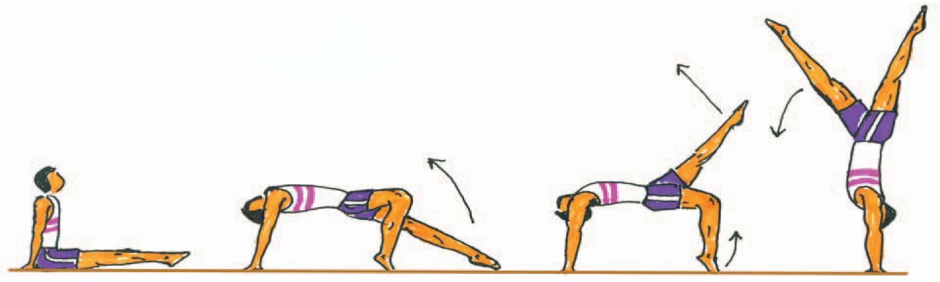

(৬) শূন্যে গুটিয়ে পিছনে ঘোরা

ক) দু-পায়ের পাতা দিয়ে মাটিতে সজোরে ধাক্কা মেরে কাঁধের ঝাঁকুনিতে হাত উপরদিকে তুলে শরীরটা সোজা রেখে যতটা সম্ভব উপরদিকে উঠতে হবে।

খ) শরীরটা উপরে ওঠার সময় পাদুটো জোড়া রেখে হাঁটু থেকে ভাঁজ করে মাথার দিকে নিয়ে যেতে হবে।

গ) শরীরটা খুব ছোটো করে গুটিয়ে নিয়ে নিতম্বের গতি বাড়িয়ে পিছনদিকে শূন্যে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

ঘ) শূন্যে ঘুরে গেলেই ভাঁজ করা পা পিছনদিকে কোনাকুনিভাবে নীচে নামিয়ে দিতে হবে।

ঙ) পায়ের পাতা মাটি স্পর্শ করলেই শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হাত উপরে তুলে রেখে হাঁটু অল্প ভাঁজ করে তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

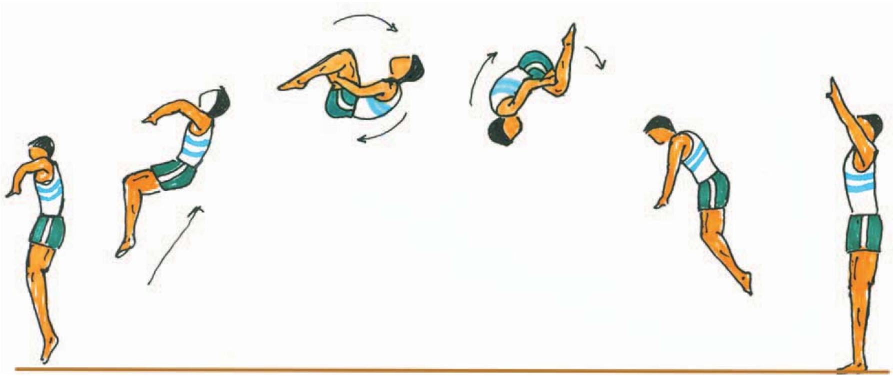

৮.২.২ অ্যারোবিক ব্যায়াম

শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অক্সিজেন সহযোগে একটি বিশেষ ছন্দের দ্বারা সঠিকভাবে সঞ্চালন করাই হলো অ্যারোবিক ব্যায়াম।

উদ্দেশ্য ঃ

হৃৎপিণ্ডের কমসংখ্যক সংকোচনে বেশি পরিমাণে রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠানো। নমনীয়তা, সক্ষমতা, সমন্বয়সাধন ইত্যাদি বৃদ্ধি করা, সর্বোপরি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এখানে সাতটি ব্যায়ামের একটি সেট আছে। প্রতিটি ব্যায়াম আলাদা আলাদা করে সংখ্যাগণনার সাহায্যে (ছন্দে) অনুশীলন করতে হবে। ব্যায়ামগুলি সঠিকভাবে রপ্ত হওয়ার পর একসঙ্গে পরপর সংখ্যাগণনার সাহায্যে অনুশীলন করতে হবে।

১নং ব্যায়াম ঃ

১ — স্বাভাবিকভাবে সোজা অবস্থায় দাঁড়াতে হবে, দাঁড়িয়ে থেকে বাঁ পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে সামনে ওঠাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত কনুই থেকে ভাঁজ করে সামনে ওঠাতে হবে, হাত ও পায়ের অবস্থান প্রায় সমকোণে থাকবে।

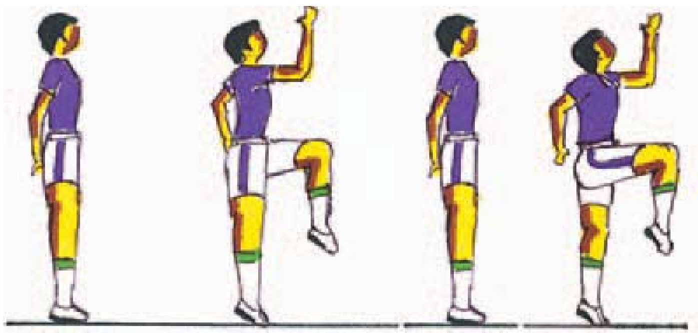

২ — এবার বাঁ পা মাটিতে নামাতে হবে, একই সঙ্গে ডান হাত ভাঁজ-হওয়া অবস্থাতেই দেহের পিছনে ওঠাতে হবে। বাঁ-পা মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে ডান পা প্রায় সমকোণে ভাঁজ হয়ে সামনে ওঠাতে হবে এবং বাঁ হাত কনুই থেকে ভাঁজ হওয়া অবস্থায় সামনে ওঠাতে হবে।

৩ থেকে ৮ পর্যন্ত — ১ ও ২-এর মতো ৩ থেকে ৮ পর্যন্ত পরপর একবার বাঁ পা - ডান হাত ও একবার ডান পা - বাঁ হাত একই জায়গায় ছন্দে করতে হবে।

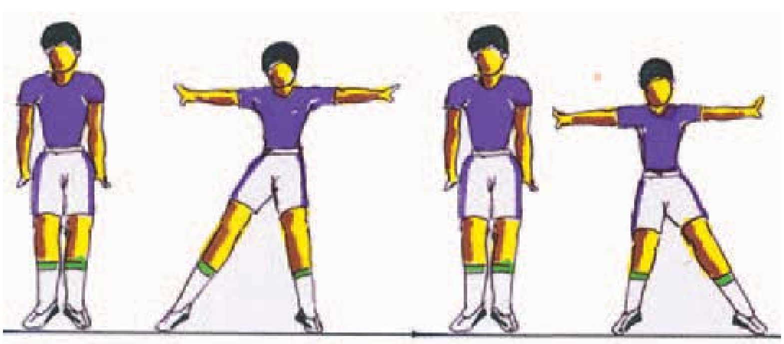

২ নং ব্যায়াম ঃ

১ — স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ানো থেকে ডান পা ডান পাশে এক থেকে দেড় ফুট দূরে নিয়ে যেতে হবে।

ডান পা ডান পাশে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো

দুইপাশে কাঁধবরাবর প্রসারিত করতে হবে। এবার বাঁ পা ডান পায়ের পাশে নিয়ে যেতে হবে এবং হাত দুটো দেহের দুইপাশে নামিয়ে আনতে হবে।

২ — একইরকমভাবে বাঁপা আগের জায়গায় অর্থাৎ বাঁদিকে এক থেকে দেড় ফুট সরাতে হবে। একইসঙ্গে হাত দুটো দুইপাশে কাঁধবরাবর প্রসারিত করতে হবে এবং ডান পা বাঁপায়ের পাশে নিতে হবে। হাতও দেহের পাশে নামিয়ে আনতে হবে।

৩ থেকে ৮ পর্যন্ত — ১ ও ২-এর মতো ৩ থেকে ৮ সংখ্যা পর্যন্ত একবার ডান পা ও একবার বাঁপা একইরকমভাবে ব্যায়ামটি একটি ছন্দে চালাতে হবে। হাত দুটো সবসময় কোমরেই রাখতে হবে।

৩ নং ব্যায়াম ঃ

১ — স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়ানো থেকে ছোট্ট একটা জাম্পে ডান পা হাঁটু থেকে ভাঁজ হয়ে পিছনদিকে ওঠাতে হবে। একইসঙ্গে কনুই থেকে ভাঁজ হয়ে হাত দুটো সামনে ওঠাতে হবে, হাতের আঙুলগুলি কানের কাছে রাখতে হবে ও কনুই দুটো অল্প উপরে ওঠাতে হবে। এবার হাত খুলে সামনে সোজা করতে হবে এবং পা পিছন থেকে সামনে নিয়ে যেতে হবে।

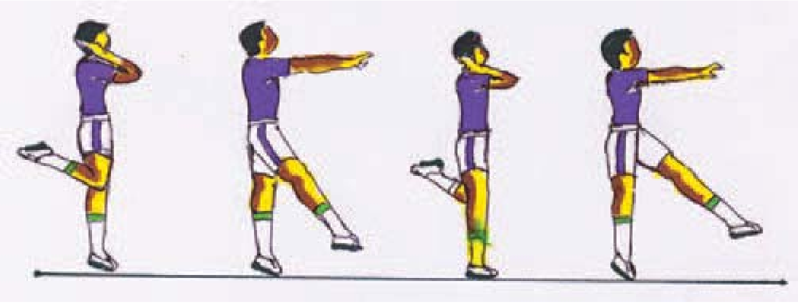

২ — ডান পা মাটিতে ফিরবে, একইসঙ্গে বাঁ পা ছোট্ট জাম্পে ভাঁজ হয়ে পিছনে ওঠাতে হবে এবং হাতদুটো আগের মতো কনুই থেকে ভাঁজ হয়ে উপরে ওঠাতে হবে। এবার হাত খুলে সামনে সোজা করতে হবে এবং পা পিছন থেকে সামনে নিয়ে যেতে হবে।

৩ — ১ নং অবস্থানের মতো করতে হবে।

৪ — ২ নং অবস্থানের মতো করতে হবে।

৫ থেকে ৮ — ১ থেকে ৪-এর মতো করে যেতে হবে।

৪ নং ব্যায়াম ঃ

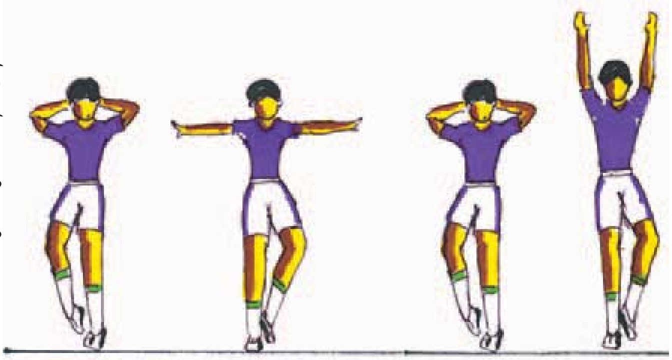

১ — স্বাভাবিকভাবে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বাঁ পা সম্পূর্ণ মাটিতে রেখে ডান পায়ের হাঁটু ভাঁজ হয়ে সামনে উঠবে, ডান পায়ের পাতা বাঁ পায়ের পাশে থাকবে, শুধুমাত্র গোড়ালি উঠে থাকবে।

একইসঙ্গে হাত দুটো দেহের পাশ থেকে উঠে মাথার পিছনে নিয়ে যেতে হবে। কনুই দুইপাশে প্রসারিত থাকবে।

২ — ডান পা বাঁ পায়ের মতো অবস্থান নেবে এবং বাঁ পা হাঁটু থেকে ভাঁজ করে সামনে ওঠাতে হবে। বাঁ পায়ের পাতা মাটিতে ডান পায়ের পাতার পাশে রাখতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো মাথা থেকে সরিয়ে দুইপাশে কাঁধবরাবর প্রসারিত করতে হবে।

৩ — ১-এর মতো, ডান পা সামনে ও হাতদুটো মাথার পিছনে স্পর্শ করাতে হবে।

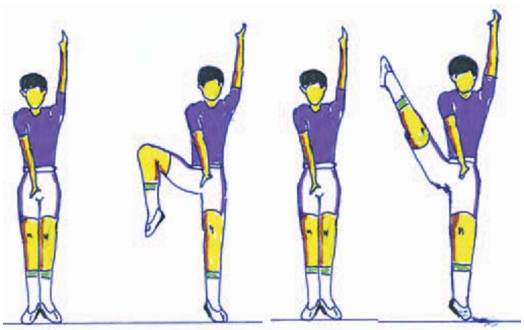

৪ — বাঁ পা ভাঁজ হয়ে সামনে যাবে এবং হাতদুটো মাথার পিছন থেকে সোজা উপরে ওঠাতে হবে (হাত দুটো কাঁধবরাবর ফাঁকা রাখতে হবে)।

৫ থেকে ৮ — ১ থেকে ৪-এর মতো করে যেতে হবে।

৫ নং ব্যায়াম ঃ

১ — বাঁ হাত কানের পাশ দিয়ে মাথার উপর সোজা থাকবে ও ডান হাত দেহের সামনে দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে নীচের দিকে সোজা রাখতে হবে। এই অবস্থা থেকে ডান পা দেহের ডান পাশে একটা ছোট্ট জাম্পে হাঁটু থেকে ভাঁজ করে তুলতে হবে। পা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পায়েও অল্প লাফাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ডান পা নীচে নামাতে হবে।

২ — আগের মতোই হবে, শুধুমাত্র ডান পা ভাঁজ না হয়ে সোজা ওঠাতে ও নামাতে হবে।

৩ — ১-এর অনুরূপ হবে।

৪ — ২-এর অনুরূপ হবে।

৫ থেকে ৮ — হাতের অবস্থান ১-এর ঠিক বিপরিত, অর্থাৎ ডান হাত উপরে ও বাঁ হাত নীচে। ডান পায়ের পরিবর্তে বাঁ পা, ভঙ্গিমা সম্পূর্ণ এক।

৬ নং ব্যায়াম ঃ

১ — সাবধান অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে দু-পায়ে অল্প লাফ দিয়ে বাঁপা পিছনে এবং ডান পা সামনের ডান দিকে কোনাকুনি রাখতে হবে। একইসঙ্গে দু-হাত দু-পাশে কাঁধবরাবর তুলতে হবে।

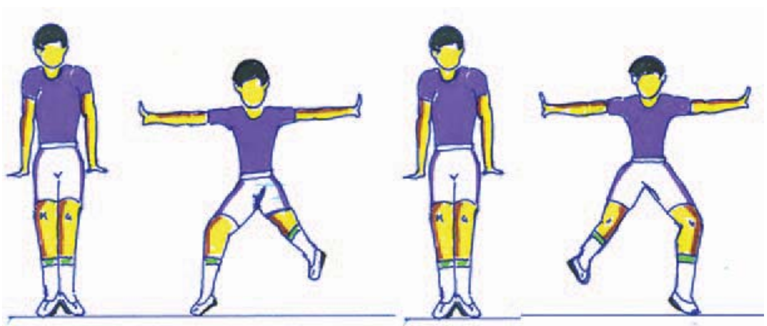

২ — লাফিয়ে সাবধান অবস্থায় আসতে হবে।

৩ — ১-এর মতো এবার ডান পা পিছনে এবং বাঁ-পা সামনে, বাঁদিকে কোনাকুনি রাখতে হবে। একইসঙ্গে দু-হাত দু-পাশে কাঁধবরাবর তুলতে হবে।

৪ — সাবধান অবস্থায় ফিরে আসতে হবে।

৫ থেকে ৮ — ১ থেকে ৪-এর নিয়মে করে যেতে হবে।

এটি এমন একটি পদ্ধতি যা বিভিন্ন ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে শারীরিক পটুতাকে সুদৃঢ় করতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু ব্যায়াম পারস্পরিকভাবে অনুশীলন করে একটি চক্র পরিপূরণ করতে হয়। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক দক্ষতা বাড়ানো হয়। যেমন ঃ গতি, ক্ষিপ্রতা, ভারসাম্য, শক্তি, সহনশীলতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয় ও নমনীয়তা। এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যায়াম নির্দিষ্ট সময় ধরে করতে হয়। এখানে উদাহরণস্বরূপ ৯টি স্টেশনের ব্যায়াম উল্লেখ করা হলো। যার প্রতিটি ব্যায়াম এক মিনিট সময় ধরে চক্রটি সম্পন্ন করতে হবে।

৮.২.৩ পিরামিড

উপকারিতা ঃ

১) পারস্পরিক বোঝাপড়া,
২) দলীয় সংহতির সচেতনতা,
৩) দায়িত্ব সচেতনতা,
৪) শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখা,
৫) উচ্চতার ভীতি দূরীকরণ,
৬) সৃজনশীলতার দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

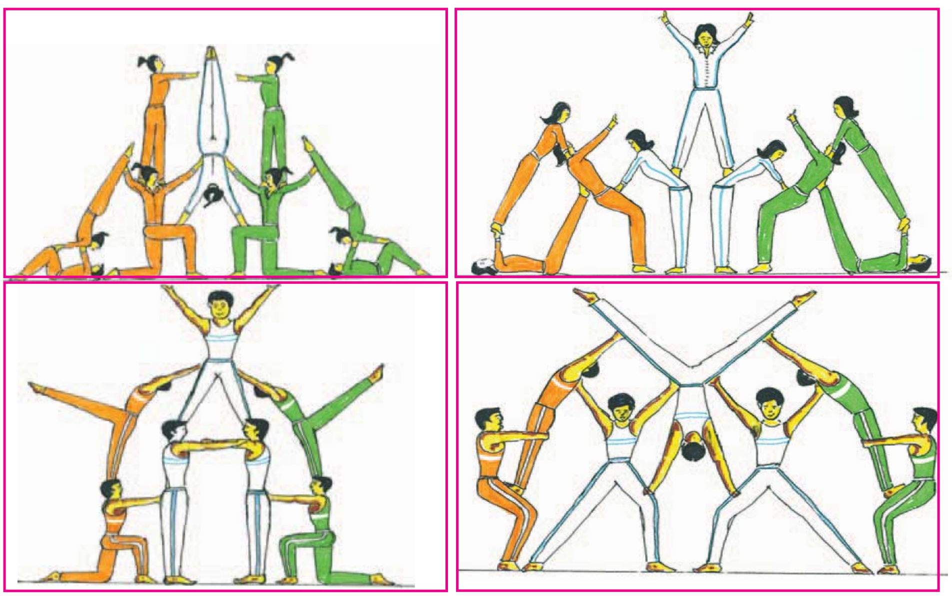

৪.৩.১ উচ্চলম্ফন

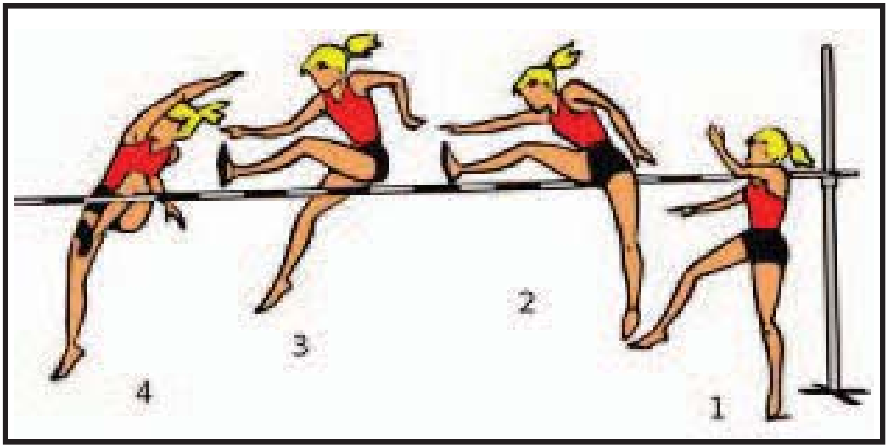

উচ্চলম্ফনের লক্ষ্য হলো শরীরের ভরকেন্দ্রকে সর্বাধিক গতিতে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা। শরীরকে কতটা উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া যাবে তা অনেকটাই নির্ভর করে ভূমি ছাড়া বা Take off-এর সময় অভিগমন দৌড় (Run up)-এর গতিশক্তি (Kinetic energy)-কে কৌণিক গতি (Angular motion)-তে পরিণত করার দক্ষতার উপর।

প্রশিক্ষণ এবং বিশ্লেষণের জন্য উচ্চলম্ফনের কৌশল (Technique)-কে ৪ (চার) ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. অভিগমন দৌড় (Run up/ Approach Run)

২. উড্ডয়নের জন্য ভূমি ছাড়া (Take off)

৩. বার অতিক্রম বা টপকানো (Bar clearance)

৪. অবতরণ (Landing)

১. অভিগমন দৌড় (Run up)— দ্রুতগতিতে ভূমি ছাড়া (Take off) এবং সর্বাধিক উচ্চতায় পৌঁছোনোর জন্য রান আপের প্রয়োজন। পূর্বনির্দিষ্ট ভূমিত্যাগ কেন্দ্রে (Take off point) সঠিক সময়ে পৌঁছোনোর জন্য রান আপ-এর মধ্যে ছন্দ (Rhythm) থাকবে। দৌড় অবশ্যই দৃঢ় এবং একরূপ (Consistent and uniform) হবে। সাধারণত ২-৩ পদক্ষেপ হেঁটে ৭ থেকে ৯টি লম্বা পদক্ষেপে দৌড়ে (Stride) রান আপ শুরু করা হয়। শেষ পদক্ষেপে শরীরের ভরকেন্দ্র (Centre of Gravity) একটু নীচু হবে। রান আপের দিক এবং কোণ নির্ভর করে জাম্পের কৌশল (Technique) এবং কোন পায়ে লাফানো (Take off leg) হবে তার উপর।

২. ভূমিত্যাগ (Take off)— যখনই ভূমিত্যাগ কেন্দ্র (Take off point)-এ যে পা দিয়ে লাফানো হবে সেটি স্থাপন করা হবে, তখনই Take off (টেক অফ) শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য হলো সর্বাধিক বলপ্রয়োগ করে

অনুভূমিক গতি (Horizontal velocity)-কে কৌণিক ভরবেগ (Angular momentum)-এ পরিণত করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো 'বার' (Bar)-এর উপর শরীরকে সঠিকভাবে প্রতিস্থাপন করা। যখন রৈখিক গতি (Linear motion) কৌণিক গতিতে রূপান্তরিত হয় তখন ভূমিহীন পা এবং হাত উপরের দিকে উঠবে।

৩. বার অতিক্রম (Bar clearance)— বার টপকানোর জন্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একটার পর আর একটা পার করাতে হয়। সেজন্য শরীর এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে যাতে বার (Bar) এবং শরীরের মধ্যে ন্যূনতম ব্যবধানের অবস্থান (economical lay out) তৈরি হয়। সফল 'বার' অতিক্রম করার জন্য টেক অফের পর শরীর এবং বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যথাসময়ে উপযুক্ত ঘূর্ণন তৈরি করতে হয়।

৪. অবতরণ (Landing)— অবতরণ-এর লক্ষ্য হলো অবতরণ ভূমি (Jumping Pit)-তে এমনভাবে শরীরকে নিক্ষেপ করা যাতে আঘাতকে প্রতিহত করা যায়।

স্ট্র্যাডেল (Straddle)

(ক) অভিগমন দৌড় (Run up)— রান আপ অবশ্যই সোজা পথ (Straight Line)-এ হবে। বার (Bar)-এর সঙ্গে ২৫°-৪৫° কোণ করে দৌড়োতে হবে। রান আপের দৈর্ঘ্য হবে ৭-১১টি লম্বা পদক্ষেপ। যে পা দিয়ে লাফ দিতে হবে সেদিক থেকে দৌড় শুরু করতে হবে।

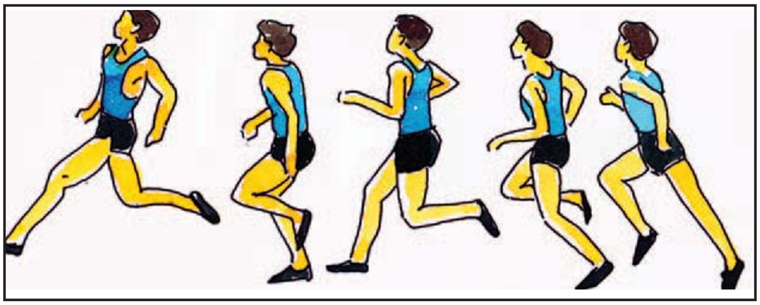

(খ) ভূমিত্যাগ (Take off)— যে পায়ে লাফানো হবে (Take off foot) সেটি অ্যাথলিটের ভরকেন্দ্রের যথেষ্ট সামনে স্থাপন করতে হবে এবং কাঁধকে পিছনে রেখে নিতম্ব (Hips) জোরের সঙ্গে সামনে-উপরে ঠেলতে হবে। এ সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য শরীর পিছনে হেলে যাবে। লাফানো পায়ের (Take off leg) হাঁটুতে ভাঁজ থাকবে এবং গোড়ালি (Heel) আগে ভূমি স্পর্শ করবে। বার (Bar) থেকে সাধারণত ৭০ সেমি দূরে পা (Take off foot) প্রতিস্থাপন করতে হবে।

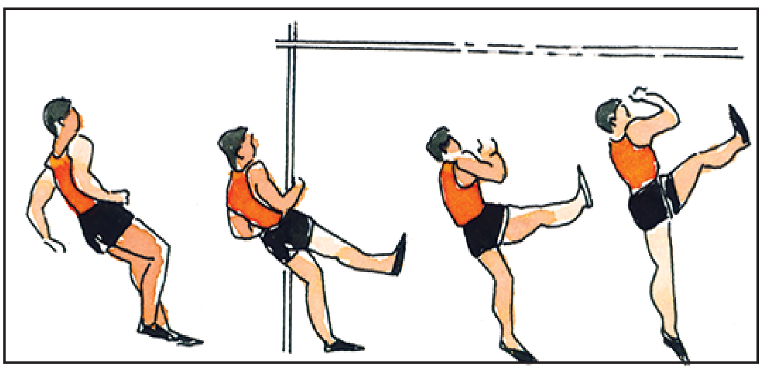

ভূমিহীন পা দ্রুততার সঙ্গে সামনে-উপরে নিয়ে যেতে হবে। প্রথমদিকে ভূমিহীন পায়ের নীচের অংশ

আলগা এবং হাঁটু ভাঁজ অবস্থায় থাকবে, পরে তা সবেগে সামনে-উপরে নিয়ে যেতে হবে। ভূমিহীন বা মুক্ত পায়ের মতো বাহুদ্বয় উপরের দিকে দোলায়িত হবে। মুক্ত পায়ের দিকের কাঁধ এবং বাহু অন্যদিকের চেয়ে একটু উপরে থাকবে।

(গ) বার অতিক্রম (Bar clearance)— ভূমি ছাড়া (Take off)-র পর 'বার' অতিক্রম করার জন্য বাতাসে বা শূন্যে শরীরের অবস্থান প্রায় উল্লম্ব অবস্থান (Vertical Position) থেকে অনুভূমিক অবস্থান (Horizontal Position)-এ আসবে। মুক্ত বা দোলানো পা (Swinging Leg)-এর একতরফা টান (Unilateral Pull)-এর সাহায্যে শরীরকে বারের দিকে ঘোরাতে হবে। মুক্ত পা (Swinging Leg) বারের কাছে আগে পৌঁছোবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকের হাতও যাবে। প্রথম দিকে শরীরের সঙ্গে পা-এর ৯০° কোণ তৈরি হবে, যা পরে বারের উপর প্রসারিত হবে। একই সঙ্গে লাফানো পা (Take off foot) টেনে মুক্ত পায়ের হাঁটুর কোটর বা গর্তের (hollow) কাছে আনতে হবে এবং বাইরের দিকে চাপ দিতে হবে। এই সময় শরীরের বিভিন্ন অংশ (Body Parts) লম্ব অক্ষরেখা (Longitudinal Axis)-কে কেন্দ্র করে থাকবে এবং এই অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে কৌণিক ভরবেগের ত্বরণ (Accelaration of Angular momentum) অনুভব করবে।

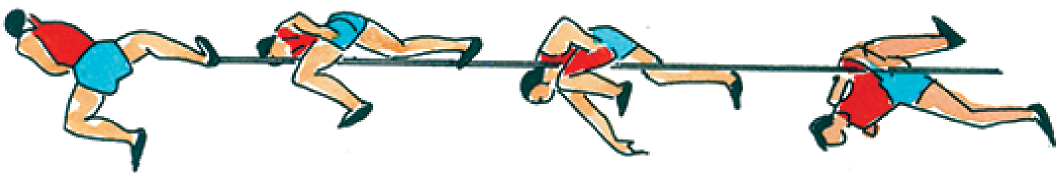

এই সময় অ্যাথলিটের মুখ এবং বুক সম্পূর্ণভাবে 'বার'-এর দিকে থাকবে এবং বারের সঙ্গে লম্বালম্বি সমান্তরালভাবে শুয়ে থাকবে।

এই অবস্থা থেকে লাফানো পায়ের (Jumping Leg) নিতম্বসন্ধি (Hip joint) থেকে উরুকে (Thigh) সঠিকভাবে বাইরের দিকে ঘোরাতে (Turn) হবে। ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু এবং পায়ের অগ্রভাগও (Tip of the foot) ঘুরবে। হাঁটুর ভাঁজ খোলার প্রয়োজন নেই, বরং ভাঁজ থাকাই ভালো। যদি নিতম্বসন্ধির নমনীয়তা বা সচলতা (flexibility, mobility) কম থাকার জন্য ঘোরানো (Turn) কম হয় তবে সুষুম্নাকাণ্ডের (Spinal cord) মোচড়ের সাহায্যে অতিরিক্ত ঘোরানো যেতে পারে।

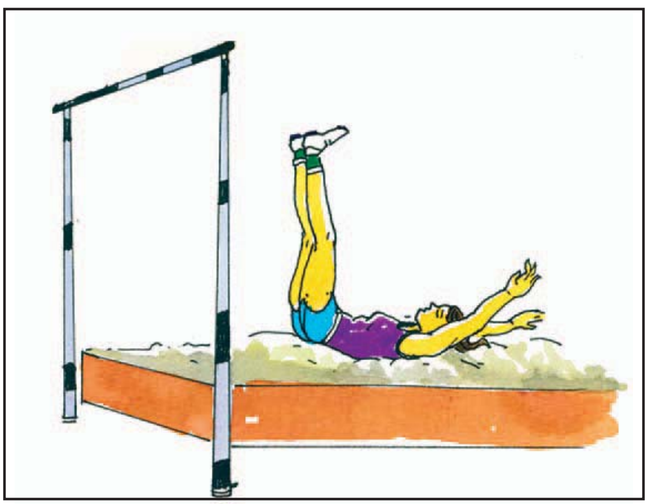

(ঘ) অবতরণ (Landing)— 'টেক অফ লেগের' বিপরীত পা এবং হাত আগে মাটি/বালি (Pit) স্পর্শ করবে। তারপর কাঁধ বা কোমর স্পর্শ করে পিঠের উপর গড়িয়ে যাবে।

৮.৩.২ দীর্ঘলম্ফন

দীর্ঘলম্ফনের কলাকৌশলকে চারটি ভাগে ভাগ করে বর্ণনা করা হলো—

(১) প্রারম্ভিক দৌড়, (২) মাটি ছেড়ে উপরে ওঠা, (৩) শরীরকে পিছনের দিকে বাঁকিয়ে ভেসে থাকা এবং (৪) মাটিতে নামা।

১। প্রারম্ভিক দৌড় ঃ দীর্ঘলম্ফনের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক দৌড়ের গতিবেগের উপর দূরত্ব অতিক্রম অনেকাংশেই নির্ভরশীল। সাধারণ ক্ষেত্রে ১৭ থেকে ২০ পা দৌড়ে ৩০ থেকে ৩৫ মিটার দূরত্ব ব্যবহার করা প্রয়োজন। অবশ্য বালক, বালিকা ও প্রথম অবস্থায় শিক্ষানবিশ জাম্পারদের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম দৈর্ঘ্যের হওয়া স্বাভাবিক। প্রাথমিক স্তরের বালকদের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব সাধারণত ১৫ পা-এর কম ও বালিকাদের ক্ষেত্রে ১৪ পা-এর দৌড়ের কম হয়ে থাকে। প্রারম্ভিক দৌড়ের গতিবেগ স্বল্পপাল্লার দৌড়ের গতিবেগের চেয়ে কম থাকে। দৌড় শুরুর কিছু পরে শরীরের অগ্রভাগের সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা ভাব কমে আসে এবং হাত ও পায়ের দৌড়োনোর ভঙ্গি স্বাভাবিক রাখতে হয়।

সঠিক পদক্ষেপে মাটি ছেড়ে উপরে ওঠার জন্য প্রারম্ভিক দৌড়ের পথে 'চেকমার্ক' ব্যবহার করা হয়। প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থী তিনটি চেকমার্ক ও প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়েরা দুটি 'চেকমার্ক' ব্যবহার করে থাকে।

শিক্ষানবিশদের ক্ষেত্রে প্রথম চেকমার্ক = প্রারম্ভিক দৌড় শুরুর স্থানে।

দ্বিতীয় চেকমার্ক = প্রারম্ভিক রেখার ১০-১২ পদক্ষেপ দূরত্বে।

তৃতীয় চেকমার্ক = টেক অফ বোর্ড-এর চার পদক্ষেপ আগে।

প্রারম্ভিক দৌড়ের শেষে আগের পদক্ষেপটি তুলনামূলক বড়ো হয় এবং প্রারম্ভিক দৌড়ের শেষ পদক্ষেপটি তুলনামূলক কম দৈর্ঘ্যের হয়। টেক অফ বোর্ড থেকে পা মেপে বা ফিতে দিয়ে মেপে চেকমার্ক, প্রারম্ভিক দৌড়ের দূরত্ব, শক্তিশালী পা লাফানোর কাঠের উপরে স্থাপনের কৌশল ঠিক করে নিতে হয়।

২। মাটি ছেড়ে উপরে ওঠা ঃ মাটি ছেড়ে উপরে ওঠার জন্য প্রারম্ভিক দৌড়ের শেষে শক্তিশালী পা লাফানোর কাঠের উপরে (টেক অফ বোর্ডে) স্থাপন করতে হবে। এই সময় লাফানোর পায়ের হাঁটুর উপরের সামনের দিকের পেশিসমূহ টানটান করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে বিস্ফোরকভাবে পা সোজা করবার জন্য এই টানটান অবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শরীরের ভরকেন্দ্র লাফানো পায়ের সমতল অংশের ঠিক উপরে চলে আসে। দুই হাত ও মুক্ত পা ভরকেন্দ্রের পাশে মধ্যরেখার কাছাকাছি আসে। এইভাবে হাত ও পা চূড়ান্ত পর্যায়ে হঠাৎ প্রচণ্ড গতিতে উপরে লাফিয়ে ওঠার জন্য তৈরি হয়ে পড়ে।

৩। হাওয়াতে ভাসা ঃ মূল লাফ শেষ হওয়ার পর শরীর বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার শুরুতে মুক্ত পা নীচের দিকে নামিয়ে সোজা অবস্থায় আনা হয়। এখানে লাফ দেওয়া পা, মুক্ত পা-এর সঙ্গে যোগ দেয়। পা দুটিকে হাঁটু থেকে ভেঙে হাঁটুর নীচের অংশকে একসঙ্গে পিছনের দিকে বাঁকিয়ে হাঁটুর উপরের অংশের সঙ্গে প্রায় সমকোণে ধরে রাখা হয়। হাত দুটো মাথার উপর কনুই থেকে ভেঙে পিছনের দিকে রাখতে হবে। হাত ও পায়ের এই অবস্থা দেহকাণ্ডকে পিছনের দিকে বেঁকে ধনুকের মতো অবস্থায় আসতে সাহায্য করে। এইভাবে মোট লাফানো দূরত্বের অর্ধেক অংশ পর্যন্ত শরীরকে বাতাসে ভাসিয়ে সামনের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

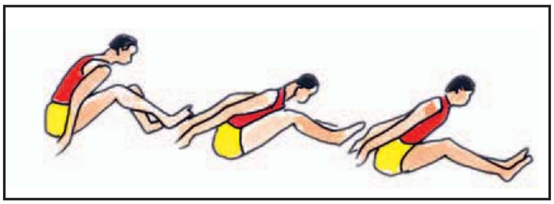

৪। মাটিতে নামা ঃ মাটিতে নামার আগের মুহূর্তে পা দুটি যতটা সম্ভব লম্বা করে সামনের দিকে সম্পূর্ণ সোজা করতে হবে, যাতে যতটা সম্ভব বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। প্রথমে দু-পায়ের গোড়ালি জোড়া করে মাটি স্পর্শ করতে হবে। এই সময় শরীরকে পিছনদিকে পড়া থেকে রক্ষা করবার জন্য পায়ের হাঁটু ভেঙে এবং কোমরকে জোরের সঙ্গে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। হাঁটু ভাজ করে মাটিতে নামাবার সঙ্গে সঙ্গে নিতম্বকে সামনে গড়িয়ে দিতে হবে ও হাত দুটি পাশে রাখতে হবে।

অনুশীলন পর্ব ঃ দীর্ঘলম্ফনের সঠিক অনুশীলনের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রারম্ভিক দৌড়, মূল লাফ, বাতাসে ভাসা ও মাটিতে নামার কৌশলগুলি ধাপে ধাপে আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

(১) শক্তিশালী পা নির্ধারণের জন্য প্রথমে শিক্ষার্থীকে দু-পা স্বাভাবিক অবস্থায় পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে শিক্ষার্থীকে না বুঝতে দিয়ে হঠাৎ পিছন থেকে পিঠে ধাক্কা দিলে প্রথমে যে পা সামনে পড়বে সেই পা ওই শিক্ষার্থীর শক্তিশালী পা।

(২) প্রথমে প্রারম্ভিক দৌড়ের শুরুর স্থানে চেকমার্ক নির্ধারণ করতে হবে। বারে বারে অনুশীলন করে প্রারম্ভিক দৌড়ের দূরত্ব ও চেকমার্কের দূরত্ব এগিয়ে বা পিছিয়ে শক্তিশালী পা লাফানোর কাঠের উপরে স্থাপন করে মাটি ছাড়ার কৌশল বারবার অনুশীলন করতে হবে।

(৩) শক্তিশালী পা নির্ধারণ করে সেই পা সামনে রেখে ও মুক্ত পা পিছনে রেখে শরীরের ওজন পিছনের পা থেকে সামনের পায়ে পরিবর্তিত করে, লাফ দেওয়া পায়ের সাহায্যে মাটি ছাড়তে হবে।

(৪) কয়েক পদক্ষেপ হেটে টেক অফ বোর্ডে সঠিকভাবে সঠিক পা দিয়ে মূল লাফের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।

(৫) জগিং করতে করতে টেক অফ বোর্ডে সঠিকভাবে সঠিক পা দিয়ে মূল লাফের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।

(৬) কয়েক পা সঠিক পদক্ষেপে দৌড়ে মূল লাফের কৌশলের অনুশীলন।

(৭) টেক অফ নিয়ে মাটি ছেড়ে বাতাসে ভাসার কৌশল আয়ত্ত করতে শেখানোর জন্য স্প্রিং বোর্ড, নীচু শক্ত বেঞ্চ, ঢালু র‍্যাম্প, ঢালু মাটির ঢিবি ব্যবহার করা সুবিধাজনক। এছাড়াও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘলম্ফন ও পিছনদিকে দীর্ঘলম্ফন অনুশীলন খুবই উপযোগী।

কয়েক পদক্ষেপ দৌড়ে এসে স্প্রিং বোর্ডের সাহায্যে মাটি ছাড়লে ভাসমান পথ বেশি অতিক্রম করা যায় এবং ভাসমান অবস্থায় দেহের বিভিন্ন অংশের কৌশল আয়ত্তের অনুশীলন ভালো হয়।

মাটিতে নামার কৌশল অনুশীলন করবার জন্য কয়েক পা দৌড়ে এসে পা সামনে প্রসারিত করে গোড়ালি মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু ভেঙে দেহের সামনের দিকে নিতে হবে এবং হাত পাশে মাটিতে রাখতে হবে।

সর্বাধিক অনুশীলনের সুফল পাবার জন্য প্রথমে প্রারম্ভিক দৌড়, দ্বিতীয়ত মূল লাফ, তৃতীয়ত বাতাসে ভাসা, চতুর্থত মাটিতে নামা প্রভৃতি। এইভাবে গোটা কৌশলগুলি ভেঙে ভেঙে ও সম্পূর্ণভাবে শেখাতে হবে।

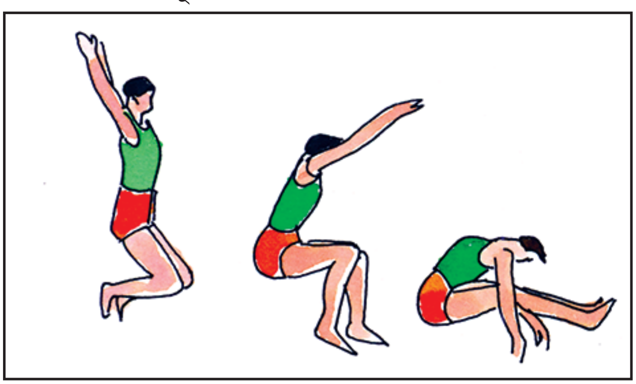

৮.৪.১ দাবা

বিভিন্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতি

দাবা খেলায় বিভিন্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা জয়লাভ করতে পারি বা নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারি।

নীচে দেওয়া বিভিন্ন উদাহরণ খেলার সময় এই পদ্ধতিগুলি খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে। এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে যেমন বিপক্ষের ঘুঁটি মারা যেতে পারে, তেমনই এগুলি বিপক্ষের আক্রমণ থেকে নিজের ঘুঁটি বাঁচাতে সাহায্য করবে।

FORK / DOUBLE ATTACK

Double Attack হলো সেই পদ্ধতি, যার মাধ্যমে দুটি ঘুঁটিকে একটি চালের সাহায্যে আক্রমণ করা যায়। fork হলো একটি বিশেষ Double Attack, যার মাধ্যমে একটি ঘুঁটি বিপক্ষের দুটি বা তার বেশি ঘুঁটিকে আক্রমণ করে।

(১)

(২)

(৩)

(৪)

প্রথম ছবিতে সাদার মন্ত্রী ‘Qh5’ চালটির মাধ্যমে কালোর রাজা ও ‘e8’-এর নৌকাটিকে একসঙ্গে আক্রমণ করছে।

দ্বিতীয় ছবিতে 'Ne5' চালটির মাধ্যমে সাদার ঘোড়া কালোর রাজা ও মন্ত্রীকে একসঙ্গে আক্রমণ করছে।

তৃতীয় ছবিতে কালোর গজ 'e4'-এর বোড়েটিকে খেয়ে নিয়ে সাদার রাজা ও নৌকাকে একসঙ্গে আক্রমণ করছে।

চতুর্থ ছবিতে কালোর রাজা 'Kd5'-এর মাধ্যমে সাদার দুটি নৌকাকে একসঙ্গে আক্রমণ করছে।

PIN

Pin হয়, যখন বিপক্ষের দুটি ঘুঁটি একই File, Rank অথবা Diagonal-এ থাকে এবং সামনের ঘুঁটিটির মূল্য পরের ঘুঁটির থেকে কম হয়। এই অবস্থায় যদি আমাদের কোনো ঘুঁটি সামনের ও পরের ঘুঁটিকে এমনভাবে আক্রমণ করে যাতে সামনের ঘুঁটিটি সরে গেলে পরের ঘুঁটিটি মারা যায়, তখন আমরা তাকে Pin বলি।

(১)

(২)

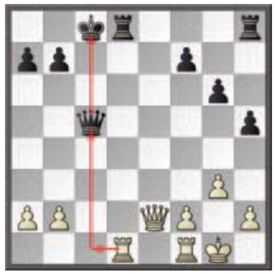
(৩)

(৪)

প্রথম ছবিতে 'Bf4' চালটির মাধ্যমে কালোর 'd6'-এর নৌকোটিকে আক্রমণ করা হলো, কিন্তু নৌকার পিছনে কালোর মন্ত্রী থাকার জন্য নৌকাটি সরতে পারছে না।

দ্বিতীয় ছবিতেও একইভাবে 'Bc3' চালটির মাধ্যমে আমরা কালোর নৌকাটিকে Pin করছি।

তৃতীয় ছবিতে সাদা নৌকা 'Rc1'-এর মাধ্যমে কালোর মন্ত্রীকে আক্রমণ করতে পারে এবং 'c8'-এ কালো রাজা থাকার জন্য কালো নিজের মন্ত্রীকে বাঁচাতে পারছে না।

চতুর্থ ছবিতে 'Bb5'-এর মাধ্যমে আমরা কালোর মন্ত্রীর উপরে আক্রমণ করতে পারি ও তাকে মেরে দিতে পারি।

SKEWER

Skewer অথবা স্কিওয়্যার অনেকটা পিনের মতোই। এখানে শুধু সামনের ঘুঁটির মূল্য পিছনের ঘুঁটির থেকে কম হয়। এক্ষেত্রে সামনের ঘুঁটি সরে গেলে আমরা পরের ঘুঁটি মেরে দিতে পারি।

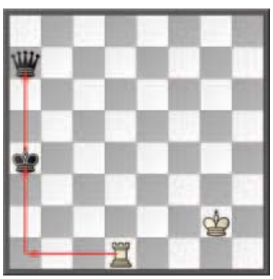
(১)

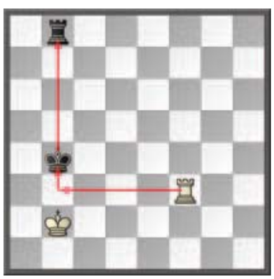
(২)

(৩)

(৪)

প্রথম ছবিতে সাদা 'Ra1+' চালটির মাধ্যমে কালোর রাজা ও মন্ত্রীকে আক্রমণ করছে। কালো রাজা সরে গেলে, কালোর মন্ত্রী মারা যাবে।

দ্বিতীয় ছবিতে 'Rb3+'-এর মাধ্যমে সাদা নৌকা 'b8'-এর নৌকোটিকে মেরে দিতে পারে।

তৃতীয় ছবিতে 'Rd5' চালের মাধ্যমে সাদার নৌকা কালোর গজটিকে আক্রমণ করে খেয়ে নিতে পারে।

চতুর্থ ছবিতে সাদার গজ 'd4' ঘরে গিয়ে কালোর মন্ত্রীকে আক্রমণ করছে এবং মন্ত্রী সরে গেলে 'h8'-এর নৌকাটিকে মেরে দেবে।

BACK RANK MATE

Back Rank Mate হলো সেই আক্রমণাত্মক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে আমরা বিপক্ষের শেষ র‍্যাংক-এর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে রাজাকে কিস্তিমাত করি।

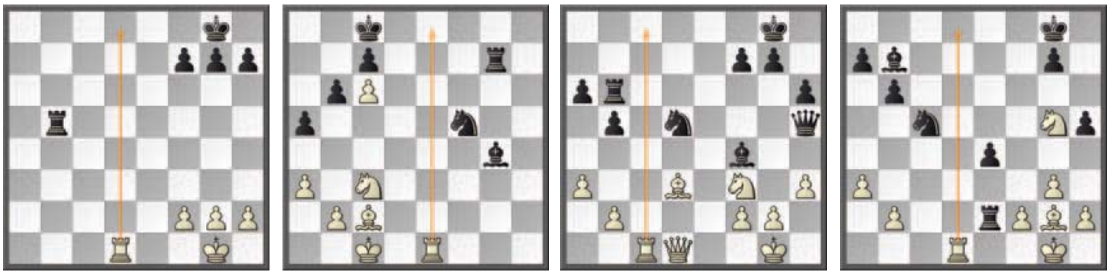

(১) (২) (৩) (৪)

প্রথম ছবিতে 'Rd8 + #'-এর মাধ্যমে সাদা, কালো রাজাকে মাত করছে এবং রাজার সামনে বোড়ের প্রাচীর থাকার জন্য রাজার পালানোর কোনো জায়গা নেই।

দ্বিতীয় ছবিতে 'Re8 + #'-এর মাধ্যমে সাদা নৌকা, কালোকে কিস্তিমাত করছে। এক্ষেত্রে রাজার সামনে বোড়ের প্রাচীর না থাকলেও 'c6'-এর সাদা বোড়ে কালো রাজার পালানোর পথ বন্ধ করছে।

তৃতীয় ছবিতে 'Rc8 + #'-এর মাধ্যমে সাদার নৌকা, কালো রাজাকে কিস্তিমাত করছে। এবং 'h7' ঘরটি ফাঁকা থাকলেও 'd3'-এর সাদা গজটি কালো রাজার পালানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

চতুর্থ ছবিতে সাদার 'g5'-এর ঘোড়াটি, কালো রাজার পালানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং 'Rd8 + #'-এর মাধ্যমে সাদা নৌকা কালো রাজাকে কিস্তিমাত করে দিচ্ছে।

DISCOVERED ATTACK

যখন একটি ঘুঁটি সরে গিয়ে বিপক্ষের একটি ঘুঁটিকে আক্রমণের রাস্তা করে দেয় তখন তাকে 'ডিসকভার অ্যাটাক' বলে।

প্রথম ছবিতে 'Bc2+'-এর মাধ্যমে 'B1'-এর সাদা নৌকাটি কালো মন্ত্রীকে আক্রমণ করছে এবং 'Check' থাকার জন্য কালো মন্ত্রীটি মারা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ছবিতে, 'Ne5+'-এর মাধ্যমে 'd3'-র সাদা গজটি কালো মন্ত্রীকে আক্রমণ করছে এবং 'Check' থাকার জন্য মন্ত্রীটি মারা যাচ্ছে।

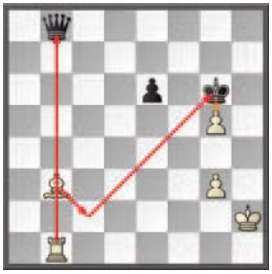
(১)

(২)

(৩)

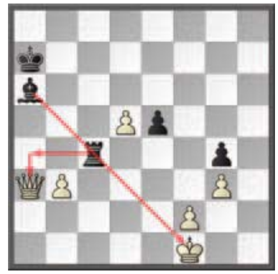
(৪)

তৃতীয় ছবিতে 'f3+' এর মাধ্যমে 'C7'-এর কালো গজটি সাদা রাজাকে কিস্তি দিচ্ছে এবং তার ফলে সাদা গজটি মারা যাচ্ছে।

চতুর্থ ছবিতে 'Ra4+'-এর মাধ্যমে কালো গজটি সাদা রাজাকে কিস্তি দিচ্ছে এবং কালো নৌকাটি সাদা মন্ত্রীকে আক্রমণ করছে। যার ফলে সাদা মন্ত্রীটি মারা যাচ্ছে।

TRAPPING PIECES

কোনো কোনো সময় বিপক্ষের ঘুঁটিকে আমরা এমনভাবে আক্রমণ করতে পারি যার ফলে সেই ঘুঁটিটির কোনো পালাবার জায়গা থাকে না, তাকে আমরা ট্র্যাপিং পিসেস বলি।

(১)

(২)

(৩)

(৪)

প্রথম ছবিতে সাদার গজ 'Bb2'-এর মাধ্যমে কালো মন্ত্রীকে আক্রমণ করছে এবং মন্ত্রীর পালাবার কোনো জায়গা নেই। তাই একটি কম মূল্যের ঘুঁটির বিনিময়ে আমরা কালো মন্ত্রীকে খেয়ে নিতে পারি।

দ্বিতীয় ছবিতে 'Bf3'-এর মাধ্যমে 'a8'-এর কালো নৌকাটিকে আমরা আক্রমণ করছি এবং কালো 'Rb8' চালটি দিলে 'f4' -এর সাদা গজটি নৌকাটিকে মেরে দেবে।

তৃতীয় ছবিতে সাদা 'g4' চালটি দিলে কালো গজটির পালানোর জায়গা থাকছে না। এই কালো গজটি আমরা একটি বোড়ের বিনিময়ে মেরে দিতে পারছি।

একইভাবে চতুর্থ ছবিতে 'g4' চালটি দিলে কালোর ঘোড়াটি Trap (ফাঁস) হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা সেটিকে মেরে দিতে পারছি।

৮.৫.১ ক্যারাটে

আত্মরক্ষার অধিকার প্রতিটি মানুষের আছে। এর প্রয়োজনীয়তা শুরু হয়েছিল পৃথিবীতে মনুষ্যজাতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল মানুষের সামনে এসেছে। কখনও সেটা অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে, কখনও বা খালি হাতে। খালি হাতে আত্মরক্ষার কৌশলগুলির মধ্যে বর্তমানে সর্বাধিক চর্চিত ও জনপ্রিয় কৌশল হলো ক্যারাটে। এই শব্দটির অর্থ হলো ক্যারা- খালি ও টে- হাতে । অর্থাৎ ক্যারাটে হলো খালি হাতে লড়াই (আত্মরক্ষার কৌশল)। ক্যারাটে শরীরের ভিতর ও বাইরের উভয় শত্রুর মোকাবিলায় সক্ষম। অর্থাৎ এর শিক্ষণপদ্ধতি শরীরকে ভিতর থেকে অধিক সক্ষম করে তোলে যা বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং বাইরের শত্রুর আক্রমণকেও অবলীলাক্রমে প্রতিহত করতে পারে। শরীরের সঙ্গে মানসিক ও মানবিকতা দৃঢ় করে। এখানে ক্যারাটের প্রয়োগপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

ক্যারাটে শিক্ষণ ঃ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বা গতিশীলভাবে বিভিন্ন কৌশল অভ্যাসের উপায় বা Kihon (Basic technique)।

(১) দাঁড়াবার ভঙ্গিমা (Stance) বা দাচি (Dachi)

(২) আক্রমণের পদ্ধতি—

(ক) হাতের মুষ্টি দিয়ে আক্রমণের উপায় (Punching) বা জুকি (Zuki or Tsuke techniques)।

(খ) (Striking) Uchi– উচি।

(গ) পায়ের ব্যবহারে আক্রমণ (Kicking) বা গেরি / কেরি (Geri or Keri)।

(৩) **প্রতিরক্ষার উপায়–** হাতের ব্যবহারে আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় (Blocking) হল উকে (Uke)।

দাঁড়াবার ভঙ্গিমা (Stance) বা দাচি (Dachi)

(১) হাইসোকো দাচি (Heisoko Dachi)–Close Feet Stance ঃ

(ক) পায়ের পাতা জোড়া করে সাধারণভাবে দাঁড়াতে হবে।

(খ) দেহ সম্পূর্ণভাবে সোজা থাকবে।

(গ) হাত সোজাভাবে দেহের দু-পাশে লেগে থাকবে।

(ঘ) হাতের আঙুল খোলা থাকবে।

(ঙ) দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে রাখতে হবে।

(২) মুসুবি দাচি (Musubi Dachi) –Open Toes Stance ঃ

(ক) শরীর সম্পূর্ণ সোজা থাকবে।

(খ) পায়ের গোড়ালি পরস্পরকে স্পর্শ করবে।

(গ) দু-পায়ের পাতা কিছুটা দূরত্বে এমনভাবে থাকবে যাতে তাদের মধ্যে ৩০°কোণ সৃষ্টি হয় (ড্রিলের সাবধান অবস্থার মতো)।

(ঘ) হাতের আঙুল খোলা অবস্থায় শরীরের দু-পাশে লেগে থাকবে।

(ঙ) দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে রাখতে হবে।

(৩) হেইকো দাচি (Heico Dachi)–Parallel Open Stance ঃ

(ক) দু-পা ১২″ ব্যবধানে অথবা নিজের কাঁধের যে চওড়া সেই পরিমাণ দূরত্বে থাকবে।

(খ) দেহের ওজন সমানভাবে দু-পায়ের উপর থাকবে (ড্রিলের বিশ্রামের মতো)।

(গ) হাত কনুই থেকে সামান্য (১৫°) ভাঙা অবস্থায় শরীরের সামনে থাকবে যা কোনোভাবে শরীরকে স্পর্শ করবে না ।

(ঘ) দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে রাখতে হবে।

(৪) উচিহাচিদাচি (Uchi Hachi Dachi)–Inverted Openleg Stance ঃ

(ক) হেইকো দাচি অবস্থা থেকে পায়ের পাতা দুটিকে শরীরের ভেতরের দিকে (১৫° বা তার সামান্য বেশি) বাঁকিয়ে আনতে হবে।

(খ) হাঁটু সামান্য ভাঙতে হবে।

(গ) দেহের ওজন সমানভাবে দু-পায়ের উপর থাকবে।

(ঘ) হাতের অবস্থান চিত্রের ন্যায় থাকবে।

(ঙ) দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে রাখতে হবে।

(এই Stance পায়ের এবং শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।)

(৫) কিবা দাচি (Kiba Dachi)–Straddle Stance ঃ

(ক) দুই পায়ের মধ্যে দূরত্ব নিজের কাঁধের মাপের ($১\frac{১}{২}$) গুণ বা ২ গুণ রাখতে হবে।

(খ) পায়ের পাতা সোজা থাকবে।

(গ) হাঁটু থেকে পা এমনভাবে ভাঙতে হবে যে উরু অঞ্চল প্রায় অনুভূমিক অবস্থানে থাকে।

(ঘ) চাপের দ্বারা হাঁটুকে বাইরের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

(ঙ) হাতের অবস্থান চিত্রের ন্যায় থাকবে।

(চ) দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে রাখতে হবে।

(৬) সেকো বা সুমো দাচি ঃ

এই দাচি একেবারেই কিবা দাচির মতো। কেবল পায়ের পাতা যা কিবা দাচিতে সোজা ছিল সেটি বাইরের দিকে (৪৫°) বা তার সামান্য বেশি নিয়ে যেতে হবে।

(৭) জেনকুতসু দাচি (Zenkutsu Dachi)–Forward Leaning Stance ঃ (ক) প্রথমে হেইকো দাচিতে দাঁড়াতে হবে। এবং সেখান থেকে একটি পা নিজের কাঁধের মাপের দ্বিগুণ দূরত্বে পিছনের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

(খ) সামনের পা হাঁটু থেকে এমনভাবে ভেঙে বসতে হবে (৪৫°) যাতে পিছনের পা একেবারে সোজা থাকে। দেহের ওজন সামনের পায়ে ৭০% থাকবে।

(গ) পায়ের হাঁটু ও পাতা একই সরলরেখায় সোজা থাকবে।

(ঘ) যে পা সামনে আছে সেই হাত শরীরের সামনের দিকে ব্লকিং অবস্থায় ও অপর হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় শরীরের পাশে আক্রমণের ভঙ্গিমায় থাকবে।

(ঙ) দেহ সোজা অবস্থায় থাকবে।

(চ) দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে থাকবে।

(৮) ককুতসু দাচি (Kokotsu Dachi)–Backward Leaning Stance ঃ

(ক) পা-দুটিকে ২½″ থেকে ৩″ সামনে-পিছনে ফাঁক করে দাঁড়াতে হবে।

(খ) পিছনের পায়ের পাতা বাইরের দিকে বার করতে হবে ৪৫° মতো ।

(গ) দেহের ওজনের ৬৫% পিছনের পায়ে নিয়ে গিয়ে হাঁটুকে সামান্য ভেঙে বসতে হবে।

(ঘ) সামনের হাঁটু ততক্ষণ ভাঙতে হবে যতক্ষণ না গোড়ালি মাটি থেকে খানিকটা উঠে যায়।

(ঙ) হাতের আঙুল খোলা অবস্থায় নিজেদের মধ্যে শক্তভাবে আবদ্ধ থাকবে।

(চ) সামনের দিকে ভি(v)-এর আকৃতিতে থাকবে। অন্য হাতটি বুকের কাছে নমস্কারের ভঙ্গিতে থাকবে।

(ছ) দৃষ্টি আঙুলের উপর দিয়ে সোজা থাকবে।

(৯) নেকো আসি দাচি –(Neko Ashi Dachi) Cat Stance ঃ

(ক) এটি Backward leaning stance ককুতসু দাচির মতো, কেবলমাত্র সামনের ও পিছনের পা আরও কাছাকাছি থাকবে। সামনের পা টেনে পিছনের পায়ের কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত আনতে হবে যতক্ষণ না সামনের পায়ের সামনের অংশ উল্লম্বভাবে অবস্থান করে।

(খ) এই দাচিতে শরীরের (৯০%) ওজন পিছনের পায়ের উপর থাকবে।

(১০) সানচিন দাচি (Sanchin Dachi)–Hourglas stance ঃ এই দাচি অনেকটা হাচি দাচির মতো, কেবলমাত্র—

(ক) পা সামনে ও পিছনে এমনভাবে থাকবে যে সামনের পায়ের গোড়ালি এবং পিছনের পায়ের বুড়ো আঙুল একই সরলরেখায় থাকবে।

(খ) পায়ের পাতাদুটি ৪৫°-র মতো শরীরের ভিতরের দিকে আনতে হবে।

(গ) হাঁটুকে সামান্য ভাঁজ করতে হবে যাতে হাঁটু ও পায়ের পাতা একই লাইনে থাকে।

(ঘ) হাত ভি (v) আকৃতিতে মুষ্টিবন্ধ অবস্থায় শরীরের সামনে থাকবে।

(ঙ) শরীর, বাহু ও পায়ের পেশির টান ভালোভাবে বজায় থাকবে।

(চ) দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে থাকবে।

এছাড়াও আরও অনেক দাঁড়াবার ভঙ্গিমা বা দাচি আছে। যেমন- কাকে দাচি, সুরি আসি দাচি, ফুজো দাচি, টেইজি দাচি, রোনোজি দাচি এবং হাচি-জি দাচি ইত্যাদি।

পা দিয়ে আক্রমণের পদ্ধতি (Geri or Keri-Kicking Techinque)

১. মাই বা ওই গেরি (Front Kick) ঃ

গেরি বা Kicking-এর কৌশল প্রধানত তিনটি ধাপে অভ্যাস করা হয়। প্রথমে হেকো দাচিতে দাঁড়াতে হবে। ইচ (এক) কাউন্টের সঙ্গে সঙ্গে —

ধাপ - ১ ডান পা ভাঁজ করে উপরে তুলতে হবে, অনেকটা সাবধান বা বিশ্রাম অবস্থায় আসার জন্য পা যেমনভাবে তুলতে হয়। ঊরু বা থাই অনুভূমিকভাবে থাকবে, এই সময় পায়ের পাতা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। এই ঝুলন্ত পায়ের পাতাকে Strech করতে হবে, অনেকটা ব্যালে নৃত্যে পায়ের পাতাকে যেমনভাবে Strech করা হয়ে থাকে তেমন।

তারপর পায়ের আঙুলগুলিকে শরীরের ভিতরদিকে টেনে আনতে হবে, কারণ এই গেরিতে আঘাত করতে হয় Toe Ball দিয়ে নি (দুই) কাউন্টের সঙ্গে।

ধাপ - ২ এই ধাপে যে পা মাটি থেকে উপরে আছে সেই পা আস্তে আস্তে সামনে খুলতে হবে। এই অবস্থায়

শরীরের ভারসাম্য রাখতে হবে, দুই পা-এর মধ্যে ৯০° বা তার সামান্য কম কোণ তৈরি করে। প্রয়োজনে যে পা মাটির সঙ্গে আছে তা হাঁটু থেকে সামান্য ভেঙে দেওয়া যায় ভারসাম্য বজায় রাখতে ।

এই অবস্থায় যে পা দিয়ে কিক করা হচ্ছে সেই হাত মুষ্টিবন্ধ অবস্থায় শরীরের সামনে থাকবে অনেকটা 'v' আকৃতিতে। অপর হাত মুষ্টিবন্ধ অবস্থায় বুকের সামনে থাকবে। দৃষ্টি প্রতিপক্ষের দিকে। আক্রমণের স্থান প্রতিপক্ষের পাকস্থলী।

ধাপ - ৩ সান (তিন) কাউন্টের সঙ্গে সঙ্গে পা ধাপ একের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এরপর পা শুরুর অবস্থায় অর্থাৎ হেকো দাচিতে আনতে হবে। এইভাবে দুই পায়েই অভ্যাস করতে হবে।

ধাপে ধাপে অভ্যাস ভালোভাবে হয়ে গেলে তিনটি ধাপকে দ্রুততার সঙ্গে এক কাউন্টে করতে হবে। মনে রাখতে হবে দ্রুত করার সময় ধাপ - ২ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ধাপে সর্বাধিক গতির প্রয়োজন এবং যত গতিতে পা সামনে নিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষকে আঘাত করতে হবে ঠিক তত গতিতেই পা ফিরিয়ে আনতে হবে। যদি প্রতিপক্ষ কোনোভাবে আক্রমণকারীর পা ধরে নিতে পারে তখন কিন্তু বিপদ আক্রমণকারীর।

২. মাওসি গেরি (Mawashi Geri-Round Kick)ঃ

এই গেরিতে পায়ের পাতার ব্যবহার হয়ে থাকে। হেকো দাচি অবস্থা থেকে দেহের পাশ দিয়ে মুখ পর্যন্ত তুলতে হবে। এই গেরি অর্ধবৃত্তাকারে গিয়ে কানের পাশে আঘাত করবে। খেয়াল রাখতে হবে আক্রমণকারী যে আঘাত মুখের পার্শ্বদেশে করবে তা যেন চেটোর ব্যবহারে হয়।

৩. চুডান বা ইওকো সোকোতো গেরি (Chudan or Yoko Sokoto Geri-Middle Level side Kick)ঃ

এই গেরি আক্রমণে পায়ের প্রান্ত বা edge-এর ব্যবহার হয়ে থাকে।

আক্রমণের স্থান প্রতিপক্ষের পাকস্থলী। দেহের পাশে হাত দিয়ে ব্লক রাখতে হবে। দৃষ্টি প্রতিপক্ষের দিকে থাকবে।

আক্রমণ প্রতিহত করার উপায় (Uke Waza Blocking Techinques)

১. চুডান উকে (Chudan Uke-Middle Level Block)ঃ

উকে যখন ডান হাত দিয়ে হবে—

(ক) বাঁহাত সামনে খোলা রাখতে হবে (ছবির মতো) এবং ডান হাত শরীরের পাশে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় থাকবে।

(খ) এই অবস্থা থেকে ডান হাতের মুষ্টিকে বাঁ কোমরে এবং বাঁহাতের মুষ্টিকে ডান কাঁধের কাছে নিয়ে আসতে হবে।

(গ) এর পর ক্রস মুভমেন্টের মাধ্যমে ধীরে ধীরে শুরুর অবস্থার ঠিক উলটো অবস্থায় আনতে হবে অর্থাৎ ডান হাত সামনে 'V' আকৃতিতে এবং বাঁ হাত শরীরের পাশে আনতে হবে।

(ঘ) এই উকে-তে হাতের Radius Bone-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

(ঙ) দাচি - হোকো দাচি ।

(চ) দৃষ্টি প্রতিপক্ষের আক্রমণের গতিপথে থাকবে।

২. জোডান উকে (Jodan Uke Upper Level Block) ঃ

চুডান জুকি যে অবস্থায় হয় ঠিক সেইভাবে দাঁড়াতে হবে।

(ক) ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতে উল্লম্বভাবে বুক ও মুখের সামনে দিয়ে কিছুটা উপরে উঠবে এবং সেখান থেকে এক ঝটকা দিয়ে হাতকে মাথার উপরে অনুভূমিক অবস্থায় আনতে হবে। চিত্রে ধাপে ধাপে দেখানো হলো।

(খ) এই Uke-তে হাতের Ulna Bone-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

(গ) দাচি—হেকো দাচি।

(ঘ) দৃষ্টি আক্রমণকারীর আক্রমণের গতিপথে থাকবে।

৩. গেডান-বরায় (Gedan Barai-Lower Level Block) ঃ

চুডান জুকি যে অবস্থায় হয় ঠিক সেইভাবে দাঁড়াতে হবে।

(ক) ডান হাতের মুষ্টিকে ধীরে ধীরে বাঁ কাঁধের কাছে আনতে হবে এবং বাঁহাতের মুষ্টিকে ডান হাতের কনুই-এর কাছে আনতে হবে।

(খ) এই অবস্থা থেকে ডান হাতকে খুব দ্রুতগতিতে শরীরের তলপেটের (Lower abdomen) সামনে আনতে হবে এবং বাঁহাত মুষ্টিবন্ধ অবস্থায় শরীরের পাশে আসবে।

(গ) এই উকেতে হাতের Ulna Bone-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

(ঘ) দাচি—হেকো দাচি।

(ঙ) দৃষ্টি প্রতিপক্ষের আক্রমণের গতিপথে রাখতে হবে।

৪. সুটো উকে (Shuto Uke-Knife Hand Block) ঃ

চুডান জুকি যে অবস্থায় হয় ঠিক সেইভাবে দাঁড়াতে হবে। এই ব্লকের ক্ষেত্রে হাতের আঙুল খোলা অবস্থায় রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে খোলা থাকলেও আঙুল যেন একে অপরের থেকে আলাদা না হয়ে যায়।

(ক) ডান হাতের তালুকে বাঁ কাঁধের কাছে আনতে হবে। বাঁহাতের তালু ডান কনুই-এর কাছে আনতে হবে। এইখান থেকে খুব দ্রুত ডান হাতকে শরীরের পাশে খোলা অবস্থায় ‘v’ আকৃতিতে আনতে হবে। এবং বাঁহাত খোলা অবস্থায় শরীরের পাশে আসবে।

(খ) এই uke-তে হাতের Ulna Bone-এর প্রয়োগে হয়ে থাকে।

(গ) দাচি — হেকো দাচি।

(ঘ) দৃষ্টি প্রতিপক্ষের আক্রমণের গতিপথে থাকবে।

এছাড়াও আরও অনেক দাঁড়াবার ভঙ্গিমা বা দাচি আছে। যেমন— কাকে দাচি, সুরিআসি দাচি, ফুতো দাচি, টেইজি দাচি, রেনোজি দাচি, হাচি -জি দাচি ইত্যাদি। এখানে কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় দাচিগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

নবম অধ্যায়

দলগত ক্রীড়া

৯.১.১ কবাডি

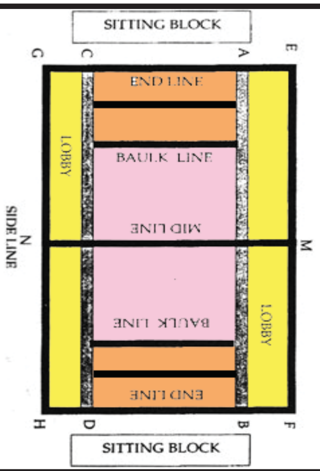

কবাডি ভারতের একটি জনপ্রিয় খেলা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই খেলাটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে এই খেলাটির নাম চি-ডু-গু-ডু, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাটে হু-টু-টু, কেরলে ওয়ান্ডিকালি, উত্তর ভারতে কবাডি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে হা-ডু-ডু নামে পরিচিত।

নামের ক্ষেত্রে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি খেলার নিয়মকানুনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নিয়ম প্রচলিত ছিল। খেলার প্রসার ও প্রচার যত বেড়েছে, তেমনি বিভিন্ন সময়ে ধাপে ধাপে এই খেলার নিয়মকানুনগুলি পরিমার্জিত হয়ে বর্তমানে কবাডি খেলাটি একটি আধুনিক রূপলাভ করেছে। এই খেলার উন্নতিকল্পে ১৯৫২ সালে গঠিত হয়েছিল All India Kabaddi Federation। পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে এই সংস্থার নতুন নামকরণ হয় Amature Kabaddi Federation of India, যা বর্তমানে ভারতে কবাডির নিয়ন্ত্রক সংস্থা। কবাডি খেলা ভারতের জাতীয় খেলা। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে ভারতীয় দল একটি অভিপ্রদর্শনী কবাডি খেলা প্রদর্শন করে অসামান্য খ্যাতিলাভ করে। ১৯৫৯ সালে School Games Federation of India তাদের ক্রীড়াসূচিতে কবাডিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

কবাডি খেলার কিছু তথ্য

খেলোয়াড়ের সংখ্যা ঃ প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় থাকে। ৭ জন খেলায় অংশগ্রহণ করে। কোনো দলে কমপক্ষে ৭ জন খেলোয়াড় না থাকলে সেই দল খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। ৫ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় Time out বা বিরতির সময় পরিবর্তন করা যায়। পরিবর্তিত খেলোয়াড়কে পুনরায় পরিবর্তন করা যায়। তবে বাতিল বা বহিষ্কৃত খেলোয়াড়ের পরিবর্তে কোনো পরিবর্তন হয় না।

খেলার সময়সীমা ঃ পুরুষ ও জুনিয়ার বালকদের খেলার সময়সীমা হলো— ২০ মিনিট + ৫ মিনিট (বিরতি) + ২০ মিনিট = ৪৫ মিনিট। বাকি সব বিভাগের ক্ষেত্রে —১৫ মিনিট + ৫ মিনিট (বিরতি) + ১৫ মিনিট = ৩৫ মিনিট। তবে প্রত্যেক অর্ধের শেষ আক্রমণ শুরু হওয়ার পর নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলেও ওই দম বা আক্রমণ শেষ করার সুযোগ দিতে হবে।

খেলার শুরু ঃ খেলার শুরুতে রেফারি দুই দলের অধিনায়কের উপস্থিতিতে টস করবেন। টসে বিজয়ী দল কোর্ট অথবা দম নেবে। দ্বিতীয়ার্ধে কোর্টের পরিবর্তন হয়। প্রথম অর্ধে যে দল দম শুরু করেছিল, দ্বিতীয়ার্ধে তার বিপক্ষ দল দম শুরু করবে।

দম ঃ বিরামহীন একটানা স্পষ্ট এবং এক দমে কবাডি-কবাডি ধ্বনি উচ্চারণ করাকে বলে দম দেওয়া। কবাডি ধ্বনি উচ্চারণে কোনো অস্পষ্টতা বা একাধিকবার শ্বাসগ্রহণ করলে তাকে দম হারানো বলে। তখন আক্রমণকারী আউট হয়। দম নিজের কোর্ট থেকে শুরু করতে হয় এবং আক্রমণ শেষে নিজের কোর্ট স্পর্শ করার পর দম ছাড়তে হয়। একে ‘ডাক নিয়ে যাওয়া’ও বলে।

আক্রমণকারী (Raider) ঃ কোনো দলের কোনো খেলোয়াড় যখন দম নিয়ে মধ্যরেখা পার হয়ে বিপক্ষ দলের ঘরে প্রবেশ করে তখন তাকে বলা হয় আক্রমণকারী। যাদের ঘরে আক্রমণকারী দমসহ প্রবেশ করে তাদেরকে তখন বলা হয় প্রতিরক্ষকারী (Anties)।

ধস্তাধস্তি (Struggle) ঃ আক্রমণকারী এবং প্রতিরক্ষাকারী একে অপরকে স্পর্শ করলে বা ধরলে তাকে বলে ধস্তাধস্তি।

বাকলাইন অতিক্রম (To cross the Baulk Line) ঃ আক্রমণকারী দমসহ মধ্যরেখা ও বাকলাইনের মধ্যবর্তী ভূমির স্পর্শ ত্যাগ করে বাকলাইন ও প্রান্তরেখার মধ্যবর্তী ভূমির সংস্পর্শে আসলে তখন বাকলাইন অতিক্রম করা হয়েছে বলে ধরা হয়। আক্রমণকারীকে আক্রমণে গিয়ে বাকলাইন অতিক্রম করতেই হবে, নতুবা কোনো প্রতিরক্ষাকারীকে স্পর্শ করে আসতে হবে। যদি এই দুটি কাজের একটিও না হয় (অর্থাৎ বাকলাইন অতিক্রম নতুবা প্রতিরক্ষাকারীকে স্পর্শ) তবে আক্রমণ অসফল বলে গণ্য হবে। সেই ক্ষেত্রে আক্রমণকারী আউট হবে।

বোনাস লাইন অতিক্রম (To cross the Bonus Line) ঃ দমসহ কোনো আক্রমণকারী মধ্যরেখা এবং বোনাস লাইনের মধ্যবর্তী ভূমির স্পর্শ ত্যাগ করে বোনাস লাইন এবং প্রান্তরেখার মধ্যবর্তী ভূমির সংস্পর্শে আসলে বোনাস লাইন অতিক্রম করা হয়েছে বলে ধরা হয়। প্রতিরক্ষাকারী দলের কোর্টে ন্যূনতম ৬ জন খেলোয়াড় থাকলে, বোনাস লাইন অতিক্রম করলে একটি বোনাস পয়েন্ট অর্জন করা হয়। বোনাস লাইন অতিক্রম করার পর আক্রমণকারী দম শেষ করলে আম্পায়ার বোনাস পয়েন্ট ঘোষণা করবেন। বোনাস লাইন অতিক্রম করার পর আক্রমণকারী যে কজন প্রতিরক্ষাকারীকে আউট করবে, বোনাস পয়েন্টের সঙ্গে সেই অতিরিক্ত পয়েন্ট যোগ হবে। তবে বোনাস লাইন অতিক্রম করার সময় ধরা পড়লে বোনাস পয়েন্ট হবে না। সেইক্ষেত্রে আক্রমণকারী আউট হবে। প্রতিরক্ষাকারী দলের কাউকে আউট করার পর বা ধস্তাধস্তির পর আর বোনাস পয়েন্ট হয় না। বোনাস পয়েন্টের জন্য খেলোয়াড় পুনরুজ্জীবন লাভ করে না। বাতিল বা বহিষ্কৃতির কারণে কোনো দল কমসংখ্যক খেলোয়াড় নিয়ে খেললে বোনাসের সময় ওই কয়জন কোর্টে আছে ধরে নিয়ে খেলা হবে।

টাইম আউট (Time out) ঃ খেলা চলার সময় প্রত্যেক দল প্রতি অর্ধে দুইবার টাইম আউট নিতে পারে। প্রতিটি টাইম আউটের সময় ৩০ সেকেন্ড। টাইম আউটের জন্য ব্যয়িত সময় সেই অর্ধের সময়ের সঙ্গে যোগ হবে। এই সময় খেলোয়াড় পরিবর্তন হয়। এছাড়া খেলোয়াড় আহত হলে বা অন্য কারণে খেলা প্রতিহত হলে রেফারি টাইম আউট ঘোষণা করতে পারেন। একে অফিশিয়াল টাইম আউট বলে। অফিশিয়াল টাইম আউটের সময় খেলোয়াড় পরিবর্তন হয় না।

পয়েন্ট (Point) ঃ খেলা চলাকালীন কোনো দলের প্রতি খেলোয়াড় আউট হওয়ার জন্য বিপক্ষ দল একটি করে পয়েন্ট পাবে। কোনো দলের সমস্ত খেলোয়াড় যখন আউট হবে তখন বিপক্ষ দল অতিরিক্ত দুই পয়েন্ট পাবে। একে লোনা পয়েন্ট বলে। লোনার জন্য অতিরিক্ত দুই পয়েন্ট এবং শেষবারে যতজন আউট হয়েছিল তত পয়েন্ট যুক্ত হবে। খেলার শেষে যে দল বেশি পয়েন্ট অর্জন করবে সেই দল বিজয়ী হবে।

টেকনিক্যাল পয়েন্ট (Technical Point) ঃ আম্পায়ার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো দলের বিরুদ্ধে টেকনিক্যাল পয়েন্ট দিতে পারেন। যেমন—

১. নিজের ঘর থেকে দম শুরু না করে বিপক্ষ দলের ঘরে প্রবেশের পর দম শুরু করলে আম্পায়ার তাকে ঘরে ফিরিয়ে দেবেন এবং বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবেন।

২. আক্রমণে যাওয়ার পালা না হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো আক্রমণকারী আক্রমণে যায়, তবে রেফারি তাকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবেন।

৩. একসঙ্গে একজনের বেশি আক্রমণকারী যদি আক্রমণে যায় তবে রেফারি তাদের সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবেন।

৪. একজন আক্রমণকারী সঠিকভাবে কবাডি ধ্বনি উচ্চারণ না করে দম দিলে রেফারি তাকে নিজের কোর্টে ফিরিয়ে দিয়ে বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবেন।

৫. এক দলের ডাকের শেষ হওয়ার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে যদি অন্য দল দম নিয়ে ডাকে না যায় তবে তারা দম দেওয়ার সুযোগ হারাবে এবং রেফারি তাদের বিরুদ্ধে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবেন।

৬. লোনার পর দশ সেকেন্ডের মধ্যে কোর্টে প্রবেশ না করলে রেফারি বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবেন।

৭. রেফারি কর্তৃক সতর্কিত হওয়ার পরও আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় কোনো নির্দেশ দিলে তার বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবেন।

সীমান্তরেখার বাইরের ভূমি স্পর্শ করা ঃ

ধস্তাধস্তির সময় 'লবি' ব্যবহার হয় এটি মাঠের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একজন খেলোয়াড়ের শরীরের কোনো অংশ সীমান্তরেখার বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে সে আউট হবে। তবে ধস্তাধস্তির সময় এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। ধস্তাধস্তির সময় খেলোয়াড় বাইরের ভূমি স্পর্শ করলেও যদি তার শরীরের কোনো অংশ সীমান্তরেখার

ভিতরে থাকে তবে সে আউট হবে না। যদি কোনো প্রতিরক্ষাকারী সীমান্তরেখার বাইরের ভূমি স্পর্শ করার কারণে আউট হয় তবে রেফারি সেই খেলোয়াড়ের নাম্বার উল্লেখ করে তাকে আউট ঘোষণা করবেন। সেই সময় কোনো বাঁশি বাজানো হবে না এবং সেই আউট হওয়া খেলোয়াড় আক্রমণকারীকে ধরতে পারবে না। যদি ধরে বা ধরতে সাহায্য করে তবে আক্রমণকারী আউট হবে না।

বিপক্ষ দলের কোর্ট স্পর্শ করে ধরা ঃ

প্রতিরক্ষাকারী দলের কোনো খেলোয়াড় আক্রমণকারীর দম দেওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণকারীর ঘরের ভূমি স্পর্শ করতে পারবে না। যদি কেউ এইরকম করে তবে আউট হবে এবং বিপক্ষ দল পয়েন্ট পাবে। এইভাবে আউট হওয়া খেলোয়াড় আক্রমণকারীকে ধরতে পারবে না। যদি ধরে বা ধরতে সাহায্য করে তবে আক্রমণকারী আউট হবে না।

আউট হওয়া খেলোয়াড়ের কোর্টে পুনঃপ্রবেশ ঃ

কোনো দলের খেলোয়াড়েরা আউট হলে ক্রমানুসারে সিটিং বক্সে বসবে এবং বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় আউট হলে পরিবর্তে সেই ক্রমানুসারে নিজের কোর্টে প্রবেশ করবে।

বিরতির পর খেলা শুরুর পদ্ধতি ঃ

প্রথমার্ধের পর প্রত্যেক দলে যে কজন খেলোয়াড় কোর্টে থাকবে, বিরতির পর সেই কজন খেলোয়াড় নিয়ে খেলা শুরু হবে। কোর্টের দিক পরিবর্তন হবে। প্রথমার্ধে যে দল দম দিয়ে খেলা শুরু করেছিল দ্বিতীয়ার্ধে তার বিপক্ষ দল দম দিয়ে খেলা শুরু করবে।

নিম্নলিখিত আচরণগুলি ফাউল-এর পর্যায়ে পড়ে।

১। বিচারকদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বললে।

২। বিচারকদের উদ্দেশ্য করে কোনো অপমানজনক মন্তব্য করলে।

৩। কোনো সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য বিচারকদের উদ্দেশ্যে হাত বা অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

৪। আক্রমণকারীর মুখ বা গলা টিপে ধরে দম বন্ধ করার চেষ্টা করলে।

৫। কাঁচি দিয়ে ধরা বা অন্য কোনো হিংসাত্মক কৌশলে আঘাত করার চেষ্টা করলে।

এইসব কারণে রেফারি ও আম্পায়ার খেলোয়াড়দের সতর্ক করতে পারেন, ম্যাচ থেকে বহিষ্কার করতে পারেন বা প্রতিযোগিতা থেকেও বহিষ্কার করতে পারেন।

ফলাফল (Result) ঃ খেলা শেষে যে দল বেশি পয়েন্ট পায় সেই দল জয়ী হবে। লিগ খেলায় যে দল জয়ী হয় সেই দল দুই পয়েন্ট, পরাজিত দল শূন্য পয়েন্ট পায়। খেলা ড্র হলে প্রত্যেক দল সমান সমান পয়েন্ট পায়। নকআউট প্রথায় খেলা ড্র হলে টাই ভাঙার পদ্ধতি হলো নিম্নরূপ।

উভয় দল সাত জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলবে। তাদের মধ্যে প্রত্যেক দল পাঁচ জন করে আক্রমণকারীর নাম রেফারির কাছে জমা দেবে। এই সময় কোনো খেলোয়াড় পরিবর্তন হয় না। খেলা শুরুর প্রথমে যে দল দম দিয়েছিল সেই দল প্রথম দম দিয়ে খেলা শুরু করবে। এই সময় বাকলাইনই বোনাস লাইন হিসাবে ধরা হয়। অর্থাৎ আক্রমণকারী বাকলাইন অতিক্রম করলেই একটি বোনাস পয়েন্ট পাবে। এই সময় খেলোয়াড় আউট হলে মাঠের বাইরে যাবে না। প্রত্যেক দলের নির্দিষ্ট ৫টি-৫টি আক্রমণের পরেও যদি খেলা ড্র থাকে তখন গোল্ডেন রেইড নিয়মে খেলার নিস্পত্তি হবে। গোল্ডেন রেইডে নতুন করে টস হবে। টসে জয়ী দল প্রথমে দম দেবে। যে দল প্রথম পয়েন্ট (Leading point) পাবে, সেই দল বিজয়ী হবে।

কবাডি খেলার বিভিন্ন কলাকৌশল

অন্যান্য দলগত খেলার মতো কবাডি খেলার কলাকৌশলেও দুটি ভাগ— (১) আক্রমণাত্মক কৌশল (Offensive skill) এবং (২) রক্ষণাত্মক কৌশল (Defensive skill)। কবাডি খেলার দুটি প্রধান বিষয় 'মারা' অর্থাৎ আক্রমণ এবং 'ধরা' বা প্রতিরক্ষা। খেলা শুরু হলে একদল সমবেতভাবে প্রতিরক্ষাব্যূহ তৈরি করে এবং বিপক্ষ দলের একজন তাদের ঘরে আক্রমণ করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষাপর্ব চলবে।

আক্রমণাত্মক কৌশল ঃ

খেলা শুরুর পর কোনো দলের একজন দম (Cant) নিয়ে মধ্যরেখা অতিক্রম করে বিপক্ষদলের ঘরে প্রবেশ করে। তখন তাকে বলে আক্রমণকারী বা Raider। কবাডি খেলায় রেইডারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। একজন রেইডার একক প্রচেষ্ঠায় এবং তার কলাকৌশলের দ্বারা সমবেত প্রতিরক্ষা ভেঙে এক বা একাধিক পয়েন্ট সংগ্রহ করে। আক্রমণকারী বিপক্ষকে আউট করার জন্য তার হাত বা পা বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তার ক্ষিপ্রতা, সক্ষমতা, প্রতিক্রিয়া সময় ইত্যাদি। হাত বা পা ব্যবহারের নানারকম কৌশল আছে। যেমন ঃ

হাত বাড়িয়ে মারা বা ছোঁয়া — বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের অবস্থানের উপর নজর রেখে এগিয়ে থাকা খেলোয়াড়ের শরীরের যে-কোনো অংশকে হাত লম্বা করে বাড়িয়ে দিয়ে স্পর্শ করার পর শরীর ঘুরিয়ে মধ্যরেখার দিকে নিয়ে যেতে হবে। আবার প্রতিরক্ষাকারী দল আক্রমণকারীকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলে তখন আক্রমণকারী হাত দিয়ে ঠেলে দিয়ে ঘুরে নিজের কোর্টে পালিয়ে আসবে। হাত দিয়ে ছোঁয়া বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন —

(১) দৌড়োনো অবস্থায় হাত স্পর্শ করা ঃ স্বাভাবিক দৌড়োনো অবস্থায় কর্নার এবং দ্বিতীয় খেলোয়াড়-এর কাঁধকে লক্ষ্য করে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। এই অবস্থায় সাবধান হতে হবে স্পর্শ করার আগে যেন 'লবিতে' প্রবেশ না করে এবং 'চেইন'-এ প্রবেশ না করে। সামনের পায়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করে মধ্যরেখার দিকে ঘুরে যেতে হবে।

(২) হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা ঃ আকস্মিকভাবে সামনে অথবা পাশে ঝুঁকে দূরত্ব কমিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে হবে। সাবধান হতে হবে যাতে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় হাত ধরে ফেলতে না পারে এবং প্রতিরক্ষণকারীদের লক্ষ রাখতে হবে যাতে তারা শিকলে ঘিরে ফেলতে না পারে।

(৩) হাত ঘুরিয়ে মোর করা ঃ একই দিকে আক্রমণ সব সময় সফল হয় না। এই জন্য কোনো একদিকে যেতে যেতে হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে দ্বিতীয় অথবা কর্নারের খেলোয়াড়কে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে হবে। এক্ষেত্রে সাবধান হতে হবে যাতে বিপক্ষ দল শিকলে ধরা বা কোমর ধরতে না পারে। তবে বারবার এই পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত নয়, তা হলে প্রতিরক্ষাকারীর ফাঁদে পড়তে হবে।

(৪) ধোঁকা দিয়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করা ঃ সফলভাবে যে-কোনো পদ্ধতির ভান করে ক্ষিপ্রতার সহিত হাত চালিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে। ভান করে প্রতিরক্ষাকারীদের ধোঁকা দিয়ে হাতের নাগালে নিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে খুব সহজে স্পর্শ করা যায়।

পায়ের আঙুল দিয়ে মারা ঃ আক্রমণকারীর খুব সহজাত পদ্ধতি এই পায়ের আঙুল দিয়ে মারা বা স্পর্শ করা। হঠাৎ করে পায়ের পাতা বাড়িয়ে দিয়ে আঙুল সোজা রেখে প্রতিরক্ষাকারীকে স্পর্শ করবে। এই সময় শরীরের ওজন অন্য পায়ের উপর রাখতে হবে। কাঁধের লাইন এবং গতি মধ্যরেখার দিকে রাখতে হবে। শরীরের ভারসাম্য রক্ষার জন্য হাত দুটো পাশে কনুইতে ভেঙে থাকবে। হাঁটু এবং গোড়ালি-সন্ধিকে প্রসারিত করে পায়ের দৈর্ঘ্যকে বৃদ্ধি করে স্পর্শ করার চেষ্টা করবে। দ্রুত পা সরিয়ে আনতে হবে, না হলে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়েরা গোড়ালি ধরে ফেলতে পারে।

(১) গোড়ালি দিয়ে স্পর্শ করে মোর করা ঃ একজন আক্রমণকারী একই প্রচেষ্টায় দুই জন প্রতিরক্ষাকারীকে ছোঁয়ার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রতিরক্ষাকারীর মধ্যে অথবা কর্নার এবং দ্বিতীয়-র মধ্যে পাশাপাশি পা চালিয়ে আক্রমণ করতে হবে।

(২) ধোঁকা দিয়ে গোড়ালি স্পর্শ করা ঃ শরীরের উপরের অংশ, বিশেষ করে হাত দিয়ে এমনভাবে আক্রমণের ভান করবে যাতে প্রতিরক্ষাকারী ধোঁকা খেয়ে যাবে। এর ফলে দূরত্ব কমে গেলে দ্রুততার সঙ্গে পা চালিয়ে কভার অথবা কর্নার-এর খেলোয়াড়কে পায়ের পাতা দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে।

(৩) দৌড়ে গোড়ালি স্পর্শ করা ঃ আক্রমণকারী যখন দ্বিতীয় থেকে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষাকারীকে খেলে হঠাৎ করে দিক পরিবর্তন করে কর্নার অথবা কভার-এর প্রতিরক্ষাকারীকে স্পর্শ করে, তখন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

বসে পা ঘুরিয়ে মোর করা ঃ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় যখন অনেকটা ভিতরে খ্যালে তখন আক্রমণকারী শরীরকে বসা অবস্থানে নিয়ে এসে নিকটবর্তী পা দ্রুত ছুড়ে দিয়ে প্রতিরক্ষাকারীর পায়ের পাতা ছোঁয়ার চেষ্টা করতে হবে। বিপরীত পায়ের উপর এবং বিপরীত হাতের উপর দেহের ভর রাখতে হবে। দৃষ্টি এবং দেহের সামনের অংশ মধ্যরেখার দিকে রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে আক্রমণকারী পা পাশের দিকে প্রসারিত করে দু-ভাবে আক্রমণে যায়। আক্রমণ শেষে দ্রুত পা মধ্যরেখার দিকে নিয়ে আসতে হবে। স্লিম রেইডার-এর পক্ষে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সহজ হয়।

কিকিং ঃ কিকিং হলো পা বাতাসে ছুড়ে দিয়ে আক্রমণকারীর স্পর্শ করার পদ্ধতি। যখন প্রতিরক্ষাকারী দল বাকলাইন-এ খ্যালে বা প্রতিরক্ষাকারীর সংখ্যা কমে যায়, তখন এই পদ্ধতিতে সুফল পাওয়া যায়। কিক বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন —

(১) ব্যাক কিক — কোনো প্রতিরক্ষাকারী যদি পিছনে এসে পড়ে তখন রেইডার এক-পায়ের উপর দেহের ভারসাম্য রেখে অন্য পা দ্রুততার সঙ্গে পিছনের দিকে শূন্যে ছুড়ে প্রতিপক্ষকে আউট করার চেষ্টা করবে। এই সময় কাঁধের রেখা থাকবে মধ্যরেখার দিকে। শরীরের উপরের অংশ ঝুঁকে থাকবে। তবে অন্য প্রতিপক্ষকে লক্ষ রাখতে হবে। কিক শেষে পা দ্রুত মধ্যরেখা-র দিকে নিয়ে আসতে হবে।

(২) পাশের দিকে পা ছুড়ে আক্রমণ — আক্রমণকারী যখন দ্বিতীয় থেকে দ্বিতীয় এইভাবে আক্রমণ চালায় তখন সেন্টার জোন-এর প্রতিরক্ষাকারীগণকে পাশের দিক থেকে পা ছুড়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করবে। এক-পায়ের উপর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে অন্য পা দ্রুততার সঙ্গে ছুড়ে প্রতিপক্ষকে আউট করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে রেইডারের মুখ পার্শ্বরেখার দিকে রাখতে হবে।

(৩) কভার কিক — আক্রমণকারী যখন সেন্টার জোন-এ খেলবে তখন কর্নার জোন-এর প্রতিরক্ষাকারীকে আক্রমণ করার জন্য এই পদ্ধতি নিতে হবে। আক্রমণকারী দ্রুত পা পাশে তুলে পা পিছন থেকে পাশে বা পাশের থেকে পিছনের দিকে বাঁকিয়ে কিক নিতে হবে। এই কিক থেকে পয়েন্ট না আসলেও প্রতিপক্ষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়।

পিছু ধাওয়া করা ঃ পিছু ধাওয়া করা একধরনের আগ্রাসী আক্রমণ। কবাডি খেলার নিয়মানুসারে একজন আক্রমণকারীর দম শেষ হওয়ার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে বিপক্ষ দলকে দম দিতে হয়। এই নিয়মের সুযোগ নিয়ে প্রতিরক্ষাকারী দল যত দ্রুত সম্ভব দম শুরু করতে পারে। পিছু ধাওয়া করবার পদ্ধতি একটি অত্যন্ত কার্যকরী ব্যক্তিগত কৌশল, যার সাহায্যে প্রতিপক্ষের অত্যন্ত মূল্যবান আক্রমণকারীকে আউট করার ফলে খেলার চরিত্র বদলে যেতে পারে।

পিছু ধাওয়া করার উপযুক্ত সময় ঃ

যখন আক্রমণকারী অসাবধানভাবে এবং খুব ধীরে নিজের কোর্টে ফেরে তখন বিপক্ষ দলের দিকে তার পিঠ থাকবে অথবা প্রতিরক্ষাকারীর দিকে না তাকিয়ে দম শেষ করে। আবার অনেক সময় একজন ভালো আক্রমণকারী খুব সহজে একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলে সে তখন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে এবং ঠিকভাবে কোর্টে ফেরার পদ্ধতি গ্রহণ করে না। তখন তাকে পিছু তাড়া করলে মোর করা সহজ হয়।

দুইভাবে পিছু ধাওয়া করা যায় —

(১) সোজাসুজি পিছু ধাওয়া করা ঃ সাধারণত কর্নার জোন-এর খেলোয়াড় সোজাসুজি পার্শ্বরেখার সমান্তরালভাবে পিছু তাড়া করে। এইভাবে পিছু তাড়া করে বিপক্ষ দলের কোর্টে বেশি ভিতরে প্রবেশ করা ঠিক নয়। তাহলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

(২) কোনাকুনি পিছু ধাওয়া করা ঃ এই পদ্ধতিতে এগিয়ে থাকা যে-কোনো প্রতিরক্ষাকারী দ্রুত পিছু ধাওয়া করতে পারে। এই পদ্ধতিতে হাত বা পা দিয়ে আক্রমণ করে সহজে দিক পরিবর্তন করে মধ্যরেখার দিকে ফিরে আসা যায়।

রক্ষণাত্মক কৌশল

বিপক্ষ দলের আক্রমণকারীকে ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকার রক্ষণাত্মক কৌশল অবলম্বন করা হয়। সাধারণত রক্ষণ পদ্ধতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। ব্যক্তিগত রক্ষণ, শিকল পদ্ধতি এবং দলগত, এই তিনভাবে আক্রমণকারীকে ধরা হয়।

বিভিন্ন প্রকার ব্যক্তিগত রক্ষণ

গোড়ালি ধরা ঃ কর্নার জোন-এ খেলা প্রতিরক্ষাকারীরা গোড়ালি ধরে নেওয়ার বেশি সুযোগ পায়। পা লম্বালম্বিভাবে ছুড়ে মারলে বা পা ক্ষণিকের জন্য স্থির রেখে দাঁড়ালে,

অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে প্রতিরক্ষাকারী একটা পদক্ষেপ এগিয়ে তার সামনের পা আক্রমণকারীর পায়ের পাশে নিয়ে যাবে এবং দুই হাতে গোড়ালি ধরার পর প্রতিরক্ষাকারীকে এক-পা পিছনের দিকে সরে আসতে হবে এবং আক্রমণকারীর যে পা ধরা হয়েছে সেই পা যতদূর সম্ভব উপরের দিকে তুলে ধরতে হবে। এর ফলে আক্রমণকারী এবং মধ্যরেখার মধ্যে দূরত্ব বাড়বে। আক্রমণকারী ভারী এবং লম্বা হলে অন্য প্রতিরক্ষাকারীগণকে তার মুখ এবং দেহকাণ্ডকে পার্শ্বরেখার দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে আক্রমণকারী মধ্যরেখা স্পর্শ করতে না পারে।

উরু ধরা ঃ শুধুমাত্র কর্নার বা কভার-এর খেলোয়াড় নয়, অন্য সহকারী খেলোয়াড়ও ব্যক্তিগতভাবে থাই বা উরু ধরতে পারে। আক্রমণকারী যখন অসাবধানভাবে এক জোন থেকে অন্য জোনে ছুটবে সেই সময় রেইডারের পা প্রতিরক্ষাকারীর নাগালের মধ্যে আসামাত্র প্রতিরক্ষাকারী তার সামনের পা আক্রমণকারীর দুই পায়ের মাঝে নিয়ে আসবে, মাথাকে আক্রমণকারীর কোমর বরাবর নিয়ে আসবে এবং একটা হাতকে উরুর নীচে দিয়ে কনুই ভেঙে জড়িয়ে ধরতে হবে। অন্য হাত দিয়ে গোড়ালি ধরতে হবে।

কোমর ধরা ঃ আক্রমণকারী যখন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের দিকে পিছন ফিরে দম দেয় বা পিছন ফিরে আক্রমণ করে সেই সময় কোমরের পিছন থেকে জাপটে ধরা হয়। এই ধরা খুব মজবুত হয়। বেশ শক্তভাবে ধরার পর হালকা আক্রমণকারী হলে তাকে মাটি থেকে উপরে তুলে ফেলতে হবে। আক্রমণকারী যদি ভারী হয়, অন্য প্রতিরক্ষাকারীরা তার গতিমুখ পার্শ্বরেখার দিকে ঘুরিয়ে দেবে, যাতে আক্রমণকারী মধ্যরেখার দিকে যেতে না পারে। প্রতিরক্ষাকারী তার পিছনের পা ভাঁজ করে আক্রমণকারীকে নিয়ে যদি পিছনের দিকে পড়ে যায় তা হলেও মধ্যরেখা থেকে দূরত্ব বেড়ে যাবে।

আক্রমণকারী কখনও যদি দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে রেখে দম দেয় তখন কবজি ধরা যায়। সাধারণত কমসংখ্যক প্রতিরক্ষাকারী থাকলে আক্রমণকারী অনেক গভীরে ঢুকে পড়ে এবং বেশ আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে হাত বাড়িয়ে থাকে। প্রতিরক্ষাকারীকে তখন শিকল ছেড়ে দিয়ে মজবুত মুষ্টিবদ্ধভাবে কবজি ধরতে হবে। শরীরের ওজন পিছনের দিকে রেখে আক্রমণকারীকে প্রান্তরেখার দিকে টেনে রাখতে হবে।

গোড়ালি ও হাঁটু ধরা ঃ কমসংখ্যক প্রতিরক্ষাকারী থাকলে আক্রমণকারী শুধুমাত্র গোড়ালি ধরার সময় টেনে মধ্যরেখার কাছে চলে আসতে পারে। তাই গোড়ালি ধরে নেওয়ার পর একটা হাত হাঁটুসন্ধির নীচে নিয়ে আসতে হবে এবং কনুই ভাজ করে মজবুতভাবে হাত দিয়ে ধরার পর আক্রমণকারীর পা মাটি থেকে উপরের দিকে তুলে ধরতে হবে। এতে আক্রমণকারী ভারসাম্য হারাবে।

ব্লকিং ঃ কর্নার ও কভার-এর প্রতিরক্ষাকারী খেলোয়াড় ব্লকিং-এ অংশ নেয়। আক্রমণকারী যখন কর্নারে খুব ভিতরে প্রবেশ করে এবং খুব ভিতর দিয়ে মধ্যাঞ্চলে প্রবেশ করে তখন আক্রমণকারীর গতিপথে দেয়াল তুলে দাঁড়াতে হবে। দুই হাতে আক্রমণকারীকে আটকাবে। কনুই ভাঁজ করে সামনের পায়ে জোর রাখতে হবে। শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে আক্রমণকারীকে ঠেলে রাখতে হবে। এই ব্লকিং এককভাবে যেমন করা যায় তেমনি আবার যুগ্মভাবেও করা যায়।

শিকল পদ্ধতি ঃ কবাডি খেলার রক্ষণাত্মক কৌশলের মধ্যে শিকল পদ্ধতিতে খেলার বিশেষ সুবিধা আছে। ব্যক্তিগত কৌশল ও দলগত কৌশলের সমন্বয়ে আক্রমণকারী খেলোয়াড়কে ধরবার ক্ষেত্রে শিকল পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এই পদ্ধতিই সর্বশ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন ধরনের শিকল পদ্ধতি হয়ে থাকে।

(১) সাতজনের এক শিকলে খেলা ঃ খেলার শুরুতে যখন সাত জন খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে থাকে তখন ২-৩-২ পদ্ধতিতে শিকল তৈরি করে খেলতে হবে। মাঝখানের তিনজন খেলোয়াড় পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরবে এবং এদের দু-পাশের যে দুজন খেলোয়াড় থাকবে তারা দুজন পরস্পরের হাত শক্ত করে ধরে রাখবে। আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের গতিবিধি অনুসারে প্রতিটি শিকলের খেলোয়াড়কে একইসঙ্গে ওঠানামা করতে হবে। হাত শক্ত করে ধরে দৃষ্টি আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের দিকে রাখতে হবে।

(২) যখন রক্ষণকারী দলের ৬জন খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে থাকবে তখন ২-২-২ পদ্ধতিতে শিকলে খেলতে হবে। দুজন দুজন করে খেলোয়াড়কে হাত ধরে শিকল তৈরি করে দলগঠন করে আক্রমণকারী খেলোয়াড়টিকে ধরে 'মোর' করার চেষ্টা করতে হবে।

(৩) খেলা চলাকালীন রক্ষণকারী দলের ৫জন খেলোয়াড় যখন মাঠে থাকবে তখন ১-৩-১ পদ্ধতিতে খেলতে হবে। মাঝখানের তিনজন খেলোয়াড়কে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরতে হবে। আবার দু-পাশের দুজন খেলোয়াড়কে আক্রমণকারী খেলোয়াড়ের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে ওঠানামা করতে হবে। এছাড়া ২-১-২ শিকলেও খেলা যেতে পারে।

(৪) খেলা চলাকালীন রক্ষণকারী দলের ৪জন খেলোয়াড় যখন মাঠে থাকবে তখন ১-২-১ পদ্ধতিতে খেলতে হবে।

(৫) যখন মাঠে তিনজন রক্ষণকারী খেলোয়াড় থাকবে তখন ১-১-১ পদ্ধতিতে খেলতে হবে। এই অবস্থায় কেউ কারোর হাত ধরবে না, সুবিধামতো নিজেদের স্থান পরিবর্তনের জন্য।

শিকল পদ্ধতিতে হাত ধরবার পদ্ধতি ঃ দুই প্রান্তের দুই পারদর্শী খেলোয়াড়কে নিজের নিজের দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের হাত ধরতে হবে। কবজি ধরে বা আঙুলে আঙুলে ইন্টারলক পদ্ধতিতেও ধরা যাবে। মধ্যের

খেলোয়াড়ের হাত তার দুই দিকের তৃতীয় খেলোয়াড় ধরবে। এক্ষেত্রে কবজি অথবা আঙুল দ্বারা ইন্টারলক পদ্ধতিতে ধরতে হবে।

সাতজনের ২-৩-২ শিকলে খেলার ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাক প্রাথমিক অবস্থায় ১-২-৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ এই নম্বরের খেলোয়াড়দের দাঁড় করাতে হবে । এক্ষেত্রে ১নং খেলোয়াড়কে ২নং খেলোয়াড়ের হাত ধরতে হবে। ৩নং খেলোয়াড়কে তার বাঁ হাত দিয়ে ৪নং খেলোয়াড়ের ডান হাত ধরতে হবে। ৫নং খেলোয়াড়কে ডান হাত দিয়ে ৪নং খেলোয়াড়ের বাঁ হাত ধরতে হবে। ৭নং খেলোয়াড়কে ডান হাত দিয়ে ৬নং খেলোয়াড়ের বাঁ হাত ধরতে হবে।

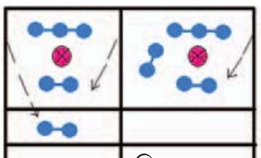

১ নং চিত্র

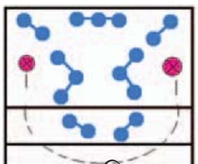

২ নং চিত্র

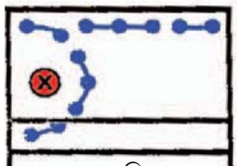

৩ নং চিত্র

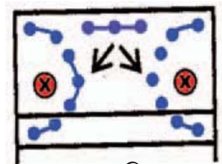

৪ নং চিত্র

১ নং চিত্রের মতো ক-এর দিকে আমক্রমণকারী ঢুকে গেলে ৩,৪,৫ ও ৬,৭-কে নেমে আসতে হবে। অন্যথায় ১ বা ২-কে মেরে চলে যেতে পারে। আবার যখন খ-এর দিকে আক্রমণ হচ্ছে তখন ১,২ ও ৩,৪,৫-কে পিছনে চলে আসতে হবে। অন্যথায় হানাদার যে-কোনো একজনকে মেরে যেতে পারে। তারপর অপরদিকে আক্রমণকারী গেলেই ১-২-৩-৪-৫-কে নেমে আসতে হবে। সুযোগ পেলেই ২ নং চিত্রের মতো আক্রমণকারীকে শিকলের মধ্যে ফেলে আটকে দিতে হবে।

২নং চিত্রে আক্রমণকারী একদিকে আটকা পড়লে ১-২ হাত ছেড়ে দিয়ে গোড়ালি ধরে তুলে দেবে বা জাপটে ধরে ফেলবে । আর বিপরীত দিকে হলে ৬-৭-কে এক ও দুই-এর মতো করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে আক্রমণকারী যাতে ঠেলে বা চেনের তলা দিয়ে বা চেন টপকে না পালাতে পারে।

৩ নং চিত্রে সাতজন খেলোয়াড় এক চেনে কীভাবে আক্রমণকারীকে ঘিরে ফেলে তা দেখানো হয়েছে। তবে এটি পুরাতন পদ্ধতি। এর প্রয়োগ খুব কম হয়। আবার ৪ নং চিত্রে সাতজন খেলোয়াড় কীভাবে দুই শিকলে আক্রমণকারীকে ঘিরে ফেলে সেটা দেখানো হয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতি বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। বর্তমানে ২-৩-২ পদ্ধতি ঠিকমতো রপ্ত করতে পারলে এটাই বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

২-৩-২ পদ্ধতির আরও একটা বিষয়, দুইপাশের ২য় খেলোয়াড়দ্বয়কেও যথেষ্ট পারদর্শী হতে হবে। যে প্রান্তে আক্রমণ হচ্ছে সেই প্রান্তের দুই খেলোয়াড় আক্রমণকারী সন্নিকটে এলেই পরস্পর হাত ছেড়ে দেবে। মাথায় হাত দিয়ে মারতে গেলে বসে পড়বে, পা দিয়ে মারতে গেলে মুহূর্তে আক্রমণকারীকে ঘিরে ধরার চেষ্টা করবে। আক্রমণকারী এপ্রান্তে সুবিধা করতে না পেরে অন্যপ্রান্তের দিকে ছুটে গেলেই হাত ছাড়া দুজনেই হাত ধরে আক্রমণকারীকে অনুসরণ করবে ওপ্রান্তের খেলোয়াড়দের সাহায্য করার জন্য। খেলোয়াড়দের হাত ছাড়ার কারণ ১নং-কে মারতে গেলে ২ ও ২নং-কে মারতে গেলে ১ নং খেলোয়াড় আক্রমণকারীকে ধরে ফেলতে পারে।

৯.১.২ নেটবল

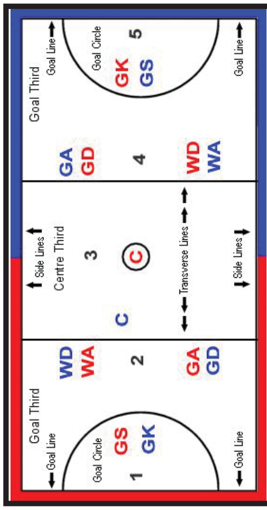

১৮৯০ সালে আমেরিকায় নেটবল খেলা প্রথম শুরু হয়। ইংল্যান্ডে এই খেলা প্রচলিত হয় ১৮৯৫ সালে। ক্রমে ব্রিটিশ অধীনস্ত বিভিন্ন দেশে এই খেলা ছড়িয়ে পরে।

১৯০১ সালে ইংল্যান্ড এই খেলার নিয়মকানুন তৈরি করে।

১৯৬০ সালে ইনটারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ উইমেন্স বাস্কেটবল ও নেটবল গঠিত হয়।

১৯৯৫ সালে নেটবল অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্তির অনুমোদন লাভ করে।

খেলার সাধারণ নিয়মকানুন ঃ

- খেলোয়াড়- ১২ জন, ৭ জন কোর্ট খেলোয়াড়
- পরিচালকমণ্ডলী- দুজন আম্পায়ার, দুজন স্কোরার, দুজন সময়রক্ষক
- একজন খেলোয়াড় ৩ সেকেন্ডের বেশি বল হাতে ধরে রাখতে পারবে না।
- খেলার নিয়ম নির্দিষ্ট অঞ্চলের খেলোয়াড়কে তার নির্ধারিত অঞ্চলের মধ্যে খেলতে হবে।

বল ধরা ঃ

(১) পা দুটি সামনে-পিছনে বাঁ কাঁধের সমদূরত্বে পাশাপাশি রেখে দাঁড়াতে হবে এবং পা দুটির মধ্যে ১২″ মতো ফাঁক রাখতে হবে।

(২) সহজ-স্বাভাবিক ও আরামদায়কভাবে দেহের ভারসাম্য রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে দু-দিকের বল সহজেই ধরা যায়।

(৩) সবসময় দৃষ্টি বলের দিকে রাখতে হবে।

(৪) বলের লাইনে এগিয়ে গিয়ে বলটাকে বুকের সমান উচ্চতায় ধরতে হবে।

(৫) বল ধরার সময় কনুই দুটিকে ভেতরের দিকে নিয়ে হাত দুটোকে বুকের সামনে রাখতে হবে।

(৬) আঙুলগুলিকে স্বাভাবিকভাবে ছড়িয়ে রাখতে হবে এবং দু-হাতের বুড়ো আঙুল দুটি পরস্পর পরস্পরের সমান্তরাল কাছাকাছি বলের পিছনে রাখতে হবে।

(৭) বলের লাইনে দেহটা নিয়ে গিয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে বলটাকে ধরতে হবে।

(৮) ধরার সঙ্গে সঙ্গে বলটা শরীরের কাছে টেনে নিতে হবে। কিন্তু শরীরের সঙ্গে বলটা যাতে না লাগে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে, এতে বলের গতিবেগ কমে যায়।

পাস দেওয়া - এক থার্ড থেকে অন্য থার্ডে বল পাঠানোর একমাত্র পদ্ধতি হলো বল পাস দেওয়া। এই পাস দেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে।

(ক) কাঁধের উপর দিয়ে পাস দেওয়া

(১) যে হাতে বল ছোড়া হবে সেই হাতের আঙুলগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলটা ধরে শরীরের কাছাকাছি এনে ডান কাঁধের উপর বলটা তুলে ধরতে হবে।

(২) যে হাতে বল ছোড়া হচ্ছে তার বিপরীত পা সামনে এবং অপর পা পিছনে থাকবে। পিছনের পায়ের উপর শরীরের ওজনটা রেখে দাঁড়াতে হবে।

(৩) যে হাত পিছনে আছে সেই হাতের কনুই, কবজি ও হাতের আঙুলগুলিকে সোজা করে নিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে বলটাকে সঠিক দিকে ঠেলে দিয়ে, বলটা জোরে ছুড়ে দিতে হবে।

(৪) বলের গতিবেগ বাড়ানোর জন্য বল ছোড়ার সময় কবজি ও আঙুলের ঝটকা দিতে হবে।

(৫) বল ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পা বলের দিকে যাবে এবং শরীরের ওজনটা পিছনের পা থেকে সামনের পায়ের উপরে আনতে হবে।

দৌড়ে এক হাতে গোলে বল মারা ঃ

(১) বল ধরে দৌড়ে যাওয়ার সময় যে পায়ের উপর ভর দিয়ে বল ধরা হবে তার বিপরীত পা সামনে মাটিতে রেখে লাফিয়ে শূন্যে উপরে উঠতে হবে।

(২) লাফিয়ে উপরে ওঠার সময় বল দু-হাতে ধরে বুকের কাজে নিজের আয়ত্তে রাখতে হবে।

(৩) লাফ দিয়ে বল দু-হাতে ধরে মাথার উপর তুলতে হবে। লাফ দেওয়া পা সোজা থাকবে এবং বাতাসে থাকা পায়ের হাঁটু ভাঁজ করে উপরে তুলতে হবে।

(৪) এর সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হাতের উপরে বল তুলে সাহায্যকারী হাত সরিয়ে নিয়ে, জাল লক্ষ্য করে আলতোভাবে বল ছাড়তে হবে।

(৫) প্রয়োজনমতো দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

বুকবরাবর বল পাস দেওয়া ঃ

(১) কনুই ভাঁজ অবস্থায় বলটাকে বুকের সামনে নীচের দিকে ও দেহের কাছাকাছি রাখতে হবে।

(২) যে-কোনো পা সামনে থাকবে, সামনের পায়ের হাঁটু সামান্য ভাঁজ থাকবে।

(৩) বল পাস করবার সময় কনুই সোজা করে কবজির শক্তি প্রয়োগ করে বল পাস দিতে হবে।

(৪) যেদিকে বল পাস দেওয়া হচ্ছে হাতের তালু সেইদিকে রাখতে হবে।

(৫) বল পাস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ওজন পিছনের পা থেকে সামনের পায়ে আসবে।

কাঁধবরাবর পাস ঃ

(১) কনুই ভাঁজ অবস্থায় বলটাকে বুকের সামনে, দেহের কাছাকাছি, কাঁধ বরাবর রাখতে হবে ।

(২) যেদিকে বল পাস দেওয়া হবে সেইদিকে পা সামনে থাকবে এবং অন্য পা পিছনে থাকবে।

(৩) দু-হাতের উপর সমান জোর দিয়ে কনুই সোজা করে এবং কবজির শক্তি প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট খেলোয়াড়ের কাঁধবরাবর বল পাঠাতে হবে।

(৪) দেহের ভর পিছনের পা থেকে সামনের পায়ে আসবে।

কাঁধের নীচ থেকে এক হাতে বল পাস ঃ

(১) যে হাতে বল ছোড়া হবে তার বিপরীত পা সামনে এবং অপর পা পিছনে রেখে দাঁড়াতে হবে।

(২) দেহের ওজন পিছনের পায়ের উপর রাখতে হবে।

(৩) আঙুলগুলি ছড়িয়ে দিয়ে এক হাতে বলটা ধরে দেহের একপাশে পিছনদিকে নিয়ে যেতে হবে।

(৪) হাত সামনের দিকে দুলিয়ে বলটাকে সামনের দিকে ছাড়তে হবে।

(৫) বল ছাড়ার সময় দেহের ওজন পিছনের পা থেকে সামনের পায়ে রাখতে হবে।

কাঁধের নীচ থেকে দু-হাতে পাস দেওয়া ঃ

(১) পা দুটোকে সামনে-পিছনে রেখে হাঁটু ভেঙে দাঁড়াতে হবে।

(২) আঙুলগুলির ডগা নীচের দিকে রেখে দু-হাতে বল ধরে দেহের একপাশে রাখতে হবে।

(৩) হাত দুটি সামনের দিকে দুলিয়ে কবজির জোরে বলটাকে ছাড়তে হবে।

(৪) একইসঙ্গে দেহের ওজন পিছনের পা থেকে সামনের পায়ে রাখতে হবে।

মাথার উপর দিয়ে দু-হাতে গোলে বল মারা ঃ

(১) দেহ সোজা, দৃষ্টি গোলের দিকে রেখে বল দু-হাতে ধরে দাঁড়াতে হবে।

(২) বলটা যখন মারা হবে এবং উপরে তোলা হবে তখন হাতের কনুই দুটি ভাঁজ হবে।

(৩) বেশি শক্তি পাওয়ার জন্য পায়ের হাঁটুটিও একটু ভাঁজ হবে। বুড়ো আঙুল দুটোকে বলের পিছনে নীচের দিকে রাখতে হবে।

(৪) শরীরের ওজনটা সামনে পায়ের পাতার উপর এনে বাহু ও হাঁটু দুটো প্রসারিত করতে হবে।

(৫) একইভাবে কবজি দুটোকে সোজা প্রসারিত করে বুড়ো আঙুল ও অন্যান্য আঙুলের সাহায্যে বলটাকে রিং-এর দিকে ঠেলে দিতে হবে। দৃষ্টি বলের নীচের দিকে রাখতে হবে।

পিভট ঃ এটি একটি বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে বোকা বানানোর প্রচেষ্টা। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় যখন প্রবল বাধা দেয়, তখন এই কৌশল অবলম্বন করা হয়, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে কাটিয়ে পাস দেবার জন্য। যে-কোনো একটি পা কেন্দ্রে স্থির রেখে দেহ ও অন্য পা সামনে-পিছনে নিয়ে গিয়ে সুবিধামতো অবস্থানে পাস দেওয়া যায়।

দশম অধ্যায়

মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

১০.১.১ স্থানীয় জনগোষ্ঠী সেবাকার্যক্রম

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একধরনের সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী তাদের প্রায় সমবয়সি বন্ধুদের নিয়ে একইসঙ্গে দিনের অনেকটা সময় কাটায় এবং পারস্পরিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে। গৃহের পর বিদ্যালয়ই হলো শিশুর বৃহত্তর সমাজে প্রবেশের প্রথম বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয় সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসাবে শিশুর সামাজিকীকরণের ও ক্রীড়া-সাংস্কৃতিক সঞ্চালনে সাহায্য করে। বিদ্যালয় স্তরে একজন শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, নিজস্ব চিন্তাধারা, আচরণ, নীতিবোধ ও জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। বিদ্যালয় স্তর থেকেই অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে থাকতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা কতকগুলি সামাজিক আচরণের প্রশিক্ষণ লাভ করে। যেমন— ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ববোধ, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, ধৈর্য, সহনশীলতা ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে। শিশু তার ভবিষ্যৎ জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ সম্পন্ন করবে সে সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করে।

আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব এখন বিদ্যালয়গুলির উপর ন্যস্ত হয়েছে। তাই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযোগী বিভিন্নপ্রকার সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে।

গণতান্ত্রিক সমাজে সমষ্টিগত কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য শৃঙ্খলাবোধ ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনি নিরপেক্ষভাবে কাজ করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগেরও প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলিতে সমষ্টিগত বা দলগত কাজে উৎসাহ দেবার প্রচেষ্টা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করবার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের প্রয়োজন থাকলেও এর দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যের সঙ্গে সমাজজীবনে অংশগ্রহণ করতে পারে না। যৌথ কাজকর্মের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সমাজজীবনে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নাগরিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক মনোভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিভিন্নপ্রকার সমাজসেবামূলক কার্যাবলি বিশেষ সহায়তা করে থাকে। সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও সমাজসেবামূলক কাজকর্মের মাধ্যমে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ সাধিত হয়, অপরদিকে তেমনি তারা সামাজিকভাবে সচেতন হতে পারে এবং সংঘচেতনা, পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য, আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলির বিকাশ সাধিত হয়। এককথায় শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সুষমভাবে হয়।

প্রকৃত বিদ্যালয় এক অর্থে একধরনের ক্ষুদ্র সমাজ। এই ক্ষুদ্র সমাজই বৃহত্তর সমাজ গঠনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি। বিদ্যালয় থাকবে সমাজের কর্মপ্রবাহের কেন্দ্রস্থলে। এখানে শিক্ষার্থীরা যেমন বিবিধ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবে, তেমনি সমাজের বিবিধ জীবনপ্রবাহের সঙ্গে নিজেদের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপন করবে। অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্রতর সমাজ বৃহত্তর সমাজের কাঙ্ক্ষিত বিকাশের মূল শক্তি হয়ে উঠবে। শিক্ষাকে জনমুখী ও সেবাধর্মী করবার প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের রাজ্যে জনমুখী, সেবাধর্মী, কর্মমুখী, জীবনকেন্দ্রিক, নেতৃত্বদানের গুণাবলি বিকাশের জন্য সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষাক্রম গড়ে তুলবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সূচনা হয়েছে বিদ্যালয় থেকে সমাজে সমাজসেবার কার্যক্রম। বিদ্যালয়ের কাছে সমাজের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট চাহিদা আছে। যে বিদ্যালয় যত বেশি সমাজের চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হবে, সমাজের কাছে সেই বিদ্যালয়ের গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি।

সমাজ এখন যে অবস্থায় আছে তার থেকে ভালো অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন, সেই পদক্ষেপকে বলা যায় উন্নয়ন পরিকল্পনা।

ছাত্রছাত্রীরা আগামী দিনের সুনাগরিক, তাই ছাত্রছাত্রীরা দেশ গঠনে এগিয়ে আসলে অচিরেই রাজ্য ও দেশের মঙ্গল হবে। শিক্ষার্থীকে সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য, সমাজের বঞ্চিত অংশের সন্তানদের শিক্ষার দিক দিয়ে যে দুর্বলতা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করা, তাদের কাছে পৌঁছে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষার অঙ্গনে আরও বেশি সুযোগ করে দিয়ে শিক্ষার মানে সমতা আনা, শিক্ষার্থীদের অবকাশকালীন সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বিদ্যালয়ের যৌথ-পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সেবামূলক কাজে যুক্ত করা, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সুনাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা প্রদান করা প্রয়োজন।

সমাজের সুষম বিকাশে বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক বোঝাপড়া দরকার। মানুষকে সচেতন করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে সকলকে সমবেতভাবে কাজ করতে হবে। ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবক- জনপ্রতিনিধি সকলে মিলে সমাজসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, যা সমাজকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবে আর ছাত্রছাত্রীরা সমাজ ও দেশের উন্নয়নের অংশীদার হবে।

বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার নানারূপ কর্মকেন্দ্রিক শিখনপদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। কর্ম বলতে নিজস্ব লেখাপড়া বা মুখস্থ করাকে বোঝানো হচ্ছে না। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী এমন কিছু কাজে অংশগ্রহণ করবে যাতে সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। এ কাজ করতে গিয়ে একইসঙ্গে তার অঙ্গসঞ্চালন ও মস্তিষ্কের অনুশীলনও হবে। আবার বাধ্যতামূলকভাবে এই প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় না। এখানে অনেকগুলি বিকল্প প্রকল্পের মধ্যে থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দের ক্ষেত্রকে প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আর এর ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান গঠন করতে পারবে, আর জীবন ও জ্ঞানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হবে। এমনভাবে প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা কথাবার্তায়, লেখাপড়ায়, আচার-আচরণে, শিষ্টাচার ও সৃজনমূলক কাজকর্মে আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের হাত ও মনের মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয়। কর্মের মাধ্যমে শিক্ষাদানপদ্ধতি যত বেশি অবলম্বন করা যাবে তত বেশি গ্রন্থকেন্দ্রিক বিদ্যালয় পঠনপাঠন ব্যবস্থা কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে। আর বিদ্যালয় হবে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ববিকাশের উৎকর্ষতা কেন্দ্র। নিম্নলিখিত কর্মকেন্দ্রিকতাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ অনেকখানি প্রশস্ত হবে।

এই উদ্দেশ্যে একটি উপযুক্ত শিক্ষাক্রম কৃত্যসূচি নির্মাণ করা হয়েছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সেবাকার্যক্রমের নমুনা প্রকল্প

যে-কোনো একটি প্রকল্প বেছে নিয়ে শিক্ষার্থী তার অবসরকালীন সময়কে ব্যবহার করে সারাবছরে ২০ ঘণ্টা সময় ব্যয় করবে প্রকল্পটিকে সফল করে তুলতে।

(ক) স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা প্রকল্প ঃ

১. ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সচেতনতা অভিযান।
২. পরিশুদ্ধ পানীয় জল পান করা বিষয়ক সচেতনতা অভিযান।
৩. শৌচাগার ব্যবহার বিষয়ক ধারাবাহিক সচেতনতা।
৪. পালস পোলিও, এইডস, আয়োডিন-এর অভাবজনিত রোগ, ক্যানসার সচেতনতা।
৫. গ্রাম/বস্তিতে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক অভিযান।
৬. থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রকল্প।

(খ) শিক্ষাগত সহায়তা প্রকল্প ঃ

১. অসহায় মানুষদের আইনি সহায়তা প্রকল্প।
২. মানবাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা।
৩. শিশুদের অধিকার।
৪. তথ্য জানবার অধিকার আইন।
৫. বালিকা ও মহিলাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা।
৬. স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের স্কুল অভিমুখীকরণ।
৭. শিশুশ্রমিক বিষয়ক সচেতনতা অভিযান।

৮. মিড-ডে মিল সম্পর্কিত কাজ।

৯. বয়স্ক সাক্ষরতা সম্পর্কিত প্রকল্প।

(গ) সামাজিক সহায়তা প্রকল্প ঃ

১. ক্রেতা সচেতনতা অভিযান।

২. জাতীয় সবুজবাহিনী প্রকল্প।

৩. বৃদ্ধ অসহায় মানুষদের তালিকা প্রস্তুতি।

৪. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহায়তার কাজ।

৫. প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের উপর বিধিনিষেধ।

৬. আমাদের পৃথিবীতে আমাদের কাজ।

৭. মেলা বা উৎসবের সময় প্রাথমিক চিকিৎসা সহায়তার শিবির।

৮. গ্রামবাসীদের ব্যাংকের পাসবই, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন, র‍্যাশন কার্ড তৈরির আবেদন প্রভৃতিতে প্রয়োজন অনুসারে সহায়তা।

৯. বৃষ্টির জলসংরক্ষণ।

১০. শিশু ও নারী পাচার, নির্যাতনতামূলক কার্যক্রম।

১১. কন্যাশ্রী প্রকল্প।

(ঘ) বিপর্যয় মোকাবিলা প্রকল্প ঃ

১. বিপর্যয় মোকাবিলার পন্থা ও পদ্ধতি বিষয়ে জনজীবনকে সচেতন করা।

২. বন্যার পূর্বে, বন্যার সময় ও বন্যার পরবর্তী কাজে সহায়তা করা।

৩. ত্রাণসংগ্রহ ও বণ্টনে সহায়তা।

৪. মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ।

৫. প্রাথমিক প্রতিবিধান বিষয়ক সহায়তা।

(ঙ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ঃ

১. মেলা/উৎসবের দিনগুলি দর্শনার্থীদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করা।

২. যান-নিয়ন্ত্রণে কাজ করা।

৩. পথনিরাপত্তা সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করা।

৪. সাবধানে চালাও : জীবন বাঁচাও।

(চ) সরকারি সহায়তা প্রকল্প সম্বন্ধে সচেতনতা ঃ

গ্রামীণ মানুষের জন্য যেসমস্ত সরকারি সুযোগসুবিধাজনক প্রকল্প আছে তা অজ্ঞ অসহায় মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য কাজ করা। এছাড়াও সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

(ছ) নীতিশিক্ষা, শান্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার ও মূল্যবোধ বিষয়ক কাজ ঃ

শিক্ষার্থীরা নিজেরা নীতিশিক্ষা, শান্তির শিক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও মূল্যবোধের শিক্ষা বিষয়ে নিজেরা যেমন শিক্ষিত হবে তেমনি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে এবিষয়ে সচেতন করবে।

(জ) পরিবেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ঃ

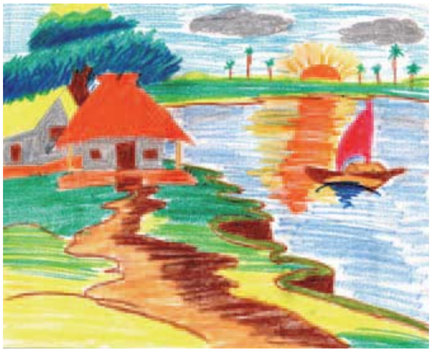

১. বিদ্যালয় ও সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজ।

২. বৃক্ষরোপণ বিষয়ক প্রকল্প।

৩. সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজ।

৪. বিদ্যালয়ে/স্থানীয় এলাকায় ফুলের বাগান তৈরি।

৫. নির্মল বাংলা অভিযান।

(ঝ) স্কুল বিষয়ক প্রকল্প ঃ

১. নিজের বিদ্যালয় বা পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বই, খাতা ও অন্যান্য যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তার মধ্যে থেকে সামর্থ্য অনুসারে যেটুকু সাহায্য করা যাবে সমব্যথী হিসাবে সে ধরনের কাজ করা।

২. বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের সুরক্ষা ও প্রকল্পের সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য যে-কোনো সহায়তামূলক কাজ।

৩. বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কার্ড ও শারীরিক সক্ষমতা কার্ড বিষয়ক কাজ।

৪. শিশু সংসদ গঠন ও পরিচালনা।

৫. নির্মল বিদ্যালয় অভিযান।

শিক্ষা ও সামাজিক অগ্রগতির অংশীদার হিসাবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরও দায়িত্ব বর্তায়। সমাজজীবনে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটছে। আর এই পরিবর্তনকে আরও অগ্রগামী করতে হবে। যখন আমরা অগ্রগতির কথা ভাবি তখন আমাদের চোখের সামনে একটা আদর্শ সমাজ / একটা আদর্শ গ্রাম / আদর্শ পাড়া / ওয়ার্ডের ছবি ভেসে ওঠে। এই আদর্শকে সামনে রেখে তার অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া বা তার জন্য একটু একটু করে কাজ করাকেই আমরা সামাজিক অগ্রগতির জন্য কাজ বলতে পারি। আমাদের স্বপ্নের আদর্শ সমাজ হবে এমন সমাজ যা সাম্য,মৈত্রী, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী সকলে একযোগে এই আদর্শের বাস্তবায়নে কাজ করবে। এইরূপ সমাজে প্রতিটি মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে পারবে, যে সমাজে সকলেই জনকল্যাণের স্বার্থে কাজ করবে। এইরূপ আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য যতটা সফল হবে সমাজের অগ্রগতিও তত ঘটবে। সামাজিক অগ্রগতি জনসাধারণের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন সমবেতভাবে জনকল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত

হয়ে কাজ করবে, সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যখন সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের মানসিকতা গড়ে উঠবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ পরিবেশ ও বাতাবরণ সৃষ্টি হবে, মানুষ যখন পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা, সদ্‌ব্যবহার, ধৈর্য, নিঃস্বার্থ মনোভাব, অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধগুলিকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারবে, তখনই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ছাত্রসমাজ তথা বিদ্যালয় সামাজিক প্রক্রিয়াকরণের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য ঃ

- ছাত্রছাত্রীরা একক বা দলগতভাবে উল্লিখিত সেবামূলক কার্যাবলিগুলি করতে পারে। দলগতভাবে কাজের ক্ষেত্রে উপভোক্তার সংখ্যা যেন আনুপাতিক হারে বাড়ে।
- যে এলাকায় সেবামূলক কাজ করা হবে প্রথমে সেই এলাকায় একটি সুনির্দিষ্ট সমীক্ষা চালাতে হবে, ওই এলাকার প্রয়োজনীয় সহায়তা কাজের বিষয়ে অবহিত হবার জন্য। কারণ সমীক্ষার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে ওই এলাকায় কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন।
- বিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষার শিক্ষকের অনুমোদন নিয়ে একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।
- সেবাকার্যক্রমে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তার একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মসম্পাদন পদ্ধতি একটি রেকর্ড খাতায় লিখে রাখতে হবে।
- এছাড়াও উপভোক্তাদের তালিকা ও সহায়তার সামগ্রিক বিবরণ রেকর্ড খাতায় লিখে রাখতে হবে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তা ও কোন শংসাপত্র পাওয়া যায়, তার উল্লেখ করতে হবে রেকর্ড খাতায়।
- সর্বোপরি স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেও ভালো হয়।
- যে-কোনো একটি প্রকল্প বেছে নিয়ে শিক্ষার্থীরা সারাবছরে ন্যূনতম ২০ ঘণ্টা তাদের অবসরকালীন সময় ব্যয় করবে প্রকল্পের বাস্তবায়নে। এই প্রকল্পের সফলতা তার জ্ঞানগঠনে শুধু সহায়তা করবে না, এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী হিসাবে গড়ে তুলতেও সচেষ্ট হবে।

শিক্ষার সামগ্রিক বিকাশে বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক বোঝাপড়া দরকার। মানুষকে সচেতন করে তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে সমবেতভাবে কাজ করতে হবে। ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবক -জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী সকলকে মিলে সমাজসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে একটা ঐক্যবদ্ধ সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, যা সমাজকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর ছাত্রছাত্রী, সমাজ ও রাজ্য তথা দেশের উন্নয়নের অংশীদার হবে। শারীরশিক্ষার শিক্ষক / শিক্ষিকা প্রতিটি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুসারে তাদেরকে বিভিন্ন প্রোজেক্ট ক্লাসের জন্য নির্বাচিত করবেন এবং ওইসকল ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দমতো বিষয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সেবাকার্যক্রমে কাজ করবে।

১০.১.২ থ্যালাসেমিয়া থেকে শিশুকে বাঁচাতে সচেতনতামূলক প্রকল্প

কুষ্ঠি বিচার নয়, রক্ত বিচার আগে। নইলে অনেক কুঁড়িই অকালে ঝরে যেতে পারে। থ্যালাসেমিয়া একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ রক্তহীনতার মহাসমুদ্র। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এক ধরনের হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি। মানবশরীরে স্বাভাবিক যে যে ধরনের হিমোগ্লোবিন থাকার কথা, সেগুলি না থেকে অস্বাভাবিক ধরনের হিমোগ্লোবিন থাকে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের দেহে। এর ফলে হিমোগ্লোবিন থেকে ঠিকমত অক্সিজেন বার না হয়ে কোশের শ্বাসকার্য ব্যাহত করে। লোহিতকণিকার স্বাভাবিক জীবনকাল পরিবর্তিত হয়ে যায়, ফলে রক্তে লোহিতকণিকার ওই অতিরিক্ত পরিমাণ নষ্ট হয়ে যায় এবং হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়। থ্যালাসেমিয়া হলো শরীরে রক্তের অভাবজনিত সমস্যা। এটা কোনো ব্যাধি বা অসুখ নয়। এটি মানুষের জিনবাহিত বংশানুক্রমিক সমস্যা। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি থ্যালাসেমিয়ার বাহক হন তাহলেই শিশু থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত হবে। বিবাহের আগে রক্ত বিচার, কুষ্টি বিচার পরে। আর এর জন্য থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার টেস্ট বাধ্যতামূলক।

থ্যালাসেমিয়া কী?

থ্যালাসেমিয়া রক্তের একটি বংশগত জন্মগত জিনঘটিত অসুখ। এই রোগে রক্তের লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন প্রোটিন কম তৈরি হয় বা তৈরিই হয় না। গ্লোবিন জিন মিউটেশনের ফলে এই রোগ হয়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের মধ্যে দুই প্রকার গ্লোবিন চেইন থাকে। দুটি আলফা এবং দুটি বিটা চেইন। চারটি গ্লোবিন চেইন হিম অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিমোগ্লোবিন তৈরি করে।

থ্যালাসেমিয়া রোগীর উপসর্গ ও তার কারণ

- রক্তাল্পতা ও শারীরিক দৌর্বল্য—এই রোগে লোহিত রক্তকণিকা প্রভূত পরিমাণে ভেঙে যায় বলে প্রবল রক্তাল্পতার সৃষ্টি হয়। শরীর তা পূরণ করার জন্য প্রচুর পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতে থাকে এবং তা আবার পরিণত লোহিতকণিকা হওয়ার পূর্বে ভেঙে যেতে থাকে। লোহিতকণিকার ভাঙন বর্ধিত প্লীহার দ্বারা হয়। বাচ্চা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। চোখ হলুদ হয়ে যায়, প্রসাব হলুদ হয়। সবসময় জন্ডিসের ভাব।
- সাধারণত বাচ্চা খেতে চায় না, ঘ্যানঘ্যানে মেজাজের হয়, ঘনঘন জ্বর-সর্দিকাশি জাতীয় রোগে ভোগে।
- মুখমণ্ডলের হাড়ের বিকৃতি— প্রভূত পরিমাণ রক্তকণিকা তৈরি হওয়ার দরুন অস্থিমজ্জা (যেখানে রক্ত প্রস্তুত হয়) আয়তনে বাড়তে থাকে। ফলত, বিভিন্ন হাড়ের, মূলত মুখমণ্ডলের হাড়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় এবং মুখমণ্ডলে বিকৃতি ঘটে থ্যালাসেমিয়া মুখমণ্ডল (Thalassaemic Facies)-এ পরিণত হয়ে যায়। মাথা বড়ো, কপাল এবং দাঁত উঁচু দেখায়।

- যকৃত ও প্লীহার অত্যধিক বৃদ্ধি—ধীরে ধীরে অস্থিমজ্জা ছাড়া অন্যান্য প্রত্যঙ্গ, যেমন প্লীহা বা যকৃতেও রক্ত উৎপন্ন হতে থাকে (Extra medulary haematopoiesis)। প্লীহা এবং যকৃত বেড়ে যাওয়ার জন্য এদের পেট বড়ো দেখায়।
- পিটুইটারি গ্রন্থিতে লোহা সঞ্চয়—বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এদের শরীরের বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না। তাই বয়সের তুলনায় এদের ছোটো দেখায়।
- পরিণত যৌনতাপ্রাপ্তিতে ব্যাঘাত—যৌনগ্রন্থিতে লোহা সঞ্চয়, ফলে বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন ঘটতে দেরি হয়, হাত-পা সরু সরু দেখায়।
- হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগ—হৃদ্‌যন্ত্রে লোহা সঞ্চয়।

আক্রান্ত শিশুদের এই রোগের প্রভাব

যেহেতু এই রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা এবং রক্ত নেওয়ার প্রয়োজন, তাই এরা মাঝমাঝেই স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। যার ফলে এরা অন্য বাচ্চাদের থেকে শিক্ষাগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে। অনেকেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয় (school dropout)।

- রক্তাল্পতার কারণে শিশুদের ঘন ঘন অন্যের রক্ত গ্রহণ করতে হয়।
- স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি হয় না বলে অন্য স্বাভাবিক বাচ্চাদের সাথে মেলামেশা, খেলাধুলা করতে পারে না। যার ফলে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
- অনেক সময় এইসব রোগীদের চিকিৎসার সুবিধার কারণে একটি পার্মানেন্ট ইন্ট্রাভেনাস পোর্ট নিয়ে চলতে হয়। যার ফলে সবরকমের খেলাধুলায়, যেমন- সাঁতার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না।
- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থ্যালাসেমিয়া রোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় থ্যালাসেমিয়া রোগাক্রান্ত শিশুরা বৈষম্যের শিকার হয়।

থ্যালাসেমিয়া বাহকদের সামাজিক ভূমিকা

- বাহকদের মধ্যে এই রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না।
- বাইরে থেকে দেখে তাদের আলাদা করা যায় না। বাহক সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। বাহক রক্তদান করতে পারেন।
- তাই একজন আপাত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও থ্যালাসেমিয়ার বাহক হতে পারেন। একজন বাহক অজান্তে আর একজন বাহককে বিবাহ করে ফেলে।

- এটা একটি সামাজিক সমস্যা। এইভাবেই থ্যালাসেমিয়া রোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।
- প্রাক্‌বিবাহ থ্যালাসেমিয়ার বাহক পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি।
- যেসব দম্পতি প্রাক্‌বিবাহ থ্যালাসেমিয়ার বাহক পরীক্ষা করাননি, বাচ্চা নেওয়ার আগে থ্যালাসেমিয়ার বাহক পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি।
- স্বামী-স্ত্রী উভয়েই থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে গর্ভাবস্থায় ৮-১২ সপ্তাহের মধ্যে প্রিন্যাটাল ডায়াগনোসিস (Prenatal Diagnosis) করে দেখে নিতে হবে বাচ্চাটি থ্যালাসেমিয়া রোগগ্রস্ত হবে কিনা।
- থ্যালাসেমিয়ার বাহক এবং তার পরিবারবর্গকে নিয়মিত কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে এই রোগটিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের উপায়

- থ্যালাসেমিয়া রোগী যাতে জন্মগ্রহণ না করে তার একটিমাত্র উপায় আছে, সেটি হল একজন বাহকের সাথে যেন আর একজন বাহকের বিয়ে না হয়।
- একজন বাহকের সাথে আর একজন স্বাভাবিক জিন বহনকারী মানুষের বিবাহ হয় তাহলে নতুন করে থ্যালাসেমিয়া রোগীর জন্ম হবে না।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

- যুবসমাজকে থ্যালাসেমিয়া বিষয়ে সচেতন করা। তারা তাদের পরিবার, পরিজন, বন্ধুবান্ধবকে সচেতন করবে। বাহকেরা কখনোই আর একজন বাহককে বিয়ে করবে না।
- স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সচেতন করা।
- সামাজিক জনসমাগম, যেমন স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ।
- স্কুলে ভরতির পূর্বে থ্যালাসেমিয়ার বাহক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।
- বিবাহের পূর্বে থ্যালাসেমিয়ার বাহক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

১০.১.৩ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের উপর বিধিনিষেধ

- এই রাজ্যে ৪০ মাইক্রনের কম পুরু প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের তৈরি, মজুত এবং ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
- সুন্দরবন অঞ্চলসহ রাজ্যের বনাঞ্চল, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল, দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল এবং শিলিগুড়ি মহকুমা ও জলপাইগুড়ি জেলাস্থিত শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় সবরকম প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
- রাইটার্স বিল্ডিংস-সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি কার্যালয়ে ও বীরভূম জেলাস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ও বোলপুর পৌরসভার অন্তর্গত এলাকায় প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
- ৪০টি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানে সমস্ত রকমের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

  কলকাতা ঃ ইন্ডিয়ান বোটানিকাল গার্ডেন, জুয়োলজিক্যাল গার্ডেন, সুভাষ সরোবর, রবীন্দ্র সরোবর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, মিলেনিয়াম পার্ক, সায়েন্স সিটি, এনার্জি এডুকেশন পার্ক, নিকোপার্ক, নলবন, বনবিতান, সিটিজেন পার্ক, দেশপ্রিয় পার্ক, পদ্মপুকুর, অ্যালেন পার্ক, ম্যাকপারসেন পার্ক, ভিক্টোরিয়া পার্ক, লিয়োনার্ড স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, হেদুয়া, দেশবন্ধু পার্ক, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, টালা পার্ক, স্বভূমি, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, বিড়লা প্লানেটোরিয়াম, ইডেন গার্ডেন, নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম, বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়াম।

  উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ব্যারাকপুর গান্ধিঘাট

  হাওড়া ঃ সাঁতরাগাছি ঝিল

  হুগলি ঃ নিউ দিঘা পর্যটন কেন্দ্র, সোয়াখাল এনার্জি পার্ক, স্ট্র্যান্ড রোড, ছুটি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, কে এম ডি এ পার্ক, ব্যান্ডেল চার্চ, বেলুড় মঠ।

  মুরশিদাবাদ ঃ হাজারদুয়ারি প্যালেস

১০.১.৪ বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ কথাটির অর্থ হল বৃষ্টির জল একত্রিতকরণ (Accumulating) এবং জমানো (Storing)। এই জল মানবজাতীর পানীয় হিসাবে (Drinking Water), গৃহপালিত পশুপাখির পানীয় হিসাবে (Water for livestock), জলসেচকার্য (Irrigation) অথবা ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধির (Ground Water Recharging) কাজে ব্যবহৃত হয়। বাড়ির ছাদ থেকে সংগৃহীত কিংবা ভূমিতে বিশেষভাবে নির্মিত জলাধারে সঞ্চিত বৃষ্টির জল পানীয় জলের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বৃষ্টির জলই একমাত্র অথবা সহজলভ্য উৎস। এই পদ্ধতি স্বল্পব্যয়ে স্থানীয় উপাদান দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে ও জনবসতিপূর্ণ এলাকাতে দারুণভাবে সফলতা অর্জন করতে পারে। ছাদ থেকে সঞ্চিত বৃষ্টির জলের গুণগতমান যথেষ্ট উচ্চমানের এবং পানীয় হিসাবে ব্যবহারের জন্য পরিস্রাবণের (Filtering) প্রয়োজন হয় না। তবে ছাদে থাকা কিছু কিছু পদার্থ বৃষ্টির জলকে দূষিত করে, যা মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। যেসব অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ মিমি-এর বেশি এবং জলের অন্যান্য উৎস দুর্লভ সেইসব অঞ্চলের বাড়িতে এই ধরনের সংরক্ষণ সব থেকে আদর্শ।

সৃষ্টির ইতিহাস

মানুষের কাছে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পদ্ধতি নতুন শব্দ নয়। বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় যে, এই পদ্ধতি খ্রিস্টজন্মের ৪০০০ বছর আগে থেকেই ভারত, এশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার মতো দেশগুলিতে প্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিনিয়ত বৃহৎ ও বিশ্বাসযোগ্য জলপরিস্রাবণ সরবরাহ পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পদ্ধতি আজ একটি ভুলতে বসা জলের উৎস।

পদ্ধতি

বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য সহজ থেকে কঠিনতর বিভিন্ন রকম পদ্ধতি আছে। তবে সাধারণত বৃষ্টির জল ভূগর্ভ থেকে বা বাড়ির ছাদ থেকে সংরক্ষিত করা হয়, যা আমাদের কাছে Ground Catchment System ও Rooftop Catchment System নামে পরিচিত।

বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ সবথেকে সহজ ও বহুপ্রচলিত। এই পদ্ধতিতে ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা হয় এবং তা একটি জলাধারে (Tank) জমানো হয়, ভবিষ্যতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

ব্যবহার

১. স্বয়ংসম্পূর্ণ জলের উৎস।

২. ভূগর্ভস্থ জলের চাহিদা কমায়।

৩. এটি নরম জলের গুরুত্বপূর্ণ উৎস যাতে ধাতব পদার্থের উপস্থিতি সামান্য।

৪. ভূগর্ভস্থ জলের গুণমান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

৫. অন্যান্য জলের উৎসের থেকে কম খরচসাপেক্ষ।

৬. দ্রবীভূতকরণের মাধ্যমে মাটিতে লবণের পরিমাণ কমায়, এমনকি সম্পূর্ণরূপে অপসারণও করে।

৭. ছাদে জল সংরক্ষণ পদ্ধতি সহজে নির্মাণ, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

৮. উপকূলবর্তী এলাকায় যেখানে সমুদ্রের লবণাক্ত জল ভূগর্ভে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, সেই সকল স্থানে বৃষ্টির জল ভূগর্ভস্থ জলের লবণতা হ্রাস করতে সাহায্য করে।

৯. দ্বীপে যেখানে বিশুদ্ধ ভূগর্ভস্থ জল খুবই অল্প, সেখানে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

বাড়ির ছাদ থেকে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পদ্ধতি

১০.১.৫ শিশু ও নারীপাচার, নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

মানব পাচার একটি জঘন্য অপরাধ এবং পাচারের ফলে শিশু ও নারীরা চরম নির্যাতন ও অবমাননার শিকার হচ্ছে। দিন দিন সারা বিশ্বব্যাপী শিশু ও নারীপাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে পাচারের সংখ্যাগত পরিসংখ্যান পাওয়া খুবই কঠিন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়ে থাকেন। শিশু ও নারীপাচার এবং কেনাবেচার ক্ষেত্রে এশিয়া মহাদেশ পৃথিবীর একটি ক্রমবর্ধমান বাজারে পরিণত হয়েছে। অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, অসচেতনতা, দ্রুত নগরায়ণ অধিকমাত্রায় ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি এশিয়াকে শিশু ও নারীপাচারের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত করেছে। প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু ও নারী দেশের মধ্যে ও বাইরে পাচার হচ্ছে। হাজার হাজার মেয়ে, শিশু ও নারী ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে এবং শিশুরা ভিক্ষাবৃত্তি, কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম, চোরাচালানি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রয় ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশু ও নারীপাচার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যারা পাচার হচ্ছে তারা মূলত অতি দরিদ্র পরিবারের শিশু, নারী, কিশোর-কিশোরী এবং উন্নত জীবনযাপনের জন্য বিদেশে চাকুরিপ্রত্যাশী।

উদ্দেশ্য ঃ

- শিশু ও নারীপাচার, নির্যাতন ও শোষণ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

মূলকাজ ঃ শিশুদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে দুটি বিশেষ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করা হবে। যা হলো—

(ক) প্রতিরোধমূলক কাজ (Prevention) ঃ শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত শোষণ, নির্যাতন, বঞ্চনা, পাচার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, যেমন—

(১) শিশুপাচার নির্যাতন প্রতিরোধে জনগণকে সচেতন করা (দলীয় আলোচনা সভা, পথনাটক, ছবি প্রদর্শন, পোস্টার-লিফলেট বিতরণ ও বিলবোর্ড স্থাপন ইত্যাদি)।

(২) শিশুপাচার এবং নির্যাতন প্রতিরোধে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সম্পৃক্তকরণ।

(৩) স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা।

(৪) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর পিতা-মাতাদের মধ্যে সচেতনতা অভিযান চালানো।

(৫) শিশুবান্ধব প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা।

(৬) ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলির জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করা।

(৭) এলাকাভিত্তিক পাচার প্রতিরোধ কমিটি গঠন ও সক্রিয় করা।

(৮) শিশুবিকাশের জন্য শিশুবান্ধব পরিবেশ স্থাপনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে জনমত গঠন করা।

(৯) শিশুপাচার এবং নির্যাতনের প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই পেতে পারে তার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা।

(খ) সুরক্ষামূলক কাজ (Protection) ঃ যে-সমস্ত শিশু পাচার কিংবা অন্যান্য নির্যাতনের শিকার এবং যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদেরকে এ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করা এবং বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও নির্যাতন বন্ধ

করার উদ্যোগ গ্রহণ করা, যেমন—

(১) পাচার থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুদের জরুরি সেবাদান, যেমন- খাদ্য, চিকিৎসা,আশ্রয়সহ অন্যান্য সহায়তা প্রকল্পের উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হবার তথ্য সরবরাহ।

(২) সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পে যৌথভাবে কাজ করা।

(৩) পাচার ও নির্যাতনের তথ্য প্রাপ্তির জন্য পদ্ধতি গ্রহণ করে সক্রিয় রাখা।

(৪) কর্মশালা, মিটিং, সেমিনার, সংলাপ, ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক ও মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং শিশুপাচার এবং নির্যাতন প্রতিরোধে ও প্রতিকারে যথাযথ আইনের প্রয়োগ ও উন্নয়নে জনমত গঠন করা।

(৫) শিশু ফোরাম, সুশীল সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা।

(৬) আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কাজ করা এবং তাদেরকে পাচার প্রতিরোধে ও প্রতিকারে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করা।

(৭) কিশোর-কিশোরীদের জীবনদক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণশিবিরে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

নিখোঁজ শিশু ঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও স্থানীয়দের সচেতন করার কাজ

শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি সমস্ত শিশু সুন্দর নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রতি ৮ মিনিট অন্তর ভারতবর্ষে একটি শিশু নিখোঁজ হয়। তার মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ শিশু আর কখনও তাদের পরিবারে ফিরতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, মুরশিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাগুলি থেকে বেশি সংখ্যক শিশু নিখোঁজ হয়।

শিশু অপহরণ তথা পাচার করা হয় অনৈতিক অঙ্গ প্রতিস্থাপন, দেহব্যবসা, ভিক্ষাবৃত্তি, কারখানায় শিশু শ্রমিক এবং অল্প বা বিনা বেতনে গৃহ পরিচারক/পরিচারিকা হিসাবে নিযুক্ত করার জন্য। এই ধরনের ঘটনায় যুক্ত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব শিশু তাদের শৈশব ও শিক্ষার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

এই বিষয়ে 'কী করণীয়' এবং 'কী করণীয় নয়' সংক্রান্ত নির্দেশাবলি শিশুদের মধ্যে প্রচার করলে এই সংক্রান্ত ঘটনাবলি থেকে তাদের রক্ষা করা যেতে পারে। তাই এই বিষয়ে বিদ্যালয়ে শিশুদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কিছু প্রচারপত্র তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি সম্ভব।

সমাজে শিক্ষার্থীরা একটি বিশেষ আদর্শগত জায়গায় অবস্থান করে। তাই তারাই পারে গ্রাম শিক্ষা/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি/অভিভাবক শিক্ষক সমিতি ও মাতা শিক্ষক সমিতির সভাগুলিতে উপস্থিত পঞ্চায়েত/পৌরসভা ও জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের শিশুদের নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সচেতনতা তৈরি করতে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পুলিশ প্রশাসন ও এন জি ও-গুলির তরফে কোন কোন সাহায্য পাওয়া যাবে সে বিষয়েও এই প্রচারপত্রগুলি দ্বারা শিশু থেকে শিশুর পিতা-মাতাকে সচেতন করে তোলা সম্ভব হবে।

বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানগুলিতে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন এবং এন জি ও-গুলিকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে

শিশুদের এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শিশু নিখোঁজ সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সচেতন করা যায়। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক এবং শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের শিশু নিখোঁজ সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সচেতন করবেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানান। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সহায়তায় শিক্ষার্থীরা সচেতন হবে।

(১) শিশু হারিয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের কর্তব্য ঃ

(ক) সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির লোককে নিয়ে থানায় এফ আই আর করতে বলতে হবে।

(খ) দেখুন শিশুটি কীভাবে হারাল, তাই নিয়ে বাড়ির লোক কোনো ধারণা দিতে পারে কি না।

(গ) স্কুলে শিশুটির বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তারা কিছু জানে কি না।

(২) শিশু হারানো আটকাতে পুলিশের কর্তব্য ঃ

পুলিশই পারে—

(ক) যদি আপনার শিশু হারিয়ে যায়, দেরি না করে প্রথমেই আমাদের কাছে এফ আই আর করুন। প্রয়োজনে আমরা অন্য রাজ্য থেকেও হারিয়ে যাওয়া শিশুকে উদ্ধার করতে পারি।

(খ) অনেক শিশু পাচারকারীর হাতে পড়ে হারিয়ে যায়। এই পাচার আটকানোর জন্য কঠিন আইন আছে, যাতে জেলে বন্দি হতেই হয়।

(গ) কেউ যদি পাচারকারীকে আশ্রয় বা কোনোরকম সাহায্য করে, আইনের চোখে সেও সমান অপরাধী। মনে রাখবেন নাবালিকা বিবাহ (১৮ বছরের নীচের মেয়েদের) আইনের চোখে বেআইনি। আপনার শিশু ফিরে এলেও অবশ্যই আমাদের জানান।

(ঘ) পরিবার, সমাজ ও পুলিশ একসাথে কাজ করা দরকার। তবেই শিশু হারানো বন্ধ হবে। পাচারকারীদের বিষয়ে কোনো খবর থাকলে নিজের পরিচয় গোপন করেও জানাতে পারেন।

(৩) শিশু হারিয়ে যাওয়া আটকাতে এস এইচ জি-র কর্তব্য ঃ

এস এইচ জি-ই পারে—

(ক) এস এইচ জি-র মহিলারা, এলাকার শিশুদের উপর নজর রাখুন।

(খ) আপনারা গ্রামের সবার খবর রাখেন, তাই অল্পবয়সি মেয়েদের পাশে দাঁড়ান। দেখুন কেউ হতাশ হয়ে বিয়ে করে বা কাজ নিয়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছে কিনা। এদের কিন্তু পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(গ) গ্রামের মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পথ দেখান।

(৪) শিশু হারিয়ে যাওয়া আটকাতে পঞ্চায়েতের কর্তব্য ঃ

পঞ্চায়েতই পারে–

(ক) এলাকার জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্টারের পাশাপাশি সব নাবালক-নাবালিকার তালিকা তৈরি করুন।

(খ) কাজের বা বিয়ের নামে নাবালক-নাবালিকাদের বাইরে চলে যাওয়া আটকান।

(গ) হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটলে থানায় এফ আই আর করুন। শিশুপাচার সম্পর্কে সচেতন হোন।

(৫) শিশু হারিয়ে যাওয়া আটকাতে অভিভাবকদের কর্তব্য ঃ

মেয়েকে/ছেলেকে কাজে পাঠানোর আগে—

(ক) যার সঙ্গে কাজে পাঠাচ্ছেন, তার ভোটার কার্ডের জেরক্স আর ছবি, পুরো ঠিকানা আর ফোন নম্বর আপনার কাছে রাখুন।

(খ) গ্রামের কেউ যদি বাইরের কারোর সঙ্গে কাজে পাঠাতে বলে, পাঠাবেন না। আগে পঞ্চায়েতকে জানান, সবাই মিলে খোঁজ নিন।

(গ) আপনার বাচ্চার সাম্প্রতিক ছবি রাখুন, যাতে হারিয়ে গেলে খুঁজতে সুবিধা হয়।

(৬) উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা ছোটোদের বন্ধু হও, তাদের শেখাও ঃ

হারিয়ে যাওয়ার সমস্যা—

(ক) ঝগড়া করে যেন বাড়ি ছেড়ে না যায়।

(খ) অচেনা বা অল্প চেনার সঙ্গে যেন না যায়।

(গ) লক্ষ রাখো, নিয়মিত স্কুলে আসছে কিনা?

(ঘ) নতুন কেউ কি দামি উপহার দিয়ে ভোলাচ্ছে?

মনে রাখো ঃ কোনো শিশু হারিয়ে গেলে বা হারিয়ে যেতে পারে মনে হলে, সবাইকে সাবধান করো। থানায় এফ আই আর করতে বলো।

(৭) যদি কখনও হারিয়ে যাও, তুমি যেন বলতে পারো ঃ

মনে রাখা দরকার—

(ক) তোমার নাম।

(খ) বাবা ও মায়ের নাম।

(গ) তোমার গ্রামের ও থানার নাম।

(ঘ) বাড়িতে মোবাইল বা ল্যান্ডফোন থাকলে তার নম্বর।

(ঙ) কাছের স্টেশনের নাম/পোস্ট অফিসের নাম ও পোস্ট অফিসের পিনকোড নম্বর ইত্যাদি।

আমরা বাল্যবিবাহ চাই না

শিশু হিসাবে আমাদের বাঁচাবার, শেখার, খেলার অধিকার রয়েছে। সবরকম নিগ্রহ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারও রয়েছে আমাদের। আমরা চাই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হওয়ার মতো সময় ও পরিসর। বাল্যবিবাহ আমাদের অধিকার কেড়ে নেয়। সবসময় দেখা যায়, মেয়েরাই এর সবচেয়ে বড়ো শিকার। বাল্যবিবাহ তার নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার অধিকার কেড়ে নেয়। সরলতার সুযোগ নিয়ে লঙ্ঘিত হয় তার বাঁচার ও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার অধিকার।

আমরা ঃ

* বাল্যবিবাহ একটি ক্ষতিকর ও বেআইনি প্রথা — এই বার্তা ছড়িয়ে দেবো।
* বাল্যবিবাহকে প্রশ্রয় দেয় এমন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করব।
* বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করব।
* ছেলে ও মেয়েদের সমান সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করব।
* নিজেদের অধিকারগুলি পাওয়ার জন্য নিজেরা চেষ্টা করব।
* স্কুলে যাব এবং নিজেদের অধিকারগুলি ভালোভাবে ব্যবহার করার জন্য নিজেদের তৈরি করব।
* বিয়ের বয়স হওয়ার পরই বিয়ে করব, তার আগে কোনো অবস্থায় নয়। এর বিরুদ্ধাচরণ হলে প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তা নেব।

বাবা-মা, পরিবার ও গোষ্ঠীর কাছে আমরা চাই ঃ

* আপনার ছেলে ও মেয়েকে সমান মর্যাদা দিন।
* পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার জন্য আমাদের ভালোবাসা ও যত্ন নিন।
* আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলে এমন বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করুন।

সমাজের কাছে চাই ঃ

* আমাদের অধিকার ভঙ্গ করে এমন প্রথা ও রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলুন।
* আমাদের সবার অধিকারগুলি পাওয়া নিশ্চিত করুন।
* আমাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগসুবিধা পাওয়া নিশ্চিত করুন।
* হিংসা ও নিগ্রহ থেকে আমাদের সুরক্ষা পাওয়ার পরিবেশ গড়ে তুলুন।
* অধিকারগুলি লঙ্ঘিত হলে প্রতিবাদের জন্য কোথায় ও কার কাছে যাব তা জানানোর ব্যবস্থা করুন।
* গণমাধ্যমে বাল্যবিবাহ-বিরোধী বার্তা সম্প্রচারের ব্যবস্থা করুন।
* বাল্যবিবাহের সমর্থক, ব্যবস্থাপক ও অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিন।

১০.১.৬ কন্যাশ্রী প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির নাম কন্যাশ্রী। রাজ্যের কিশোরী মেয়েদের প্রত্যেককে বিদ্যালয়ের আঙিনায় নিয়ে আসার আর এক নাম কন্যাশ্রী। আঠারোর আগে বিয়ে নয় — মেয়েদের বোঝানোর দায়িত্বের আরেক নামও কন্যাশ্রী। ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়ে না করে নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ শর্তাধীনে মেয়েদের আর্থিক সুবিধা দেওয়ার প্রকল্পের নাম কন্যাশ্রী প্রকল্প। পুরোপুরি সরকারি আওতাধীন এই প্রকল্প বর্তমানে রাজ্যের সব জেলাতেই চালু হয়ে গেছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্পটিতে দুই ধরনের আর্থিক সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ঃ

ক) K1 - বার্ষিক বৃত্তির পরিমাণ ৭৫০ টাকা। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি অবিবাহিতা মেয়েদের এই ভাতা দেওয়া যাবে। উপভোক্তাকে যে-কোনো সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয়ে বা সমতুল মুক্ত বিদ্যালয়ে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে পাঠরতা হতে হবে অথবা সমতুল কারিগরি/বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের ছাত্রী হতে হবে।

খ) K2 - এককালীন এই বৃত্তির পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা। বৃত্তিদানের বছরে অনূর্ধ্ব ১৯ এবং ১৮ বছর অতিক্রান্ত অবিবাহিতা মেয়েরা এই বৃত্তি পাবে। উপভোক্তাকে সরকার স্বীকৃত বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে বা মুক্ত বিদ্যালয়ে পাঠরতা হতে হবে অথবা কারিগরি/বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের ছাত্রী হতে হবে। জে জে অ্যাক্ট, ২০০০-এর অধীনস্থ আবাসের আবাসিকারও এই বৃত্তি পাবে।

সম্ভাব্য বৃত্তিপ্রাপকদের বার্ষিক পারিবারিক আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। তবে অনাথ মেয়েদের ক্ষেত্রে এবং পি. ডব্লু. ডি. অ্যাক্ট, ১৯৯৫ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমান সুযোগ, অধিকার সুরক্ষা ও পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ আইন, ১৯৯৫) মোতাবেক ৪০% প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে (স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বীকৃত মেডিক্যাল বোর্ডের শংসাপত্র মোতাবেক) অথবা জে জে আবাসের আবাসিকাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক আয়ের উর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত কোনো বাধানিষেধ নেই।

আবেদনপত্র কোথায় পাওয়া যাবে এবং কীভাবে আবেদন করতে হবে ঃ

১। রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে আবেদনপত্র পাওয়া যাবে। ছাপানো এবং ক্রমিক নম্বরযুক্ত আবেদনপত্র উক্ত প্রতিষ্ঠানের হেফাজতে রাখা হয়েছে। এছাড়াও, সমাজকল্যাণ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা পুরসভা, সমস্ত মহকুমা শাসকের কার্যালয় এবং সব সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয় থেকেও আবেদনপত্র মিলবে।

২। কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপভোক্তাদের সুবিধার্থে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য একপাতার সরল আবেদনপত্র তৈরি করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে উক্ত ফর্মের মাধ্যমে উপভোক্তাদের নামে দ্রুত শূন্য ব্যালান্সের অ্যাকাউন্ট খুলতে অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্ভাব্য প্রাপকের নতুন অথবা পুরোনো যে-কোনো একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতেই হবে। ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অথবা যে-কোনো ব্যাংক যেখানে সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছায়।

৩। উপভোক্তাকে তাঁর বিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ের প্রধানের কাছে পূরণ করা ফর্মের সঙ্গে সব ধরনের শংসাপত্র জমা দিতে হবে।

৪। প্রতিষ্ঠানের প্রধান/দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে আবেদনপত্রের তৃতীয় পাতায় জন্মতারিখ এবং পড়াশোনা সংক্রান্ত তথ্যপঞ্জিতে উপযুক্ত শংসাপত্র দিতে হবে। তৃতীয় পাতার একদম শেষে ক্রমিকসংখ্যার অন্তর্গত শংসাপত্রগুলি দিতে পারবেন মেয়েটির বাসস্থান সংশ্লিষ্ট পুরসভার পুরপিতা/বরো সভাপতি/গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/বিধায়ক/সাংসদ/উপভোক্তার বসবাসকারী ঠিকানার আওতাভুক্ত কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের যে-কোনো গ্রুপ-এ আধিকারিক।

৫। আবেদনকারী ছাত্রীটির ফর্মে দেওয়া সমস্ত তথ্য wbkanyashree.gov.in এই পোর্টালে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে তুলে দিতে হবে। এছাড়াও, আবেদনপত্রে লাগানো রঙিন ছবি (100 kb) এবং পুরো তৃতীয় পাতা (200 kb) স্ক্যান করে এই পোর্টালে তুলে দিতে হবে।

৬। উপরে বলা তথ্যপঞ্জি পোর্টালে তোলার জন্য আবেদনপত্র পিছু ১০ টাকা কার্যালয় থেকে পাওয়া যাবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব আই. ডি. এবং পাসওয়ার্ড ই-মেল করে প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

৭। প্রতিষ্ঠানগুলিতে তথ্যপঞ্জি পোর্টালে তোলার সঠিক পরিকাঠামো না থাকলে নিকটবর্তী সি.এল.আর. সি. সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে উক্ত কাজ করা যেতে পারে।

- আবেদনকারীর পারিবারিক বার্ষিক আয় অনধিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হতে হবে।
- বার্ষিক ৭৫০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি মেয়েদের, যারা অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে কিংবা সমতুল কারিগরি/প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠরতা।
- এককালীন ২৫,০০০ টাকার বৃত্তি সেই সমস্ত অবিবাহিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যারা অনতিক্রম ১৮ বছর বয়সি, যারা যে-কোনো বিদ্যালয় বা কলেজে ভর্তির আবেদন/রেজিস্ট্রেশন করেছে অথবা যারা যে-কোনো কারিগরি/প্রযুক্তিগত পাঠক্রমে প্রশিক্ষিত হয়েছে বা যে-কোনো স্বীকৃত খেলাধুলার সাথে যুক্ত রয়েছে কিংবা জে. জে. অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীনস্থ আবাসের আবাসিকারা।
- অনাথ মেয়েদের এবং প্রতিবন্ধী (৪০% প্রতিবন্ধকতাযুক্ত) মেয়েদের অথবা জে. জে. আবাসের আবাসিকাদের ক্ষেত্রে পারিবারিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমায় কোনো বাধানিষেধ নেই।

আবেদনপত্র পরীক্ষা এবং অনুমোদন প্রদান

অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ডি. পি. এম. ইউ. দ্বারা সব আবেদনপত্রগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে, উপযুক্ত আবেদনপত্রগুলিকে বৃত্তি দেবার জন্য অনুমোদন দেওয়া হবে। উপভোক্তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে NEFT পদ্ধতিতে সরাসরি বৃত্তির টাকা চলে যাবে। এছাড়াও, প্রাপককে অ্যাকাউন্টে বৃত্তির টাকা পৌঁছানোর সাথে সাথে SMS Alert-এর মাধ্যমে উপভোক্তাকে সচেতন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, যে-কোনো উপভোক্তা অনলাইন কন্যাশ্রী পোর্টালে গিয়ে নিজের আবেদনপত্রের ক্রমিকসংখ্যা, K1 বা K2 ধরন, এবং জন্মতারিখ উল্লেখের মাধ্যমে নিজের আবেদনপত্রের সর্বশেষ অবস্থান জেনে নিতে পারবে।

যে-কোনো প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য এন আই সি-এর সাথে যোগাযোগ করুন-support.kanyashree@nic.in.।

শিশু-বিকাশ দপ্তর এবং নারী উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দপ্তর- www.wbkanyashree.gov.in।

কন্যাশ্রী বিষয়ক সচেতনতনমূলক নমুনা সমীক্ষাপত্র

কন্যাশ্রীর সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বা কন্যাশ্রী সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত প্রার্থী যে এখনও কন্যাশ্রীর সহায়তা পায়নি তার সঙ্গে বিদ্যালয়ে পাঠরত স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার সমীক্ষক শিক্ষার্থীর কথোপকথন

সমীক্ষক শিক্ষার্থীর নাম—

যার সমীক্ষা করছে তার নাম/ঠিকানা—

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পটির নাম আপনি/তুমি শুনেছ?

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ কন্যাশ্রী প্রকল্পটির লক্ষ্য কী?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ এই প্রকল্প কোথায় চালু হয়?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ এই প্রকল্প থেকে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ কারা এই বার্ষিক বৃত্তি পাবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ এই বার্ষিক বৃত্তি পাওয়ার জন্য বয়স কী একমাত্র পাওয়ার যোগ্য?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ কারা এককালীন অনুদান পাবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ এই বৃত্তি বা এককালীন অনুদান পাওয়ার জন্য কী কোনো আবেদন করতে হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ পরিবারের আয় কত হলে এই বৃত্তি বা এককালীন অনুদান পাওয়া যাবে? বৃত্তি বা এককালীন অনুদান পাওয়া যাবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ এই বৃত্তি পাওয়ার জন্য কে আবেদন করবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ এককালীন অনুদান পাওয়ার জন্য কে আবেদন করবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ ফর্ম (আবেদনপত্র) কোথায় পাওয়া যাবে?

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ এই আবেদনপত্রের সঙ্গে কি কিছু জমা দিতে হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে কী কী জমা দিতে হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ মেয়েটি কোন বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করলে এই টাকা পাবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ মেয়েটি যে অবিবাহিতা তা কী করে প্রমাণ হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ পারিবারিক আয়ের প্রমাণপত্র হিসাবে কী দিতে হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রে কী কোনো ছাড় আছে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ আবেদনপত্র জেরক্স করে ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ আবেদনপত্র কোথায় জমা দিতে হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ যে বৃত্তি পাচ্ছে তাকে কি আগামী বছরে বৃত্তি পাওয়ার জন্য আবেদন (পুনর্নবীকরণ) করতে হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ বার্ষিক বৃত্তি ও এককালীন অনুদান সংক্রান্ত আরো কিছু তথ্য

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ সংস্থায় পাঠরতা বলতে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষণ সংস্থাকে ধরা হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ কোন কোন ক্ষেত্রে বার্ষিক আয়ের শর্ত প্রযোজ্য হবে না?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ পরিবারের আয়ের মধ্যে কাদের আয় ধরা হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ এই বৃত্তি বা এককালীন অনুদান কীভাবে পাওয়া যাবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট কীভাবে খুলতে হবে?

উত্তরদাতাঃ

সমীক্ষক শিক্ষার্থী ঃ যথাযথ শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কারা?

উত্তরদাতাঃ

সুশিক্ষক শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর | স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার শিক্ষকের স্বাক্ষর

এশীয় তিরন্দাজিতে সোনা জঙ্গলমহলের কন্যাশ্রী মণিকা সোরেনের

জঙ্গলমহলের থেকে চিনা-তাইপেতে এশীয় জুনিয়ার তিরন্দাজির পোডিয়াম। এক স্বপ্নের উড়ান শুরু হলো বছর উনিশের মেয়ে মণিকা সোরেনের। নয়াগ্রামের আদিবাসী কন্যাশ্রী মণিকা এশীয় জুনিয়র রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড তিরন্দাজিতে ভারতের হয়ে দলগত সোনা জয়ের ভাগীদার হলো। ভারতের মেয়েরা দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এই টুর্নামেন্টে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম ব্লকের ভালিয়াঘাঁটি গ্রামে বাড়ি মণিকার। স্থানীয় টোটাসাই গ্রামের জনকল্যাণ বিদ্যালয় থেকে এ বছরই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে সে। বর্তমানে সে কলকাতার একটি কলেজে ভরতিও হয়েছে।

মণিকার বাবা অন্যের জমিতে ভাগচাষ করেন। মণিকারা চার ভাই-বোন। অভাবের সংসার। অ্যাসবেসটস ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়িতে মাত্র দুটি ঘরে বসবাস করে ওরা। মণিকার বাবা ও মা জানান, 'গত বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী মেয়েকে খেলার জিনিসপত্র দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর মান রেখেছে মণিকা'। কন্যাশ্রীর সাফল্যে খুশির জোয়ারে ভাসছেন মণিকার গ্রাম তথা গোটা জঙ্গলমহল। মনিকা জানায় যে- 'প্রথমে স্থানীয় টোটাসাই গ্রামের জনকল্যাণ বিদ্যালয়ে বাঁশের ধনুক দিয়ে তীরন্দাজির অনুশীলন শুরু করেছিলাম আমি। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় ও উৎসাহে আমি আজ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পেয়েছি। এজন্য রাজ্যের মুখমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানায়'। প্রত্যন্ত এই গ্রাম থেকে মণিকা যেভাবে প্রতিকূল পরিবেশ কাটিয়ে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করে মাথা উঁচু করে দেশের কাছে দাঁড়িয়েছে তাতে গোটা রাজ্য আপ্লুত।

কন্যাশ্রী সুনিতা পারভিনের বার্তা
ছোট জাগুলিয়া হাইস্কুল, বারাসাত—১

আমি সুনিতা পারভিন। আমি এই বছর ছোট জাগুলিয়া হাইস্কুল থেকে কলা বিভাগের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। কিছুদিন আদে আমি কন্যাশ্রীর কে-২ বৃত্তিভোগী হিসাবে ২,৫০০ টাকা পাই। এই টাকা পেয়ে আমি খুবই খুশী। আমি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরে কলেজে ভরতি হব এবং কন্যাশ্রীর বৃত্তি আমার উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণের জন্য খুবই সহায়ক হবে। এতদিনে আমি কন্যাশ্রীর বাৎসরিক বৃত্তির দরুণ প্রাপ্ত টাকায় পড়াশোনা নানাবিধ খরচ চালিয়েছি। কে-১-এর দরুণ প্রাপ্ত টাকায় পড়াশোনা নানাবিধ খরচ চালিয়েছি এবং কে-২-এর দরুণ প্রাপ্ত টাকা আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রেখে দিয়েছি উচ্চশিক্ষার দরুণ খরচ করব বলে।

আমার মতন আমার অনেক বান্ধবীরাও কন্যাশ্রীর টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে রেখেছে। কেউ কেউ এই টাকা দিয়ে নতুন কিছু শিখবে, কেউবা পড়াশোনার খরচ চালাবে। আমার মা খুশী এই টাকা পাওয়ায়। ভবিষ্যতে আমি পড়াশোনা শিখে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই।

আমি সুনিতা পারভিনের মা, সুনিতার বাবা আগে গ্যারেজে কাজ করত কিন্তু তিন বছর ধরে স্পন্ডেলাইসিসের দরুন তিনি আর আগের মতো সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারেন না। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে সদস্যের রোজগার কমে গেলে আমরা চিন্তায় পড়ে যাই, কী করে মেয়ের পড়াশোনা চালাব। এখন আর সুনিতার পড়াশোনা নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে না। কন্যাশ্রী বৃত্তির ২,৫০০ টাকা সুনিতাকে সহায়তা করবে তার জীবনের লক্ষ্যপূরণে। ধন্যবাদ কন্যাশ্রী প্রকল্পকে। সুনিতার মতো আরও লক্ষ লক্ষ মেয়ের স্বপ্নপূরণের অবলম্বন হলো এই প্রকল্প।

মুন্না দাস
গঙ্গানগর, মধ্যমগ্রাম

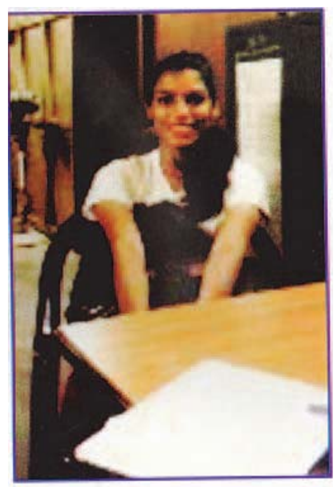

আমি মুন্না দাস, শিক্ষায়তন স্কুলের ছাত্রী। আমি ক্যারাটে শেখাই। কিছুদিন আগে কিছু ছেলে আমায় উত্যক্ত করলে এই ক্যারাটে আমাকে সুরক্ষিত করে এবং আমায় কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে। আমি কন্যাশ্রী কারিগরী শিক্ষার প্রশিক্ষণ পাই। মেয়েদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সুরক্ষা অনেক সময়েই প্রশ্ন হয়ে ওঠে। ক্যারাটে শুধু মেয়েদের সুরক্ষিত করে না, আত্মবিশ্বাসী করে। আমি খুব খুশি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হয়ে, এই হঠাৎ পাওয়ার আনন্দই অন্য রকম।

কন্যাশ্রী

কন্যাশ্রীর উদ্যোগ নারী শিক্ষার সফলতা,
দূর হোক উচ্চশিক্ষার আঙিনায় নারীর স্বল্পতা।
ঘরে ঘরে জ্বালো এই প্রকল্পের আলো,
নারীরা হোক কল্যাণী সব স্বাস্থ্য মনে ভালো।

সোমা সরকার, আলিপুরদুয়ার

মেয়ের জন্য মায়ের কান্না সেসব এখন ভুল
আঠারো হয়নি, করব বিয়ে সেও এখন দূর,
শাসন আছে, দমন আছে, আমি একা পথে
কেউ না দাঁড়াক পাশে আমার কন্যাশ্রী আছে।

অর্চনা মাহাতো, ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

কন্যাও দেশের ভবিষ্যৎ, কন্যাও দেশের আশা;
কন্যার প্রতি অবিচার বড়ই সর্বনাশা।
কন্যা জন্মাক, তাকেও বাঁচান, করুন সংকল্প
সরকার তাদের পাশেই আছে, তাইতো কন্যাশ্রী প্রকল্প।

সেলিনা সারমিন, সাহেবগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, কোচবিহার

কন্যাশ্রী কোথায় ছিল? কত দূরে? কোন সুদূরের পার?
এলে তুমি শুভক্ষণে দিতে নারীর অধিকার।
কেহ নাহি যার, তুমি আছ তার
তুমি মোদের অহঙ্কার, তোমায় প্রণমি শতবার।

পরিণীতা দাস, গোপালগঞ্জ আরএন উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ দিনাজপুর

‘কন্যাশ্রী’ ‘কন্যাশ্রী’ কোথায় তুমি ছিলে,
ঘরের কন্যা বোঝাস্বরূপ বুঝতে নাহি দিলে।
জিতব মোরা বিপুল আশা, পিতা যাদের গরিব
উষার কিরণ পড়ল, মোদের জীবন করো জরিপ।

লীনা চক্রবর্তী, গ্রাম- দিপালীনগর, পোস্ট অফিস- বালুরঘাট

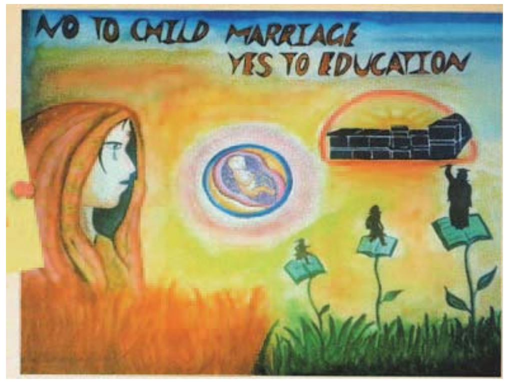

কলম ধরেছি মোরা, বেড়েছে মনোবল।
এগিয়ে এসো নারীগণ, নারীশক্তি হয়েছে প্রবল।।
ঘোমটা খুলেছি, এগিয়ে চলেছি, আঁধারের হোক অবসান।
বাঁচাব দেশ, রাখব মান, হোক নারীদের জয়গান।।

দিয়া সিংহ, জোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়

আমরা সবাই কন্যা, জেনো আমরা অনন্যা,
কন্যাশ্রী প্রকল্পতে হলাম মোরা ধন্যা।
খুলে গেল এক নিমেষে পড়াশোনার পথ,
বিয়ে তো নয়, নিজের পায়ে দাঁড়ানোটাই মত।

মুনমুন মণ্ডল, ভাণ্ডারগাছা এস. সি. বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া

কন্যা আমরা, নইকো তুচ্ছ, অবহেলার পাত্রী
কন্যাশ্রীর সহায়তায় শিক্ষাযানের যাত্রী।
শক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, স্বপ্ন আছে প্রাণে,
কন্যাশ্রী দেখায় আলো, তাকাই আলোর পানে।

স্নেহা রায়, পূর্ব মল্লিক পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

১০.১.৭ সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ বিষয়ক সচেতনতা অভিযান

৮ জুলাই, ২০১৬, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গোটা পশ্চিমবঙ্গ শপথ নিয়েছে পথ সংস্কৃতি মেনে চলার। এ শপথ ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার। এ শপথ সতর্ক হয়ে পথ চলার। পথের নিয়ম মেনে চলার লক্ষ্যে প্রশাসন, পুলিশ, পরিবহনকর্মী, পথচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা একসূত্রে গ্রথিত হোক। আমরা সিগন্যাল মেনে গাড়ি চালাব। আমরা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে দুর্ঘটনা ডেকে আনব না। আমরা প্রতিদিন সুস্থ দেহে, নিরাপদে অপেক্ষারত প্রিয়জনদের কাছে ঘরে ফিরে আসব। এই শপথ একদিন-দুদিন বা একটি সপ্তাহের নয়, এ আমাদের আজীবনের অঙ্গীকার হোক। আসুন, আমরা সকলে মিলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত Safe Drive Save Life -এর অঙ্গীকার দৃঢ় করি।

শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক, শিক্ষার্থী থেকে সর্বসাধারণের মধ্যে সচেতনতা অভিযান।

১. শিক্ষার্থীরা পথচারীদের মধ্যে রাস্তা ব্যবহারের সতর্কতার নিয়মাবলি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবার প্রকল্প গ্রহণ করবে।

২. শিক্ষার্থীরা পথচারীদের রাস্তা পার হওয়ার নিয়ম সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবার প্রকল্প গ্রহণ করবে।

৩. দু-চাকার গাড়িচালকদের মধ্যে গাড়ি চালাবার নিয়মাবলি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবার প্রকল্প শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করবে।

৪. শিক্ষার্থীরা নিজেরা যেমন সাইকেল চালাবার ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা গ্রহণ করতে হয় সে সম্পর্কে সচেতন হবে, তেমনি জনসাধারনকে সচেতন করবে।

৫. শিক্ষার্থীরা নীচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের রাস্তায় চলার নিয়মাবলির মহড়া অনুশীলনের প্রকল্প গ্রহণ করবে।

৬. অভিভাবক, শিক্ষক, পুলিশ, প্রশাসনের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা রাস্তা ব্যবহারের মহড়া অনুশীলন যেমন করবে, তেমনি শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থী পথ নিরাপত্তার শিক্ষা বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করবে।

৭. সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ বিষয়ক পথ ব্যবহারের স্বর্ণালী নিয়ম বিষয়ক সচেতনতা অভিযানে অংশগ্রহণ করবে।

৮. পথ নিরাপত্তার থিম সংগীত বিষয়ক সচেতনতা অভিযান সম্পর্কে প্রকল্প গ্রহণ করবে।

SAFE DRIVE
SAVE LIFE

সাবধানে চালাও, জীবন বাঁচাও

SAFE DRIVE
SAVE LIFE

আমরা প্রতিদিন সুস্থ দেহে, নিরাপদে অপেক্ষারত প্রিয়জনদের কাছে ঘরে ফিরে আসব। এই শপথ একদিন, দু' দিন বা একটি সপ্তাহের নয়; এ আমাদের আজীবনের অঙ্গীকার হোক। আসুন, আমরা সকলে মিলে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারিত Safe Drive Save Life-এর অঙ্গীকার দৃঢ় করবার শপথ নিই। শপথটি নীচে দেওয়া হলো---

আমাদের প্রতিজ্ঞা

পথ সংস্কৃতি জানব
ট্রাফিক নিয়ম মানব
আমি সতর্ক হয়ে চলব
সুস্থভাবে এগিয়ে যাব
পথকে জয় করব
শান্ত জীবন গড়ব
পথ শুধু আমার নয়
এ পথ মোদের সবার
তা সর্বদা মনে রাখব।

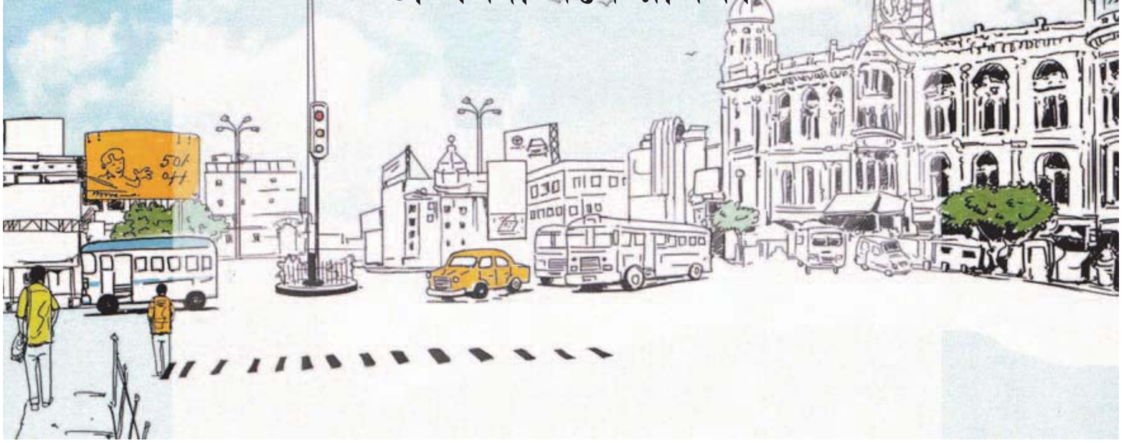

১০.২.১ নেতৃত্বদান ক্ষমতা বিকাশ কার্যক্রম কার্যক্রম

বিদ্যালয়ের একঘেয়ে পরিবেশে নিয়মমাফিক পাঠে শিক্ষার্থীরা অনেক সময় মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে। আর এই অবস্থা বেশিদিন চলতে থাকলে শিক্ষার্থীর মনে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের মনের খোরাক মেটাতে ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেকার সুকুমার বৃত্তিগুলি বৃদ্ধির জন্য সামাজিকতা, দেশাত্মবোধ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বদান ক্ষমতা বিকাশ কার্যক্রম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানের নতুন শিক্ষাদর্শন অনুসারে আগে যে যে বিষয়গুলিকে সহপাঠক্রমের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করা হতো, আজ কিন্তু সেই সকল বিষয়গুলি অপরিহার্য পাঠক্রমের অংশ।

বিদ্যালয় প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্রীড়াপ্রতিভা, সৃজনশীল দক্ষতা ও কৃত্যালির প্রকাশ ঘটায় ও স্বীকৃতি দেয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিকতা, দেশাত্মবোধ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদান ক্ষমতা বিকশিত হয়। অভিভাবক তার সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠান এই উদ্দেশ্যে, যেন তার সন্তান জ্ঞানলাভ করে সামাজিক হয়ে গড়ে উঠে। বিদ্যালয় তার ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন পরিবেশে শিক্ষার্থীদের খাপ খাইয়ে নেবার যেমন শিক্ষা দেয়, তেমনি ছাত্রছাত্রীরা একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে আত্মসচেতন ও মানবিক হয়ে ওঠে। তারা যেমন কাজের মাধ্যমে শেখে, তেমনি বিদ্যালয়ে শেখা বিষয় তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহারও করতে শেখে। শিক্ষার্থী সামাজিকীকরণের বিষয়টি বিদ্যালয়ে নিয়মকানুন, পাঠক্রমিক কাজ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। তেমনি বিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠান, যেমন — সাংস্কৃতিক উৎসব, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন, প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন, মনীষীদের স্মরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন, কুইজ, সেমিনার, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘটে থাকে। শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, নীতিবোধ, সুস্থ রুচিবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সমানুভূতি, নেতৃত্বদান ক্ষমতা, সামাজিক বন্ধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি সামাজিক দক্ষতাগুলি বেড়ে ওঠে। সহজ হয় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। বিশেষ বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বীয় দক্ষতার নৈপুণ্যতা প্রদর্শন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সকলের সামনে। পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়লেও, তারা বলতে পারে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আমরাও সেরা। দূর হয়ে যাবে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রছাত্রীদের জড়তা, যখন পিছিয়ে-পড়া ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের কার্যক্রমে পারদর্শিতা দেখাতে পারবে তখন। তাদের হতাশা কেটে যায় এবং এর পরবর্তীতে অন্যান্য বিষয়েও তার সাফল্যের সুফল প্রতিফলিত হয়। আর সামগ্রিক নেতৃত্বদান ক্ষমতার বিকাশের ফলে তার ব্যক্তিত্বেরও সুষম বিকাশ সাধিত হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন বৃহত্তর সমাজে নিজেদেরকে তুলে ধরতে সক্ষম হয় তেমনি নেতৃত্বদান ক্ষমতার সুস্থ বিকাশও ত্বরান্বিত হয়।

১০.২.২ পালনীয় দিবসগুলিতে অংশগ্রহণ

উদ্দেশ্য ঃ রাজ্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পালনীয় দিনগুলোর যেগুলো বিদ্যালয়ে পালিত হয়, সেই দিনগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের দেশাত্মবোধের বিকাশ ও নেতৃত্বদান ক্ষমতার বিকাশের লক্ষ্যে এই বিষয়টিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও পালনীয় দিবসের দিন প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর উক্ত দিবস পালনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

বরণীয় মনীষীদের জন্মদিন পালনীয় দিবসের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও এখানে বিদ্যালয়ে পালনীয় বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসের একটি তালিকা দেওয়া হলো। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে এই দিনগুলো পালন করবেন।

১০ জানুয়ারি	রাজ্য খেল দিবস
১২ জানুয়ারি	জাতীয় যুব দিবস
২৩ জানুয়ারি	নেতাজি জন্মজয়ন্তী
২৪ জানুয়ারি	কন্যাসন্তান দিবস
২৫ জানুয়ারি	জাতীয় ভোটার দিবস
২৬ জানুয়ারি	প্রজাতন্ত্র দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
০৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস
২১ মার্চ	জাতিভেদ বিরোধী দিবস
০৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
৩০ এপ্রিল	নির্মল বাংলা দিবস
মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার	বিশ্ব মাতৃদিবস
২১ মে	সন্ত্রাস বিরোধী দিবস
২৬ মে	জাতীয় ঐক্য দিবস
৩১ মে	বিশ্ব তমাকবর্জন দিবস
০৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৪ জুন	বিশ্ব শিশুশ্রমিক দিবস
২১ জুন	আন্তর্জাতিক যোগা দিবস
২৬ জুন	আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস
০১ জুলাই	চিকিৎসা দিবস
১৪-২০ জুলাই	অরণ্য সপ্তাহ
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৪ আগস্ট	কন্যাশ্রী দিবস
১৫ আগস্ট	স্বাধীনতা দিবস
২৪ আগস্ট	রাখিবন্ধন
২৯ আগস্ট	জাতীয় ক্রীড়া দিবস
০১ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক শান্তিদিবস
০৫ সেপ্টেম্বর	জাতীয় শিক্ষক দিবস
০৮ সেপ্টেম্বর	বাৎসরিক রক্তদান দিবস
১৩ সেপ্টেম্বর	বিশ্ব সদর্থক ভাবনা দিবস
১-৭ সেপ্টেম্বর	জাতীয় পুষ্টিসপ্তাহ
০২ অক্টোবর	জাতীয় অহিংসা দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব বিপর্যয় হ্রাস দিবস
১১ অক্টোবর	জাতীয় ধূমপানহীন দিবস
১৪ অক্টোবর	বিশ্ব মানব দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
০১ নভেম্বর	দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস
০৭ নভেম্বর	জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস
১১-১৭ নভেম্বর	আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও শান্তিসপ্তাহ
১৪ নভেম্বর	শিশু দিবস
১৯ নভেম্বর	জাতীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিদিবস
২৫ নভেম্বর	আন্তর্জাতিক নারীনির্যাতন-বিরোধী দিবস
০১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
০২ ডিসেম্বর	জাতীয় দূষণ প্রতিরোধ দিবস
০৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক বিকলাঙ্গ দিবস
০৫ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১০ ডিসেম্বর	জাতীয় পালস পোলিয়ো দিবস
২৪ ডিসেম্বর	ক্রেতা সুরক্ষা দিবস

১০.২.৩ শারীরশিক্ষার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

শারীরশিক্ষার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীর জীবনে খাদ্য, আলো, বাতাস ও জলের ন্যায় অপরিহার্য। খেলার প্রতি দেশ, কাল, শহর, গ্রাম সর্বত্র শিশুর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। প্রত্যেক শিশুই খেলতে ভালোবাসে। শিশুর শৈশব হলো খেলার বয়স, গড়বার সময় ও স্বপ্ন দেখার দিন। শিশু খেলবার সময় কোনো ক্লান্তিবোধ করে না। শিশু খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করে। আবার খেলার মাধ্যমে শিশুর মধ্যেকার সুকোমল বৃত্তির বিকাশ ঘটে। খেলার মাধ্যমে শিশু আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। বর্তমান শিক্ষাদর্শন অনুসারে—পড়াতেও খেলা, আর খেলতে খেলতে পড়া। তাহলেই সহজ হবে জীবনের ভিত গড়া।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে অধিকসংখ্যক খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে পারে নতুন শিক্ষাধারায় তার সংস্থানও রাখা হয়েছে, এছাড়াও শিক্ষার্থীদের ক্রীড়াদক্ষতা তার রেজাল্ট ও সার্টিফিকেটেও প্রতিফলিত হবে। অন্তর্বিভাগ থেকে বহির্বিভাগ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়ে নম্বরের সংস্থানও রাখা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের ক্রীড়াদক্ষতা ও নেতৃত্বদান ক্ষমতার বিকাশের জন্য বিদ্যালয় স্তরে খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষাসূচি পরিচালনার জন্য একটি নমুনা কার্যকরী সাংগঠনিক কাঠামোও তৈরি করা প্রয়োজন। বিদ্যালয় স্তরের খেলাধুলা ও শারীরশিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করা যেতে পারে দুটি ভাবে—(১) অন্তঃপ্রাচীর কর্মসূচি এবং (২) বহিঃপ্রাচীর কর্মসূচি।

১০.৩.১ হেলথ কার্ড

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
শ্রেণি					
উচ্চতা					
ওজন					
বি.এম.আই (BMI)					

টিকাকরণ সম্পর্কিত তথ্য

টিকার নাম	হ্যাঁ / না	টিকার নাম	হ্যাঁ / না
বি.সি.জি		টিটেনাস	
ডি.পি.টি		ভিটামিন এ	
ও.পি.ভি (পোলিও)		হেপাটাইটিস-বি	
হাম		জাপানীজ্ এনকেফোলাইটিস	
অন্যান্য			

রোগ ও অসুস্থতার বিবরণ (নীচের কোড অনুযায়ী চিহ্ন/সংখ্যা বসাতে হবে)

২০১৩-১৪: ১ম পরীক্ষা					
২০১৩-১৪: ২য় পরীক্ষা					
২০১৪-১৫: ১ম পরীক্ষা					
২০১৪-১৫: ২য় পরীক্ষা					
২০১৫-১৬: ১ম পরীক্ষা					
২০১৫-১৬: ২য় পরীক্ষা					
২০১৬-১৭: ১ম পরীক্ষা					
২০১৬-১৭: ২য় পরীক্ষা					
২০১৭-১৮: ১ম পরীক্ষা					
২০১৭-১৮: ২য় পরীক্ষা					

রোগ ও অসুস্থতার চিহ্ন	জন্মগত সমস্যা	ঘাটতি জনিত সমস্যা	শৈশবকালীন অসুস্থতা	বিলম্বিত বিকাশ এবং অক্ষমতা/ প্রতিবন্ধকতা
	১-নিউরাল টিউব্ ডিফেক্ট ২-ডাউন্স সিন্ড্রোম ৩-ক্লেফ্ট লিপ ও প্যালেট ৪-ট্যালিপেস (ক্লাব ফুট) ৫-ডেভেলপমেন্টাল ডিসপ্লাসিয়া অব্ হিপ ৬-জন্মগত ছানি ৭-জন্মগত বধিরতা ৮-জন্মগত হৃদ্পিণ্ডজনিত সমস্যা ৯-রেটিনোপ্যাথি অব্ প্রিম্যাচ্যুরিটি	১০-রক্তাল্পতা ১১-ভিটামিন-এ এর অভাব (বিটট্স স্পট্) ১২-ভিটামিন-ডি এর অভাব (রিকেট) ১৩-এস.এ.এম./খর্বতা ১৪-গলগণ্ড	১৫-ত্বকের সমস্যা ১৬-ওটাইটিস মিডিয়া ১৭-রিউম্যাটিক্ হার্ট ডিজিস্ ১৮-শ্বাসনালীর প্রদাহজনিত সমস্যা ১৯-দাঁতের ক্ষয় ২০-খিঁচুনি	২১-দেখার সমস্যা ২২-শোনার সমস্যা ২৩-স্নায়ু-শক্তির দুর্বলতা ২৪-বিলম্বিত চলন-শিখণ ২৫-বিলম্বিত বোধশক্তি ২৬- কথা বলায় বিলম্ব ২৭-আচরণগত সমস্যা (অটিজম) ২৮-শিখনগত সমস্যা ২৯-মনোযোগের অভাব ও অস্থিরতা (এ.ডি.এইচ.ডি.) ৩০- অন্যান্য

হেলথ কার্ড

সার্বিক স্বাস্থ্যের মান						
	১ম পরীক্ষা (দিন/মাস)			২য় পরীক্ষা (দিন/মাস)		
২০১৩-১৪						
২০১৪-১৫						
২০১৫-১৬						
২০১৬-১৭						
২০১৭-১৮						
বিভিন্ন রঙের অর্থ	(সবুজ) - সুস্থ		(হলুদ) - ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্তরে প্রেরণ		(লাল) - ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উর্ধ্বতন স্তরে প্রেরণ	

পরামর্শ		
	১ম বার	২য় বার
২০১৩-১৪		
২০১৪-১৫		
২০১৫-১৬		
২০১৬-১৭		
২০১৭-১৮		

চিকিৎসকের নাম ও স্বাক্ষর		
নাম	স্বাক্ষর ও তারিখ	

প্রেরণ (রেফারেল) সংক্রান্ত তথ্য		
	১ম বার	২য় বার
২০১৩-১৪		
২০১৪-১৫		
২০১৫-১৬		
২০১৬-১৭		
২০১৭-১৮		

পরিশিষ্ট

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

পূর্ণমান - ৬৫

ব্যাবহারিক মূল্যায়ন —৪০ নম্বর	*তারিখ*	*লিখিত মূল্যায়ন —২৫নম্বর*
প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ১০ নম্বর		*প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ৫ নম্বর*
দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ১০ নম্বর		*দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ৫ নম্বর*
তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ২০ নম্বর		*তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ১৫ নম্বর*

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যায়ের নম্বর অনুসারে মূল্যায়ন করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন লিখিত ও ব্যাবহারিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের ব্যাবহারিক বিষয় শেখানোর শেষেও মূল্যায়ন করতে পারেন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অনুযায়ী নমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে ও বিশেষ সুবিধা প্রদান করতে হবে। লিখিত মূল্যায়নের সময় সংক্ষিপ্ত ও অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পুস্তকে ব্যবহৃত বিশেষ তথ্যাবলি শিক্ষার্থীদের ধারণা গড়ে তোলার জন্য। পরীক্ষার প্রশ্নে গুরুগম্ভীর বিষয়ের প্রতিফলন ঘটানো অভিপ্রেত নয়। পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রথম পর্যায়ের অর্জিত সামর্থ্যগুলির প্রয়োগের পরিসর থাকবে দ্বিতীয় পর্যায়ে। একইভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্জিত সামর্থ্যগুলির প্রয়োগের পরিসর যেন তৃতীয় পর্যায়েও থাকে।

ব্যাবহারিক মূল্যায়ন—৪০ নম্বর	*লিখিত মূল্যায়ন—২৫ নম্বর*
প্রথম ব্যাবহারিক পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন - ১০ নম্বর	প্রথম লিখিত পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন - ৫ নম্বর
বিভাগ-ক ঃ শারীরিক সক্ষমতা পরিমাপ - ৩ নম্বর **বিভাগ-খ ঃ অ্যাথলিটিক্স - ৭ নম্বর**	**প্রথম অধ্যায়** **শারীরশিক্ষার মৌলিক ধারণা**

দ্বিতীয় ব্যাবহারিক পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন - ১০ নম্বর	দ্বিতীয় লিখিত পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন -৫ নম্বর
বিভাগ-গ ঃ একক ক্রীড়া *(যে-কোনো একটি)* - ৪ নম্বর দাবা / অ্যারোবিক / বল ব্যাডমিন্টন / ক্যারাটে / রিদমিক **বিভাগ-ঘ ঃ *দলগত খেলা (যে-কোনো একটি)*-** ৬ নম্বর ফুটবল / কবাডি / নেটবল / বাস্কেটবল / খোখো ইত্যাদি	দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্যশিক্ষা

তৃতীয় ব্যাবহারিক পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন - ২০ নম্বর	তৃতীয় লিখিত পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন - ১৫ নম্বর
বিভাগ-ঙ ঃ নিয়মানুগ অঙ্গসঞ্চলনা *(একটি)* -৪ নম্বর ব্রতচারী / কুচকাওয়াজ / ক্যালিসথেনিক্স **বিভাগ-চ ঃ একক ক্রীড়া *(যে-কোনো একটি)*** -৬ নম্বর যোগাসন / জিমনাস্টিকস **বিভাগ-ছ ঃ** পালনীয় দিবসে অংশগ্রহণ - ৫ নম্বর **বিভাগ- জ ঃ** ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ - ৫ নম্বর অথবা অনাবাসিক / আবাসিক শিবিরে অংশগ্রহণ অথবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সেবা কার্যক্রম (প্রকল্প)	তৃতীয় অধ্যায়- **প্রাথমিক চিকিৎসা** চতুর্থ অধ্যায়- **ক্রেতা সুরক্ষা** পঞ্চম অধ্যায়- **বিপর্যয় মোকাবিলার শিক্ষা** ষষ্ঠ অধ্যায়- **পথনিরাপত্তার শিক্ষা**

প্রতিযোগিতার মান নির্ধারণ ঃ মার্কস টু অন ইওর মার্কস

আন্তঃক্লাস	মহকুমা স্তর	জেলা স্তর	রাজ্য স্তর	জাতীয় স্তর
১	২	৩	৪	৫

ব্রতচারী, সব পেয়েছির আসর, ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইড, এন সি সি, ভারতীয় রেডক্রস সংস্থা, বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ ও শিক্ষাদপ্তর আয়োজিত স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক ন্যূনতম তিন দিন আবাসিক শিবির অথবা ন্যূনতম সাত দিনের বেশি অনাবাসিক শিবিরে অংশগ্রহণ করে তাহলেও দক্ষতা অনুসারে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। যেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের বাইরে অন্যত্র প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই বিদ্যালয়কে জানাতে হবে বা অনুমতি নিতে হবে।

শারীরিক সক্ষমতার রিপোর্ট কার্ড

শারীরিক সক্ষমতার বিষয়	তারিখ	তারিখ	তারিখ	গ্রেড/নম্বর	সুপারিশ
	দক্ষতা	দক্ষতা	দক্ষতা		
৬০ মিটার দৌড়					
পায়ের বিস্ফোরক শক্তি					
সিট আপ					
ক্ষিপ্রতা					
৮০০ মিটার দৌড়					
নমনীয়তা পরিমাপের অভিক্ষা					
প্রতিক্রিয়া সময় নির্ণয়					

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন-সপ্তম শ্রেণি

ছাত্রের রোল নং	ছাত্রের নাম	বিভাগ-ক ঃ শারীরিক সক্ষমতা অভীক্ষা	বিভাগ-খ ঃ একক ক্রীড়া	বিভাগ-গ ঃ একক ক্রীড়া	বিভাগ-ঘ ঃ দলগত খেলা	বিভাগ-ঙ ঃ নিয়মানুগ অঙ্গসঞ্চালনা	বিভাগ-চ ঃ একক ক্রীড়া	বিভাগ-ছ ঃ মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	বিভাগ-জ ঃ মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	ব্যাবহারিক পরীক্ষার যোগফল	প্রথম পর্যায়ক্রমিক লিখিত মূল্যায়ন	দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক লিখিত মূল্যায়ন	তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক লিখিত মূল্যায়ন	লিখিত পরীক্ষার যোগফল	মোট নম্বর
			অ্যাথলিটিক্স	অ্যারোবিক ব্যায়াম/ব্যাডমিন্টন/দাবা	ফুটবল/কবাডি/খো-খো ইত্যাদি	ব্রতচারী / কুচকাওয়াজ / ক্যালিসথেনিক্স	যোগাসন / জিমনাস্টিকস	পালনীয় দিবসে অংশগ্রহণ	ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়/শিবিরে অংশগ্রহণ / সমাজসেবামূলক প্রকল্প	ব্যাবহারিকের যোগফল				লিখিত পরীক্ষা	লিখিত ও ব্যাবহারিকের যোগফল
রোল নং	নম্বর	৩	৭	৪	৬	৪	৬	৫	৫	৪০	৫	৫	১৫	২৫	৬৫

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

No. WBTBCL/Health & Physical Education-VII/December, 2016

এই পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের আর্থিক আনুকূল্যে কেবলমাত্র সরকারি ও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।